মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল

৬, এ্যাণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ
১৫ই আশ্বিন, ১৩৭৬

প্রকাশক :
মজহারুল ইসলাম
৬১ এ্যান্টনী বাগান লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
রাম প্রসাদ রাণা
নিও প্রিণ্টার্স
৭৬ বিপিন বিহারী গাংগুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ শিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

পরিবেশক :
ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লি
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মূল্য : দশ টাকা

লেখকের নিবেদন

"বাংলার কৃষক সভা" বাংলাদেশের এবং দেশ বিভাগের পরবর্তী কালে পশ্চিমবাংলার কৃষক সভার আন্দোলন ও সংগঠনের তথ্যমূলক ইতিহাস। বিশ্লেষণ, আলোচনা ও রাজনীতিক মূল্যায়নের চেয়ে এর মধ্যে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তথ্য ও ঘটনাবলীর সমাবেশের উপর। এই ইতিহাসকে মোটামুটি লিখিত আকারে প্রকাশ করবার মতো একটা পর্যায়ে আনা গেছে, এই দাবি এখন করা যায়।

একটা সঠিক তথ্যমূলক বিবরণী সামনে থাকলে তাই নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হয়, সহজও হয়। আগস্ট ১৯৩৬এ বাংলাদেশে বর্তমান পর্যায়ের কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের জন্মের পর তার ইতিহাসে, বলা যেতে পারে এই সময়ের সাধারণ রাজনীতিক আন্দোলনের ইতিহাসেও এ প্রয়োজন অনেক পূর্বেই দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তখন সে বিবরণী লেখবার ব্যবস্থা হতে পারেনি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে যাঁরা শুরু থেকে তা লিখতে পারতেন বা পারেন তাঁরা ক্রমশ হিসাবের বাইরে চলে যাচ্ছেন ; আর কিছু কাল পরে হয়তো তাঁদের মধ্যে একজনেরও অস্তিত্বই থাকবে না।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিজেও ঐ দলের একজন। তাই লেখবার দায়িত্ব আমারও ছিল। সে দায়িত্ব কয়েক বছর ধরে আমি অনুভবও করেছি ; শুধু দায়িত্বই নয়, অবস্থা গতিকে দায়িত্বের সঙ্গে একটা বাধ্যবাধকতার ভাবও ছিল বলে মনে করেছি। কিন্তু সুযোগের ছিল বড় অভাব। অন্য অনেক সহকর্মীর মতো এমন সব অবস্থার মধ্যে আমাকে বাস করতে ও কাজ করতে হয়েছে যা এই ধরণের দায়িত্ব পালন করার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। উপকরণ যতটা সম্ভবপর ছিল সংগ্রহ করে রেখেছিলাম এবং তার মধ্যে এমন বহু জিনিস ছিল যা হারালে আর পাবার কোন আশা নাই। কিন্তু সেই সব উপকরণ কাজে লাগাবার মতো সময় ও সুযোগ অনেক বছরের মধ্যে কিছুতেই করা যাচ্ছিল না।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলা সরকার ও ভারত সরকার দয়া করে বার দুই

সময়ের দিক থেকে যথেষ্ট ভালো ব্যবস্থা করে দিয়েছিল ; ১৯৬২র শেষ দিক থেকে গোটা ১৯৬৩ সন এবং আবার ১৯৬৪র শেষ থেকে ১৯৬৫ হয়ে ১৯৬৬র প্রথম কয়েক মাস ভারত প্রতিরক্ষা আইন ও রুল অনুসারে বিনা বিচারে জেলে আটক রেখেছিল। এই ছিল আমার পক্ষে লেখবার প্রশস্ত সময়। কিন্তু তারও সুযোগ নিতে পারলাম না ; জেলে বসে আমার সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ পেতে হলে তা রাজনীতিক পুলিস সেন্সর করবে, এবং তার মধ্যে কতগুলো বাতিল করবে বা হারাবে অথবা নষ্ট করে দেবে তার কোন স্থিরতা ছিল না।

রচনাকাল

অতএব সময় পেয়েও সুযোগ হারাতে বাধ্য হলাম। জেল থেকে বেরোবার পর বহু ঘটনা ঘটে গেল। শেষে ১৯৬৭র নবেম্বর মাসে কংগ্রেসী ভারত সরকার একটি সংবিধান-বিরোধী কাজ করে আমাকে সময় ও সুযোগ দুয়েরই ব্যবস্থা করে দিলে ; রাজ্যপালের হাত দিয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে একটা পুলিসী সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করলে। তখন তিনটে মাস যে অজ্ঞাতবাসে থাকতে হল তাতে লেখবার জন্য সময়ের অভাব হল না এবং অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও সে সময়কে কাজে লাগাবার সুযোগও এল। তবে কাজটা করতে হয়েছিল অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ; একের থেকে ষোলর অধ্যায় পর্যন্ত লেখা শেষ করা হয় ২২ ডিসেম্বর ১৯৬৭ থেকে ১২ জানুয়ারি ১৯৬৮ পর্যন্ত ২২ দিনে। অন্যান্য অংশ তার পূর্বে বা পরে রচিত ; ষোলর অধ্যায়ের পরের অংশ তার পরে পরবর্তী ঘটনা নিয়ে লেখা এবং পট ভূমিকার অংশ তার পূর্বে লেখা। সমগ্র পট ভূমিকা দুটো প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল "নন্দন" মাসিকে (ফাল্গুন ১৩৭৪ ও বৈশাখ ১৩৭৫ এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৭৫ সংখ্যা)। তার মধ্যে এখন কিছু রদবদল করা হয়েছে।

লেখার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনা আছে। কিন্তু মূলত কৃষক সভার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এই ইতিহাস রচিত, কোন রাজনীতিক পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নয়। কমিউনিস্ট পার্টির ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতির প্রভাব যে কৃষক সভার উপর শুরু থেকেই থেকেছে তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই রচনার মধ্যে সে বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, যদিও প্রসঙ্গত কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

তথ্য, ঘটনা ও তারিখ সম্বন্ধে যেসব উপকরণ এর মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে তার অধিকাংশ আমার নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নিয়েছি।

বাকি অংশ নিয়েছি পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক কমিটির আফিস থেকে ; সেজন্য কমিটির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কিন্তু প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ এখনো সংগ্রহ করতে পারিনি বলে বইয়ের মধ্যে তথ্যগত অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। বিভিন্ন সময়ে সরকারী ও পুলিসী উৎপাতের কারণে কমিটির অনেক দলিল-পত্রের ফাইল নষ্ট হয়ে গেছে। একই কারণে আমার নিজস্ব সংগ্রহও অনেক বরবাদ হয়েছে। এই উপদ্রব থেকে অনেক বই, কাগজ ও দলিল-পত্র বাঁচাবার জন্য যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলাম, পরে তার কবল থেকেও সেসব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য মালমসলা উদ্ধার করতে পারিনি।

আরো তথ্য প্রয়োজন

এই ট্রাজেডি থেকে নিস্তার পাবার কোন উপায় আমার ছিল না। তাই অসম্পূর্ণতার দায়িত্ব আমাকে বহন করতে হচ্ছে। আমি বিশেষভাবে অভাব অনুভব করেছি ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত এই কয়েক বছরের অনেকগুলি প্রামাণ্য কাগজপত্রের। তার মধ্যে আছে বড়া অধিবেশনে (ডিসেম্বর ১৯৩৮) সভাপতি পরিষদের যে থিসিস এবং যে গঠনতন্ত্র পাস হয়েছিল, পরে ছাপাও হয়েছিল, সেই দুটি পুস্তিকা। এই দুটি দলিল এবং ঐ কয়েক বছরের আরো যেকোন দলিল, রিপোর্ট ইত্যাদি যদি কেউ দয়া করে আমাকে পাঠিয়ে দেন তাহলে বড়ই উপকৃত হব। তাঁরা তা ফেরত চাইলে ফেরতও পাঠিয়ে দোব। ঐ সময়ের 'কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট', 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট', 'পিপল্‌স ওয়ার' ইত্যাদি পত্রিকার যেসব সংখ্যায় বাংলার ও ভারতের কৃষক সভা সম্বন্ধে যা কিছু বেরিয়েছিল তারও প্রয়োজন আছে এবং তাও পেতে চাই ভবিষ্যতে প্রয়োজনে লাগবে বলে। কিছু পাবার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করাও গেছে।

রচনার মধ্যে অনেক সময় ব্যক্তিগতভাবে আমার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও কোথাও উত্তম পুরুষের একবচন পর্যন্ত ব্যবহার করতে হয়েছে। সেজন্য পাঠকদের নিকট আগে থেকেই মাফ চেয়ে রাখছি। সেই সঙ্গে এই কৈফিয়ত দেওয়া দরকার মনে করি যে রচনার মধ্যেকার বক্তব্যের প্রয়োজনে ছাড়া এ ধরনের উল্লেখ এড়াবার জন্য আমি পারতপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

শ্রেণী সংগ্রামের কাহিনী

এই বিবরণী বাংলাদেশে মূলত কৃষক ও খেতমজুরদের শ্রেণী সংগ্রামের বিবরণী। বংলার সমাজ জীবনে অর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিস্থিতি গত

৩৪ বছরের মধ্যে যেভাবে বিকাশ লাভ করে এসেছে, তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের শোষক শ্রেণীগুলির ও শোষিত শ্রেণীগুলির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতর যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে, এবং সেই পরিবর্তনের সাথে সাথে শোষণের ধরন যেভাবে বদলেছে এবং বিরোধের তীব্রতা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই মোতাবেক কৃষক ও খেতমজুরদের সংগ্রামের ধরন এবং সংগঠনের চরিত্রও প্রকাশ পেয়েছে। তার পরিচয় এই লেখার মধ্যে পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে আরো পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের রাজনীতিক চেতনার, দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য তাদের সংগ্রামী চেতনার ও সংগ্রামের। দেখা যাবে সাম্প্রদায়িকতার, সামন্তবাদী শোষণের এবং সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রেণী-সচেতন কৃষক কতখানি অগ্রসর ও সক্রিয়।

যুগ যুগ ধরে কৃষকরা সকল দেশেই তাদের সংগ্রামী বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়ে এসেছে শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে। এ বিষয়ে বাংলার কৃষকও পেছিয়ে থাকেনি। কৃষক সভার নেতৃত্বে লাল পতাকার তলে জমায়েত হয়ে তারা যেসব বীরত্বের কাহিনী রচনা করেছে তা কোন কোন ক্ষেত্রে বিপ্লবী বীরত্বের সঙ্গে তুলনীয়। এই সমস্ত সংগ্রামের মধ্যে কৃষক সভা যেমন তাদের নিজস্ব শ্রেণী প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদেরই মধ্যে থেকেছে, দূরে সরে যায়নি, তেমনি তারাও তাদের সভার লাল পতাকার প্রতি আনুগত্য ও সম্মানকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি। বাংলার কৃষক সভা বাংলার কৃষকের একান্ত আপন ও গর্বের বস্তু। তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক ছিন্ন হবার নয়।

১৯৩৬এর বাংলার কৃষক সভা ছিল তামাম বাংলার একমাত্র কৃষক সভা। সে অবস্থা চলেছিল অন্তত দশ বছর। আজ সে দাবি হয়ে পড়েছে অতীতের বিষয়। ১৯৪৭এর আগস্টে রাষ্ট্রীয় বিভাগের পর পশ্চিম বাংলার কৃষক সভা পৃথক হয়ে পড়ে। পাকিস্তান কায়েম হবার পর স্থানীয় কৃষক সভার ডাকে আমি শেষ বারের মতো পাকিস্তান অঞ্চলে গিয়েছিলাম ঐ বছর সেপ্টেম্বরের শেষে; সিলেট জেলার লাউতা-বাহাদুরপুরে।

তখন থেকে সীমানার দু দিকে দুই রাষ্ট্রে দুটি কৃষক সভা গড়ে উঠেছে। তাহলেও সীমানার ওপারের কৃষক ভাইবোনদের আমি আজও ভুলিনি, ভুলতে পারি না।

বিশ্বস্ত সহকর্মী ও আত্মীয়

বিশেষ করে ভুলতে পারি না আমি সেই সব কৃষকদের ও কৃষক কর্মীদের যাদের সঙ্গে আমি দীর্ঘ সময় একত্র বাস করেছি এবং কাজ করেছি, যাদের

সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছি, যাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি। স্বাভাবিক সময়ের চেয়েও অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের সঙ্গে থেকেছি যখন সরকারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মাথায় নিয়ে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে সারা বাংলাদেশে, বর্তমান পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান উভয় অংশেই—জেলা থেকে জেলায়, এলাকা থেকে এলাকায়, গ্রাম থেকে গ্রামে। দুই অংশেরই মানুষ একান্ত অন্তরঙ্গ ও পরম বিশ্বস্ত সহকর্মী ও আত্মীয়ের মতো আমাকে স্থান দিয়ে রেখেছে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় নিজেদের ঘরবাড়ির মধ্যে। আদর আপ্যায়ন করেছে তাদের সাধ্যে যতদূর কুলিয়েছে। আমাকে এই গোপন অবস্থার মধ্যে রেখে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নিরক্ষর কৃষক মেয়েরা পর্যন্ত আমার নিরাপত্তা সম্বন্ধে যে কত সজাগ দৃষ্টি রেখেছে, কত সচেতন মন নিয়ে আমাকে পাহারা দিয়েছে সে আমি দেখেছি, দেখে মুগ্ধ হয়েছি, গর্ব বোধ করেছি। সে সব কথা আজ ভুলে যাবার নয়।

সেই সঙ্গে দূর অতীতের কথা স্মরণ করে অন্তরে একটা আবেগ অনুভব না করে পারছি না। অনুভব করছি এই সমস্ত কৃষক ও কৃষক কর্মীরা আমার একান্তই আপন জন। তারা হিন্দুস্তানের কি পাকিস্তানের, এ কোন প্রশ্ন নয়। হিন্দু-মুসলিম-আদিবাসী—তারা যাই হ'ক না কেন, আমার কাছে তাদের পরিচয় তারা কৃষক বা কৃষক-দরদী। আমিও যখন অজ্ঞাত বাসের অবস্থায় তাদের মধ্যে থেকেছি তখন তারাও অধিকাংশই আমার পিতৃ-পরিচয় জানত না, জানতে চায়নি। তারা জানত কেবল একটি পরিচয়—আমি তাদেরই একজন, তাদের জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে, তাদের ভবিষ্যৎ স্থায়ী নিরাপত্তার সংগ্রামে তাদের সংগ্রামী সাথী। এই ছিল আমাদের দুই দিক থেকে পরস্পরের নিকট দাবির ভিত্তি, এবং সেই দাবি নিয়েই আমরা একযোগে কৃষক সভাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছি।

উৎসর্গ

এই সমস্ত ভাইবোনদের অনেকে আজ গত হয়েছেন। তাঁদের স্মৃতিকে সযত্নে লালন করতে হবে। যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা অনেকেই সভার লাল পতাকাকে তুলে ধরে রেখেছেন, অথবা অন্তত বাতি জেলে রেখেছেন। তাঁরা আমার শ্রদ্ধার পাত্র, বিশেষ করে যাঁরা পাকিস্তানে আছেন। পাকিস্তানের অন্য অনেক কৃষক ও কর্মী দেশবিভাগের পর ছত্রভঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁদের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। আর

গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করছি কৃষক আন্দোলনের শহীদদের ; তাঁরা আমাদের সংগ্রামী প্রেরণার প্রধান উৎস, তাঁরা পাকিস্তানেরই হোন অথবা হিন্দুস্তানেরই হোন। তাঁদের সংগ্রামী বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনী বাদ দিলে কৃষক সভার ইতিহাসই মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

এই সব কথা স্মরণ করে পশ্চিম বাংলার ও পূর্বপাকিস্তানের অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত সংগ্রামী কৃষক ভাইবোনদের প্রতি, কৃষক সভার অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত কর্মীদের প্রতি, এবং কৃষক সভার শহীদদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ আমি আমার "বাংলার কৃষক সভা" উৎসর্গ করলাম।

কলকাতা
১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

ম. আ. র.

আন্দোলন ও সংগঠনের পটভূমিকা

১। আন্দোলনের ঐতিহ্য

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার উপর ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্ব শুরু হয় পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পরে এবং বিশেষ করে যখন কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী হাতে পায় (১৭৬৫)। তখন সুযোগ এল সুবে বাংলার রাজস্ব আদায় করে এবং তা বাড়িয়ে কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি করবার।

কিন্তু প্রাক্তন শাসনব্যবস্থার অবসান ও নতুন ব্যবস্থার পত্তনের মাঝে তখন দেশে একটা অরাজক অবস্থা চলছিল। সেই অবস্থা থেকে দেশকে উদ্ধার করার চেয়ে কোম্পানীর আয় বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের শোষণ বৃদ্ধির দিকে নজর ছিল বেশি। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে জমিদার-মহাজনরাও তাদের শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তার ফলে বহু কৃষক হয়েছিল জমিহীন, কারিগর হয়েছিল বেকার। মোগল বাহিনীর বহু সৈন্যও তখন বেকার অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারা সকলেই ছিল অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ।

আর ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও ফকিররা। তারা অনেকে স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ি বেঁধে চাষবাসের কাজ করত আর অবসরের মরসুমে দল বেঁধে তীর্থযাত্রা করত। কোম্পানীর সরকার আয় বৃদ্ধির লোভে তীর্থযাত্রীদের উপর কর বসিয়ে দেয়। তখন ধর্মের অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে ঐ সব সন্ন্যাসী ও ফকিরদের এই করের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জেগে ওঠে এবং ক্রমে তা বিদ্রোহের রূপ নেয়। এই বিদ্রোহকেই বলা হয় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। অষ্টাদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে এই বিদ্রোহ চলে। ইংরেজ আমলের নতুন ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করার আগেই তা শুরু হয় এবং শেষ হয় তার কয়েক বছর পরে।

কোম্পানীর শাসন আরম্ভ হতে-না-হতেই একদিকে দেখা দেয় এই

বিদ্রোহ, আর অন্যদিকে আসে ছিয়াত্তরের (১১৭৬ সালের) মন্বন্তর (১৭৬৯-৭০)। এ ছিল ধ্বংসাত্মক দুর্ভিক্ষ, যেমনি ব্যাপক তেমনি মারাত্মক। এর শিকার হয়েছিল এক কোটি মানুষ।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

বিদ্রোহী সন্ন্যাসী ও ফকিররা জমিহারা কৃষক এবং বেকার কারিগর ও সৈন্যদের সহজেই তাদের দলে টানতে পেরেছিল। তারা বিদ্রোহ করে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এবং সরকারের সমর্থনপুষ্ট রাজস্ব আদায়কারী জমিদার-ইজারাদারদের বিরুদ্ধে।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ক্ষেত্র ছিল ব্যাপক। শ্রীহট্ট জেলা থেকে আরম্ভ করে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের অনেকগুলি জেলা এবং গঙ্গার পশ্চিমে যশোহর, খুলনা ও মুর্শিদাবাদ জেলা হয়ে বীরভূম পর্যন্ত এবং বিহারের সারন ও চম্পারন জেলা পর্যন্ত।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে অনেকে ঠিক কৃষক বিদ্রোহ আখ্যা দিতে চায় না, কারণ কোন নির্দিষ্ট কৃষক দাবির আন্দোলন থেকে এর উদ্ভব হয়নি। তার কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল বলেও মনে হয় না। তাহলেও এই বিদ্রোহের পিছনে সাধারণ কৃষকদের যথেষ্ট সমর্থন ছিল, অনেক সময় তারা নানাভাবে তাকে সাহায্যও দিয়েছিল। ইংরেজ সরকারকে বিদ্রোহীরা রাজস্ব দিতে নিষেধ করলে কৃষকরা তা মেনে নিত এবং সেই রাজস্বের টাকা দিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করত। বিদ্রোহীরা কোন সময়ে কৃষকদের বা জনসাধারণের উপর জুলুম অত্যাচার করেনি।

বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন মজনু ফকির বা মজনু শাহ। তাঁর পরে তাঁর ভাই মুসা শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী ইত্যাদি অনেকে পর পর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিদ্রোহের চরিত্র ছিল মোটামুটিভাবে রাজনীতিক ও সামরিক, ইংরেজ শাসনের বিরোধী। বিদ্রোহীরা ইংরেজদের বহু কুঠি ও জমিদারদের কাছারি লুট ও ধ্বংস করেছিল। নানাস্থানে সরাসরি যুদ্ধও করেছিল সরকারী ফৌজের বিরুদ্ধে এবং তাতে উভয় পক্ষেরই জয়-পরাজয় দুই-ই ঘটেছিল। কিন্তু তাই থেকে কোন সুস্পষ্ট ও স্থায়ী সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসেনি।

১৭৮৬ সনের ডিসেম্বরে বগুড়া জেলায় ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে একটা যুদ্ধে মজনু শাহ মারাত্মকভাবে আহত হন। কয়েক দিন পরে তাঁর মৃত্যু

হয় এবং মুসা শাহ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অনেক সময় বিদ্রোহীদের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, আবার তা মিটেও যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষে ক্রমশ স্তিমিত হতে হতে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্বন্ধে বেশি জমাখরচের হিসাবের মধ্যে না গেলেও অন্তত একথা বলা চলে যে দেশের মধ্যে একটা বিদেশী কর্তৃত্ব ও শাসন ব্যবস্থা কায়েম হতে যাচ্ছে দেখে দেশের কিছু মানুষ তাতে বাধা দিয়েছিল, এবং এই বাধা দেওয়ার পিছনে ব্যাপক জনসমর্থন ছিল। তার মধ্যে প্রধান ছিল কৃষকদের সমর্থন।

নতুন ভূমিব্যবস্থা

মন্বন্তর ও বিদ্রোহ কোম্পানীর সরকারকে বাধ্য করেছিল ভূমি রাজস্ব নিশ্চিত ও নিয়মিত ভাবে আদায় করার জন্য ভূমিব্যবস্থার সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিতে। তার পরিণিতি হল ১৭৯০ সনে দশসালা বন্দোবস্ত ও পরে ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই অনুসারেই বাংলাদেশের জমিদারী প্রথার উৎপত্তি ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথা যে নতুন ভূমিব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রবর্তন করে সেই ধরনেরই ব্যবস্থা জারি করা হয় বিহারে, আসাম ও উড়িষ্যার কতকগুলি অংশে, মাদ্রাজের উত্তর সরকার জেলা ও আরো কিছু অংশে এবং যুক্ত প্রদেশের বানারস এলাকায়। চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার আমলে আসে ভারতের মোট আবাদী জমির শতকরা ১৯ ভাগ।

ভারতের অন্যান্য অংশে পরে অন্যান্য ধরনের ভূমিব্যবস্থা জারি করা হয়। অল্পস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে এবং বাংলা ও বোম্বাইয়ের কতক অংশে। (পাঞ্জাবের ভূমি-ব্যবস্থাকে মহলওয়ারিও বলা হয়।) তার মধ্যে ছিল ভারতের মোট আবাদী জমির শতকরা ৩০ ভাগ। আর রাইয়তওয়ারি ব্যবস্থা কায়েম করা হয় মাদ্রাজ, বোম্বাই, বেরাড়, আসাম ও সিন্ধুতে। এর মধ্যে ছিল ভারতের মোট আবাদী জমির শতকরা ৫১ ভাগ।

এই ভূমি ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে প্রায় একশ বছর পূর্বে কার্ল মার্কস যে মন্তব্য করেছিলেন তা লক্ষ্য করবার মতো। তিনি বলেছিলেন ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসেই কেবল দেখা যায় সে দেশের অর্থব্যবস্থায় অনেকগুলি ব্যর্থ এবং নিতান্ত অবাস্তব ও কুখ্যাত পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

বাংলাদেশে তারা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করেছে বিলাতী ধরনের বৃহদায়তন জমিদারীর অপকৃষ্ট নকল। দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে এমনি নকল করেছে ছোট ছোট জোতের। আর উত্তর-পশ্চিম ভারতে জমির এজমালি মালিকানা সহ যে সমস্ত ভারতীয় অর্থনীতিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাকে তার নিজেরই অপকৃষ্ট নকলে রূপান্তরিত করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। (Capital, Moscow edition, Vol.III, Part IV, Chapter XX, p.328 footnote.)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল তখনকার ভারতের গবর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে। তাঁর ইচ্ছা ছিল "বাংলাদেশে বিলাতী ছাঁচের জমিদার-রাইয়ত ব্যবস্থা কায়েম করা"। এই জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করে বিলাতী পার্লামেন্টের কমন্স সভার ১৮৩০ সনের দ্বিতীয় সিলেক্ট কমিটি তার রিপোর্টে বলেছিল কর্নওয়ালিসের এই জমিদার-রাইয়ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের সদিচ্ছাকে কাজে পরিণত করা হয়নি। তাই এই রিপোর্ট প্রস্তাব করেছিল রাইয়তদের রক্ষা করবার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারীগুলি সরকার কিনে নিক।

এই ব্যবস্থার কাজকর্ম ও গুণাগুণ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার পর মেজর জ্যাক বাকরগঞ্জ জেলার সেটেলমেণ্ট রিপোর্টে মন্তব্য করেছিলেন, এ হচ্ছে "দুনিয়ার সুশৃংখল ভূমিব্যবস্থার সবচেয়ে বিস্ময়কর অপকৃষ্ট নকল।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদার বা ইজারাদারদের জমিতে কোন স্বত্ব ছিল না। তাদের উপর ছিল শুধু রাজস্ব আদায়ের ভার এবং এই কাজের জন্য তারা মোট আদায়ী টাকার ১১ ভাগের একভাগ পেত কমিশন হিসাবে। জমির মালিক ছিল আসলে রাইয়ত-কৃষকরা। তারাই চাষ করত, তবে রাষ্ট্রকে একটা রাজস্ব দিতে হত।

ব্যবস্থাটা এখন হল এই : জমিদাররা চিরস্থায়ী স্বত্বে তাদের ভূসম্পত্তি ভোগ করবে, রাইয়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করবে এবং সরকারকে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব দেবে, কিন্তু সেজন্য নির্দিষ্ট সময়ের (চৈত্র সংক্রান্তির সূর্যাস্তের) মধ্যে রাজস্ব জমা দিতে না পারলে তাদের জমিদারী সম্পত্তি নিলাম হবে।

১৭৯৩ সনের রেগুলেশন অনুসারে কর্ণওয়ালিস যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করে বাংলাদেশের নতুন জমিদারী প্রথা এবং একটা নতুন জমিদার

শ্রেণী সৃষ্টি করেন তা এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনে একটা মারাত্মক অভিশাপ হয়েই থেকেছে।

কোম্পানীর প্রয়োজন ছিল টাকার, বাংলাদেশের মানুষের এবং প্রধানত কৃষক সমাজের সম্পদ শোষণ করে যত বেশি সম্ভব অর্থ সংগ্রহ করার। সেই সঙ্গে প্রয়োজন ছিল দেশের অনিশ্চিত ও অশান্ত অবস্থার মধ্যে মোটামুটি একটা শান্তি স্থাপন করবার এবং তার সরকারের জন্য একটা সামাজিক সমর্থন পাবার। তাই এই নতুন জমিদার শ্রেণীকে সৃষ্টি করা হল কোম্পানীর সরকারের সামাজিক সমর্থক ও সহায় হিসাবে; সোজা কথায়, বিদেশী কোম্পানীর সরকারের একটা দালাল শ্রেণী হিসাবে।

এ রকম একটা সমর্থনের জন্য স্বভাবতই যথেষ্ট দাম দেবার প্রয়োজন ছিল। বিলাতের বৃহৎ জমিদার কর্ণওয়ালিসের সময়ে তাই পূর্বেকার ভূমিরাজস্ব আদায়কারী কমিশন এজেন্ট বা তহসিলদারদের একেবারে জমির মালিক করে দেওয়া হল। সেজন্য অবশ্য কোম্পানী দামটা আদায় করলে দেশের কৃষক সমাজের কাছ থেকে। তখন কৃষকরাই ছিল জমির মালিক। এখন তাদের সে মালিকানা কেড়ে নিয়ে কোম্পানীর সরকার তা তুলে দিলে নতুন জমিদার শ্রেণীর হাতে। কোম্পানী এখন কৃষকদের নিঃস্ব হবার পথ খুলে দিলে।

দেশী শিল্পের উপর আঘাত

ইতিমধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিলাত থেকে পুঁজিবাদী কারখানায় তৈরি সস্তা দরের কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র আমদানী করে এদেশের কারিগরী শিল্পের বিপদ ঘটিয়েছিল। পুঁজিবাদী শিল্পে তৈরি কাপড় ও অন্যান্য জিনিসের দর সস্তা হত এবং এদেশের বাজার দখল করবার উদ্দেশ্যে তা বিশেষভাবে সস্তা দরে বিক্রী করা হত। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পেরে এদেশের কারিগরী ও কুটিরশিল্প পিছু হটতে লাগল। এখানকার প্রাচীন ও মোটের উপর স্বাভাবিক অর্থব্যবস্থার উৎপাদন বিলাতী পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠল না। যে সব কৃষক কুটির শিল্পের সাহায্যে বেশ কিছু আয় করত, এখন তারা বাধ্য হল কুটিরশিল্প ত্যাগ করে একমাত্র চাষের উপর নির্ভর করতে। স্বভাবতই তাহাদের আয় অনেক কমে গেল কিন্তু জমির উপর চাপ বেড়ে গেল।

কিন্তু কৃষি সম্বন্ধেও কৃষকদের জীবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে এল

নতুন বিপদ : জমির মালিক এখন আর কৃষক নয় যে সে নিশ্চিন্ত হয়ে চাষের কাজ করতে পারবে। তার উপর জমিদার খুশিমতো জমির খাজনা বৃদ্ধি করবার সুযোগ পেয়েছে। তার বর্ধিত দাবি মিটিয়ে শুধু কৃষির অনিশ্চিত অবস্থার উপর নির্ভর করে কৃষকের পক্ষে বেঁচে থাকাই হল কঠিন।

'লগ্নী'র নামে শোষণের ঘটা

কোম্পানীর শোষণের দাবি কেবল সদর রাস্তা দিয়েই আসত না। কোম্পানী দেওয়ানী হাতে পাবার পরেই, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনেক পূর্বে থেকেই প্রতি বছর "ইনভেস্টমেন্ট" বা 'লগ্নী' বলে বাংলাদেশের রাজস্বের (রাজস্বও তখন ছিল ধরতে গেলে একমাত্র ভূমিরাজস্বই) একটা অংশকে পৃথক রাখা হত। এই টাকা দিয়ে বিলাতের জন্য এখানে চালানী মাল কিনে পাঠিয়ে দেওয়া হত। কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীরা যে লুটের পথে অগাধ সম্পত্তি অর্জন করত তার পরিমাণ নির্ধারিত হত এই "লগ্নীর" পরিমাণ দিয়ে। এই "লগ্নীই"ই ছিল ভারতের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ, এ কথা স্বীকার করেছিল বিলাতী পার্লামেন্টের কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটি তার নবম রিপোর্টে (১৭৮৩)।

সুতরাং এদেশে কোম্পানীর আয় বাড়াতে হবে, অর্থাৎ ভূমিরাজস্ব বাড়াতে হবে। তাহলেই জমিদাররাও তাদের খাজনা বাড়াবে, নতুন নতুন সেস বা আবোয়াবের বোঝা চাপাবে রাইয়তদের উপর। রাইয়ত ও কৃষকেরা তার চাপে মারা গেলেও জমিদারদের দুঃখ ছিল না, কোম্পানীরও ক্ষতি ছিল না।

একে সেবার ফসল হল খুব খারাপ, তার উপর চলল কোম্পানী ও জমিদারদের এই মারাত্মক শোষণ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এল (১১৭৬ সাল, ১৭৬৯-৭০)। মন্বন্তরে বাংলার তিন কোটি অধিবাসীর মধ্যে এক কোটি মারা গেল। মরল প্রধানত কৃষক ও কারিগররাই। ঐতিহাসিক ও বাংলা সরকারের কর্মচারী হান্টার বলেন, কৃষক সমাজের অর্ধেক লোক মারা গিয়েছিল।

এই মন্বন্তর সত্ত্বেও কিন্তু নানারকম ফন্দিফিকির করে, অনেক বিপজ্জনক কৌশলে রাজস্ব আদায়ের কাজ চালু রাখা হল। বিলাতে চালানের জন্য যে "লগ্নীর" টাকা খরচ হত এবং যে সব বিদেশী মাল এদেশে বিক্রী করা

হত তাই থেকে বছরে অন্তত ১০।১২ লাখ পাউণ্ড বিলাতে চলে যেত। তার উপর বাংলাদেশ থেকে কোম্পানীর হিসাবে চীনে পাঠান হত প্রায় এক লাখ পাউণ্ডের, আর তার দরুন চীনের মাল সরাসরি চলে যেত বিলাতে, সে বাবদে বাংলাদেশে ফিরে আসত না কিছুই (ঐ রিপোর্ট)। হেস্টিংস তাঁর ৩রা নভেম্বর ১৭৭২ সনের চিঠিতে লিখেছিলেন যে মন্বন্তরে (১৭৬৯-৭০) বাংলার এক কোটি মানুষ মারা যাবার পর ১৭৭১ সনে যা আদায় করা হয়েছিল তা ১৭৬৮ সনের চেয়েও বেশি। আদায়টা অবশ্য ভয়ংকর চাপ দিয়েই করতে হয়েছিল। লোক খেতে না পেলেও শতকরা দশ টাকা হারে রাজস্ব বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

মন্বন্তরের ধাক্কা খেয়ে দেশের অবস্থাটা হয়েছিল এমন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুরু হবার পরও, কোম্পানীর টাকার তাগিদ থাকলেও, জমিদাররা রাজস্ব আদায় করতে পারছিল না। লক্ষ লক্ষ কৃষক দুর্ভিক্ষের শিকার হওয়ার ফলে দীর্ঘকাল ধরে বহু আবাদী জমি পতিত পড়ে থাকত। ফলে জমিদারী প্রথা সৃষ্টি করার কয়েক বছরের মধ্যে বাংলার অর্ধেকের বেশি জমিদারী রাজস্বের দায়ে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। (কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্ট, ১৮১২।)

হফ্‌তম ও পন্‌জম আইন

তখন রাজস্বের পরিমাণ কোনমতেই যাতে কমে না যায় এবং জমিদাররা যাতে বহাল তবিয়তে থাকতে ও সরকারী রাজস্ব পরিশোধ করতে পারে, সেজন্য অবাধে খাজনা ধার্য করার অধিকারের উপর জমিদারদের আরো ক্ষমতা দেওয়া হল রাইয়তদের বেশি বেশি শোষণ ও দলন করবার জন্য। সেজন্য জারি করা হল কুখ্যাত "হফ্‌তম" আইন (১৭৯৯ সনের সপ্তম রেগুলেশন)। হফ্‌তম আইনে রাইয়ত ও কৃষকদের উচ্ছেদ করবার জন্য জমিদারদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা দেওয়া হল। আইনে আরো বলা হল 'প্রজারা এক জমিদারের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় যেতে পারবে না, অন্য জমিদারের জমি চাষ করতে পারবে না, করলে জমিদার তাদের আটক বা কয়েদ পর্যন্ত করতে পারবে।

হফ্‌তম আইন ছিল সমস্ত প্রজা ও কৃষকের নিকট সন্ত্রাস ও আতঙ্কের বিষয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রজাদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা করেনি। হফ্‌তম আইন ছিল তার চেয়েও মারাত্মক। সর্বত্র তার বিরুদ্ধে

প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রকাশ পায়। তার কয়েক বছর পরে "পন্‌জম" আইন (১৮১২ সনের পঞ্চম রেগুলেশন) জারি হল। তখন তাদের বিপদ বাড়ল বই কমল না। এতে বলা হল জমিদাররা যেকোন হারে খাজনা ধার্য করে প্রজাদের পাট্টা দিতে পারবে। অর্থাৎ খাজনার হার নির্ধারণ করার এবং জমি থেকে প্রজাকে উচ্ছেদ করা বা না করার ষোলআনা অধিকার ছেড়ে দেওয়া হল জমিদারের ইচ্ছার উপর।

প্রজার ফসল কেড়ে নেবার জন্য ক্রোকের অধিকার জমিদারকে আগেই দেওয়া হয়েছিল, ১৭৯৩ সনের আইনে। পন্‌জম এখন সেই অধিকারকে বিধিসঙ্গত ও পাকা করে দিলে, তাদের ডাকাতির সুযোগ বাড়িয়ে দিলে। এই আইনে কদিমি প্রজা যারা, দীর্ঘকাল ধরে যারা একই নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিয়ে জমি ভোগ দখল করে এসেছে, তাদেরও খাজনার নিরিখ পরিবর্তন করবার, এমনকি তাদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করবারও অধিকার দেওয়া হল।

এইভাবে রাইয়ত ও কৃষকদের সর্বনাশ করার জন্য জমিদারদের হাতে কোম্পানীর সরকার এই সমস্ত শোষণ ও অত্যাচারের সুযোগ ও অধিকার দিয়েছিল তার নিজের অমানুষিক শোষণের স্বার্থে। জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে যেমনি তেমনি সেই সরকারের বিরুদ্ধেও তাই বাংলার মধ্যে বারে বারে কৃষকদের এত বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান।

খাজনা আইন

শেষে বড়লাট ক্যানিং-এর সময়ে পাস হল বঙ্গীয় খাজনা আইন (বেঙ্গল রেণ্ট অ্যাক্ট—১৮৫৯ সনের দশ আইন)। কিন্তু তাতেই বা প্রজাদের সুবিধা হল কতটুকু? জমিদারদের যে শোষণ ও অত্যাচার প্রজাদের উপর চলছিল তার বিশেষ কোন প্রতিকার এই আইনের দ্বারা করা হয়নি। ফসল লুটের জন্য ক্রোকের অধিকারও থেকে গেল।

এই খাজনা আইনে অবশ্য ব্যবস্থা ছিল যে প্রজারা পাট্টা পাবার অধিকারী এবং জমিদাররা আর প্রজাদের আটকে রাখতে পারবে না। আরো ছিল যে ১২ বছরের দখল থাকলে জমিতে দখলী-স্বত্ব হবে। কিন্তু তা প্রমাণ করবার মতো দলিল বা পাট্টা রাইয়তের ছিল না। এদিকে খাজনা বৃদ্ধি করার সুযোগ জমিদারদের যথেষ্টই থাকল। যেসব প্রজার কোন লিখিত দলিল ছিল না তাদের খাজনা ইচ্ছামতো বাড়ান চলত। জমিদার-

দের সমিতি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রজাদের পাট্টা কবুলিয়ত পাবার অধিকারের বিরোধিতা করেছিল, যদিও এই সমিতির সাক্ষ্যেই বলা হয়েছিল যে প্রজাদের ষোলআনার মধ্যে মাত্র এক আনার লিখিত পাট্টা ছিল।

খাজনা আইনে রাইয়তদের যেটুকু সুবিধা পাবার সম্ভাবনা ছিল তাও পাওয়া গেল না, কারণ আইনের ব্যবস্থাগুলির স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়নি বলে ১৮৬২ সনে হাইকোর্ট আইনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অসুবিধার কথা ঘোষণা করলে। তাসত্ত্বেও আইনের সংশোধনের ব্যবস্থা করা হল না।

মোগল আমলে পরগনা রেট বা খাজনার হার কখনো বাড়ান হত না, নিরিখ ঠিকই রাখা হত। প্রয়োজন হলে খাজনার উপর সেস বা আবোয়াব ধার্য করা চলত। তাতে মোটামুটি খাজনার একটা স্থায়ী হার নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ১৮৫৯ সনের খাজনা আইনে জমিদাররা ইচ্ছামতো খাজনা বৃদ্ধির অধিকার পেলে। যারা স্থিতিবান রাইয়ত তাদেরও শর্তাধীনে খাজনা বাড়াবার সুযোগ দেওয়া হল—যদি তাদের জমির হার চারপাশের জমির চেয়ে কম থাকে, যদি উৎপন্ন শস্যের দাম বেড়ে থাকে, অথবা যদি জমি মাপে বেশি আছে বলে প্রমাণিত হয়। আসল কথা, ফসলের দর বৃদ্ধির দরুন রাইয়ত যদি পূর্বের তুলনায় কিছু বেশি আয় করে তারও একটা অংশ জমিদারকে ও সরকারকে পেতে হবে, যদিও চাষের ব্যয় বৃদ্ধির দায়টা পোয়াতে হবে কেবল রাইতকে।

জমিদার শ্রেণীর স্বেচ্ছাচার

১৭৯৩ থেকে ১৮৫৯ পর্যন্ত যুগটা ছিল জমিদারদের স্বেচ্ছাচারের যুগ। তারা পুলিসকে ঘুষ খাইয়ে নিজেদের তাঁবে রাখত, রাইয়তদের সন্ত্রস্ত রাখবার জন্য গুণ্ডা ও ডাকাত পুষত, হফ্তম ও পন্জম আইনের অপব্যবহার করত, তাদের অন্যায়ভাবে কাছারিতে ডাকিয়ে মারপিট করত ও আটক রাখত, অসম্পূর্ণ পাট্টা ও খাজনার ভুল রসিদ দিয়ে জব্দ করত। অনেক ক্ষেত্রে এ সমস্ত কাজ হয়ত সরাসরিভাবে করত কর্মচারীরা এবং মধ্যব্যক্তিরা, জমিদাররা নিজেরা নয়, কিন্তু এই উপায়ে রাইয়তদের একেবারে জমিদারের হাতের মুঠোয় রাখার ব্যবস্থাই হত, এবং সেই ব্যবস্থা অবশ্য জমিদাররা নিজেরাই চাইত। ১৮৫৯ সনের দশ আইন পাস করে রাইতদের রক্ষার ব্যবস্থা হল বটে কিন্তু তাতে তাদের -স্বত্বের যে দলিল দরকার ছিল তা

এই জমিদারী স্বেচ্ছাচারের যুগে কজনের পক্ষে পাওয়া বা রাখা সম্ভব ছিল ?

জমিদারী প্রথায় রাইয়তদের শোষণের জন্য জমিদার ও সরকারই ছিল না, জমিদাররা তাদের মতো আরো অনেক পরগাছা সৃষ্টি করে তাদের শোষক শ্রেণীকে পুষ্ট করেছিল। গবরমেণ্ট যেমন জমিদার শ্রেণীকে পয়দা করেছিল নিশ্চিন্তে বসে নির্ধারিত সময়ে তার তোশাখানায় রাজস্ব পৌঁছে দেবে বলে, তেমনি জমিদাররাও তালুকদার, পত্তনিদার ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের অধীন জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী পয়দা করে নিজেদের বাঁধা আয় নিশ্চিন্তে বসে ভোগ করবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল ; জমিদারীর বাইরে গিয়ে স্থায়ীভাবে শহরে বসবাস করেও সে সুযোগ পেতে বাধা হত না। তার ফলে রাইয়তদের শোষণের মাত্রা ক্রমে বেড়েই যাচ্ছিল ; জমিদারদের নিচে পর পর বিভিন্ন স্তরে যে সমস্ত মধ্যস্বত্বভোগী ছিল তারা প্রত্যেকেই উপরের জমিদারের বা অন্য মধ্যস্বত্বের পাওনা মিটিয়ে নিজের একটা আয় রাখত; এবং সে সবেরই বোঝা শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ত রাইয়তের উপর। ১৮৭৬-৭৭ সনের একটা অসম্পূর্ণ সরকারী হিসাব থেকে দেখা যায় দেড় লক্ষ জমিদারের নিচে ন' লক্ষ মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ তখনি গড়ে এক একটি জমিদারী এস্টেটের মধ্যে (৬) ছটি করে মধ্যস্বত্ব।

জমিদারী প্রথায় রাইয়ত ও কৃষকদের শোষণ এখানেই শেষ হয়নি। খাজনা ছাড়া ছিল সালামী। খাজনা বাকী পড়লেই অর্থাৎ কিস্তি খেলাফী হলেই টাকায় চার আনা সুদ। জমিদারের কর্মচারী হিসাবে গোমস্তা খাজনার হিসাব করবে, সেজন্যও প্রজাকে দিতে হবে গোমস্তার তহুরি বা হিসাবানা। পাল-পার্বনে দিতে হবে পার্বনী, তার হকদার নায়েব, গোমস্তা, তহসিলদার, মুহুরি, পাইক, পেয়াদা, নগদি সকলেই। আষাঢ় মাসে (প্রথম কিস্তি) খাজনা আদায়ের নববর্ষ পুণ্যাহ উপলক্ষে নজর দিতে হবে জমিদারকে, জমিদারীর যত শরিক আছে প্রত্যেককে পৃথকভাবে, তাছাড়া নায়েব গোমস্তাকেও দিতে হবে। জমিদার বাড়ি বিবাহ বা অন্নপ্রাশন হবে, তার জন্য মাঙ্গন চড়বে প্রজাদের উপর হয়তো টাকায় চার আনা হিসাবে, তাও দিতে হবে।

মহাজন ও নীলকরের শোষণ

এমনি অনেক খাতে বাজে আদায়ীর ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময়

বেগার দিতেও হত। তার উপর জমিদার প্রয়োজন বোধ করলে প্রজার জমির ফসল ক্রোক করতে পারত। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কারণে প্রজার নামে সত্য বা মিথ্যা নালিস হলে জরিমানা ও মারধর করতে পারত। এইসব বিষয়ে প্রজাকে জব্দ বা হয়রান করবার জন্য জমিদারের পেয়াদা নিযুক্ত হলে তার রোজ আদায় করা হত সেই নির্যাতিত প্রজার নিকট থেকেই। তারপর সরকারী আদালতের মামলা তো ছিলই; মামলার রায় যেত সাধারণত জমিদারেরই পক্ষে।

এরই সঙ্গে আরো শোষণের ব্যবস্থা হল মহাজনের ও নীলকরদের শোষণ। মহাজনী কারবার ইংরেজ শাসনের পূর্বেও ছিল কিন্তু ইংরেজ সরকার তাকে বিধিবদ্ধ করে। মহাজনী শোষণ প্রধানত জমিদারী ব্যবস্থারই আনুষঙ্গিক এবং বহু জমিদারও ছিল মহাজন। জমিদারের বিভিন্ন রকমের পাওনা মিটিয়ে রাইয়তের পক্ষে সংসার চালানো ও চাষের কাজ চালানো কঠিন, হয়তো সম্ভবই নয়। তখন মহাজনের দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নাই। খোরাকীর ধান কর্জ নিলে মহাজন মাত্র কয়েক মাসের মিয়াদেই দেড়া হিসাবে সুদ আদায় করবে। টাকা কর্জ করলেও চড়া হারে সুদ দিতে হবে।

এই সমস্ত বর্বর সামন্তবাদী শোষণ ও সরকারের পুঁজিবাদী ট্যাক্সের জুলুম সহ্য করতে করতে যখন তা নেহাতই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেত তখন কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠত।

বিদ্রোহ শুধু বাংলাদেশেই নয়, একই ধরনের শোষণ ও উৎপীড়নের ফলে বাংলার বাইরেও ঘটে। এই সমস্ত কৃষক-বিদ্রোহের মধ্যে বিশেষভাব উল্লেখযোগ্য ২৪ পরগনা জেলার বারাসাতে তিতুমীরের ওয়াহাবী কৃষক বিদ্রোহ, ফরিদপুর জেলায় দুদুমিয়ায় ফারায়েজী কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহ, নীলচাষীদের বিদ্রোহ, ও পাবনা-বগুড়ার কৃষক বিদ্রোহ, এবং বাংলার বাইরে দাক্ষিণাত্যের কৃষক বিদ্রোহ ও মালাবারের মোপলা কৃষক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে।

ওয়াহাবী কৃষক বিদ্রোহ

২৪ পরগনা জেলার বাদুড়িয়া থানা এলাকায় যে ওয়াহাবী বিদ্রোহ হয় এবং ফরিদপুর জেলায় যে ফারায়েজী বিদ্রোহ হয় তা ছিল মূলত কৃষক

বিদ্রোহ। দুই বিদ্রোহই আরম্ভ হয় মুসলমান কৃষকদের মধ্যে কিছু সংস্কার-মূলক ধর্মমত প্রচারকে অবলম্বন করে। কিন্তু ক্রমে তা জমিদার-মহাজনদের ও নীলকুঠিগুলির অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম কৃষকদের শ্রেণী সংগ্রামের রূপ নেয়। পরে এই সংগ্রাম শোষক শ্রেণীদের রক্ষক ইংরেজ সরকারের কৃষক-বিরোধী অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রাজনীতিক সংগ্রামের পর্যায়ে উঠে যায়। তখন স্থানীয়ভাবে স্বাধীন শাসনব্যবস্থা পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়।

বারাসাতের ওয়াহাবী বিদ্রোহ নামে পরিচিত কৃষক অভ্যুত্থানের নেতা ছিলেন মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। ১৭৭২ সনে বাদুড়িয়া থানার হায়দারপুর গ্রামে এক গৃহস্থের ঘরে তিতুমীরের জন্ম। মক্কায় হজ করতে গিয়ে তিনি ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা ও পরে বেরিলীর বিদ্রোহী যুদ্ধের অধিনায়ক সৈয়দ আহমদ ব্রেলবির নিকট ওয়াহাবী মত গ্রহণ করে ফিরে আসেন ও তাঁর এলাকায় সেই মত প্রচার করতে থাকেন। বহু মুসলমান কৃষক সেই মত গ্রহণ করে এবং খানিকটা সংঘবদ্ধ হয়ে উঠে।

জমিদার-মহাজনদের ও নীলকরদের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে এই সমস্ত কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ ছিল। তার উপর সেই অঞ্চলের হিন্দু জমিদার মুসলমানদের প্রত্যেকের দাড়ির উপর আড়াই টাকা করে কর ধার্য করে এবং অন্যান্য জমিদাররাও তার অনুসরণ করতে থাকে। তাই দেখে মুসলমান কৃষকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তিতুমীর কৃষকদের এই কর দিতে এবং জমিদারদের কাছারীতে যেতে নিষেধ করেন। তখন জমিদার তাদের একটা গ্রাম আক্রমণ করে।

এইভাবে দুই পক্ষে সংঘর্ষ বাধে। ইংরেজ নীলকররা জমিদারদের সাহায্য করে। গোঁড়া মুসলমান মোল্লারা ও জমিদাররাও ওয়াহাবী নীতির বিরোধিতা করে। ফলে বিরোধটা আর ধর্মের পর্যায়ে না থেকে স্পষ্টভাবে শ্রেণীসংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে। দুই পক্ষে যখন এই শ্রেণীসংঘর্ষ চলতে থাকে তখন হিন্দু মুসলিম সকল কৃষকই জমায়েত হয় একদিকে, অন্যদিকে মিলিত হয় হিন্দু ও মুসলমান জমিদার-মহাজনরা। সরকারী নির্দেশে পুলিসকে এবং জেলার জজ ম্যাজিস্ট্রেটকে স্বভাবতই কৃষকদের বিরুদ্ধে শোষক শ্রেণীদের স্বার্থই দেখতে হয়। সরকার খোলাখুলি অত্যাচারী ধনীদের রক্ষার জন্য কৃষকদের বিরুদ্ধে হামলা শুরু করে।

তখন তাঁর মোকাবিলার জন্য তিতুমীর কৃষকদের ফৌজ গঠন করেন। মিসকিন শাহ নামে এক ফকির তাঁর শিষ্যদের নিয়ে তিতুমীরের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেন।

জমিদারদের আক্রমণের পর তিতুমীর ইংরেজ শাসনকে অস্বীকার করে নিজেকে মুসলিম শাসনের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন এবং জমিদারদের নিকট রাজস্ব দাবি করেন। ওয়াহাবী মুসলমানরা তাঁর ঘোষণার দাবি স্বীকার করে। জমিদাররা কিন্তু সংঘবদ্ধ হয়ে এবং নীলকরদের সাহায্য পেয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে কয়েক শ' সশস্ত্র লোকলস্কর সহ তিতুমীরের দলকে আক্রমণ করতে আসে। এই সংবাদ পূর্বেই জানতে পেরে তিতুমীর নিজের ফৌজ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, এখন আক্রমণকারীদের ঘিরে ফেলে তাদের পর্যুদস্ত করেন।

এই জয়ের ফলে তাঁর শক্তি ও মর্যাদা দুই-ই বৃদ্ধি পায়। তিনি এক হাজার লোকের এক বাহিনী গঠন করে ফেলেন, তবে তাঁর পক্ষে অস্ত্র ছিল নিতান্ত সেকেলে ধরনের। তাহলেও জমিদার-মহাজন-নীলকরের দল নিজেদের এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়, পুলিসও পালায়।

খাজনা ও নীল চাষ বন্ধ

তিতুমীর কৃষকদের নির্দেশ দেন জমিদারদের খাজনা বন্ধ করতে এবং অধিকাংশ হিন্দু-মুসলিম প্রজা তা মেনে নেয়। কৃষকরা খাজনার সঙ্গে নীল চাষও বন্ধ করে দেয়। এসব অঞ্চলে তিতুর শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়। সেখানে অত্যাচারী নীলকরদের কুঠিগুলিকে লুট ও ধ্বংস করার ব্যবস্থা হয়। বিরোধিতা করার ফলে কোন কোন গ্রামের ধনী মুসলমানদের বাড়িও লুট করা হয়। কুঠিয়ালরা কুঠি ছেড়ে কলকাতা গিয়ে আশ্রয় নেয়।

ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিতুমীর যখন তাঁর স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন এবং হিন্দু-মুসলিম কৃষকরা তা মেনে নেয়, তখন তিনি তাঁর প্রধান ঘাঁটি নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে আত্মরক্ষার জন্য তাঁর প্রসিদ্ধ বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। কিন্তু ১৮৩১ সনের ১৪ই নভেম্বর ইংরেজ সরকারের কামানের আক্রমণ প্রতিরোধ করা এই কেল্লার পক্ষে সম্ভব হয় না। তিনি নিজেও গোলার আঘাতে আহত হয়ে মারা যান।

তখন তাঁর দলের শত শত লোককে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করে

নির্যাতন করতে থাকে, দীর্ঘমিয়াদী সাজা দেয়। তাঁর ভাগনে ও সেনাপতি গোলাম মাসুমকে কেল্লার সামনে ফাঁসী দেওয়া হয়।

তিতুমীরের নেতৃত্বে এই কৃষক বিদ্রোহ স্থায়ী হয়েছিল মাত্র এক বছর (১৮৩০-৩১)। এ ধরনের সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল না। সেই কারণে বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য স্থায়ী নেতৃত্ব ও উপযুক্ত সংগঠন তৈরি করা হয়নি। তাই তিতুমীরের মৃত্যুর ও বাঁশের কেল্লা ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্রোহের অবসান হয়। শুধু তা রেখে যায় কৃষকদের জন্য পরবর্তী সংগ্রামের প্রেরণা।

ফারায়েজী কৃষক বিদ্রোহ

ফরিদপুর জেলার হাজি শরিয়তুল্লাহ্‌র পুত্র মোহম্মদ মোহ্‌সিন ওরফে দুদুমিয়ার নেতৃত্বে যে ফারায়েজী আন্দোলন হয় তাও প্রথমে ওয়াহাবী ধরনের ধর্মমত প্রচার থেকে শুরু হয় এবং কৃষক সংগ্রামে পরিণত হয়। এই আন্দোলনেরও গতি-প্রকৃতি অনেকটা বারাসাতের আন্দোলনেরই মতো। সেখানেও কৃষকদের উপর নানারকম শোষণ ও উৎপীড়ন চলছিল এবং সেই শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে রীতিমতো শ্রেণীসংঘর্ষে পরিণত হয়েছিল। অত্যাচার শুধু জমিদাররাই করত না, কৃষকদের উপর সরকারী অন্যায় অবিচারও হামেশা চলত।

তাই কৃষকদের নেতা হিসাবে দুদুমিয়াও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন এবং পালটা শাসনব্যবস্থা ও বিচারের জন্য আদালত কায়েম করেন। এই আন্দোলন চলে প্রায় দশ বছর (১৮৩৮-১৮৪৮)।

পরে সরকার ও পুলিশ বারবার দুদুমিয়াকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে আন্দোলনকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাঁকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রান করে।

ফারায়েজী ধর্মমতের প্রচারের ক্ষেত্র ছিল ঢাকা, খুলনা প্রভৃতি জেলাতেও কিন্তু কৃষকদের আন্দোলন ও সংগ্রাম সীমাবদ্ধ ছিল ফরিদপুর জেলায়। এখানেও আন্দোলনের জন্য স্থায়ী নেতৃত্ব গঠন করা হয়নি; দুদুমিয়া নিজেই ছিলেন একমাত্র নেতা।

১৮৬০ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর হিন্দু-মুসলিম কৃষকদের শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের নেতা দুদুমিয়ার মৃত্যু হয় তাঁর জন্মস্থান ও বাসস্থান

বাহাদুরপুর গ্রামে। তাঁর মৃত্যুর পর জমিদার-মহাজন-নীলকরদের শোষণ ও জুলুমের এবং পুলিস ও সামরিক বাহিনীর অত্যাচার ও আক্রমণের মুখে ফারায়েজীদের সংগ্রামী শক্তি ভেঙ্গে যায়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ

উনবিংশ শতকে সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষকরা জমিদার, মহাজন ও ব্যাপারীদের শোষণের বিরুদ্ধে এবং সরকারী অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল অনেকবার—১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১, ১৮৫৫-৫৬, ১৮৭১, ১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৮০-৮১ সনে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ও ব্যাপক বিদ্রোহ হয় ১৮৫৫-৫৬ সনে। বাংলাদেশে কৃষক সভা এই বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উদযাপন করে। এই বিদ্রোহের এলাকা ছিল তখনকার বীরভূম জেলা, বিহারের ভাগলপুর জেলার বিস্তীর্ণ অংশ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশ। এই সমস্ত অঞ্চলের অধিকাংশ এখন বিহারের সাঁওতাল পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত।

এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা "সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী" নামে একটি পুস্তিকা এবং তার সাঁওতালী অনুবাদ "হড় হপন কোয়া বিরাদ কাহনী" প্রকাশ করে এবং তারই বিবরণ অবলম্বন করে বহু চিত্র পোষ্টার আঁকিয়ে বিভিন্ন জেলায়, বিশেষত বীরভূম জেলার সাঁওতাল-প্রধান অঞ্চলে প্রদর্শন করে।

এই বিদ্রোহের মূলে ছিল যে কোন কৃষক বিদ্রোহের মতো জমিদার-মহাজনদের বর্বর শোষণ ও পীড়ন এবং সরকারী আমলা ও পুলিসের অমানুষিক নির্যাতন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যাপারীদের শোষণ ও প্রতারণা। এই শোষণ ও নির্যাতন কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচণ্ড বিক্ষোভের কারণ হয়ে পড়ে, এবং যখন তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন থেকেই বিদ্রোহের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে থাকে। ধীরে ধীরে তার প্রচার ও সংগঠনের কাজ শুরু হয়ে যায়। তাদের মধ্যে শোষিত শ্রেণী হিসাবে শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রেণী চেতনা জাগতে থাকে।

মহাজনের শোষণের ফলে কৃষকদের গরু মহিষ থেকে তৈজসপত্র পর্যন্ত নিলাম হয়ে যেত, জমিও চলে যেত জমিদার-মহাজনদের হাতে। দেনার দায়ে অনেককে মহাজনের ঘরে সপরিবারে গোলাম হিসাবে

বাঁধা পড়ে থাকতে হত অথবা জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে অনাহারে মরতে হত।

শোষকদের বিরুদ্ধে কৃষকরা সরকারের নিকটও সুবিচার পেত না। সুবিচারের পরিবর্তে তাদের ভাগ্যে জুটত কেবল অবিচার ও পুলিসের জুলুম। শুধু জমিদার, মহাজন ও ব্যাপারীরাই তাদের শত্রু নয়, সরকারও তাদের দুশমন।

বিদ্রোহের প্রস্তুতির জন্য গোপনে রাত্রে রাত্রে বৈঠক চলতে থাকে। প্রথমে বীরসিং মাঝির নেতৃত্বে দল গঠিত হয়। খবরটা জানতে পেরে ধনী শোষকের দল ভয় পেয়ে পুলিসকে ও পাকুড় রাজ-এস্টেটকে জানায়। পাকুড়রাজের দেওয়ান জগবন্ধু রায় বীরসিংকে কাছারিতে ডাকিয়ে জরিমানা করে ও নিষ্ঠুরভাবে জুতাপেটা করে। নেতা বীরসিং-এর এই অপমান সাঁওতালদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা জাগায়। সকলেই চায় এই শোষণ ও জুলুমের, অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তির পথ পেতে। সেই পথই ছিল বিদ্রোহের পথ।

গণতান্ত্রিক ফরমান

ভগনাডিহি গ্রামে বাস করতেন দুই ভাই সিধু ও কানু। তাঁদের নেতৃত্বে তাঁদেরই গ্রামে ৩০শে জুন ১৮৫৫ সনে জমায়েত হয় দশ হাজার সাঁওতাল কৃষক। সভা থেকে ফরমান জারি হল: (১) জমির জন্য কোন রকম খাজনা দেওয়া হবে না এবং প্রত্যেকেরই অধিকার থাকবে যত খুশি জমি চাষ করবার; (২) সমস্ত ঋণ বাতিল হবে; এবং (৩) সাঁওতালরা নিজেদের মুলুক দখল করে নিজেদের সরকার কায়েম করবে।

চিঠি লিখে এই ফরমানের কথা জানিয়ে দেওয়া হল গবরমেণ্টকে, কমিশনারকে, ভাগলপুর ও বীরভূমের কালেকটর ও ম্যাজিস্ট্রেটদের, দিঘি ও রাজমহল থানার দারোগাদের এবং কয়েকজন জমিদারকে ও অন্যান্যকে। ভগনাডিহির এই সিদ্ধান্ত ছিল বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত। জমিদারদের নামে চিঠিগুলি ছিল চরমপত্র। বিদ্রোহের মূল দাবি ছিল: জমি চাই, মুক্তি চাই।

বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত ছিল সাঁওতাল কৃষকদেরই সিদ্ধান্ত। কিন্তু তার পিছনে সমর্থন ছিল স্থানীয় বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান কৃষক ও কারিগরদের। সমস্ত অত্যাচারী ধনীর বিরুদ্ধে সমস্ত শোষিত গরিব ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

"ভগনাডিহির উদাত্ত আহ্বানে সাঁওতাল-অসাঁওতাল সমস্ত শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের জমাট বিক্ষোভ সশস্ত্র বিদ্রোহের আকারে ফাটিয়া পড়িল। জমি চাই, মুক্তি চাই—এই আওয়াজ সমস্ত সাঁওতাল ও অন্যান্য গরিবদের মাতাইয়া তুলিল। এই নূতন প্রেরণা তাহাদের মন হইতে বাধা ও সংকোচ দূর করিয়া দিল। এখনকার মতো স্থায়ী আন্দোলন ও সংগঠন তখন ছিল না, কিন্তু জমি ও মুক্তির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মনে গভীর সংগ্রামী চেতনা আনিয়াছিল।" (আবদুল্লাহ রসুল—সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী, পৃঃ ১৪)

বিদ্রোহ ব্যাপক আকারে দেখা দিল। বিদ্রোহে মোট ৩০ থেকে ৫০ হাজার সাঁওতাল অস্ত্র ধারণ করেছিল। সরকারী তরফে ১২ থেকে ১৪ হাজার সুসজ্জিত সৈন্য তার মোকাবিলা করতে নেমেছিল। জমিদার-মহাজনরা সাধ্যমতো সাহায্য দিয়েছিল। সরকার কেবল যুদ্ধই করে না, গণহত্যা করতে এবং সাঁওতাল গ্রামগুলি ধ্বংস করতেও থাকে। ১০ই নবেম্বর ১৮৫৫ তারিখে সামরিক আইন জারি হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুদ্ধে পরাজয় সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সরকার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। যুদ্ধে আত্মসমর্পণ না করে কৃষকরা মরণপণ সংগ্রাম করতে থাকে।

২৫ হাজার বিদ্রোহী নিহত

দীর্ঘ আট মাস কাল অনেকগুলি ক্ষেত্রে যুদ্ধের পর বিদ্রোহ ধীরে ধীরে থেমে যায়। কিন্তু সরকার তখনো প্রতিহিংসা নিতে ক্ষান্ত হল না। বন্দী হিসাবে ৫২ খানা গ্রামের মোট ২৫১ জনের বিচার হল, তার মধ্যে ১৯১ জন ছিল সাঁওতাল কৃষক, বাকি অসাঁওতাল কৃষক, কারিগর প্রভৃতি এবং ৪৬ জন ৯।১০ বছরের বালক। বালকগুলিকে বেত মেরে ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্যদের সাত থেকে চোদ্দ বছরের মিয়াদে সাজা দেওয়া হয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে ও তার বাইরে ১৫ থেকে ২৫ হাজার সাঁওতালকে সরকার হত্যা করে।

"বিদ্রোহ তার দাবি আদায় করিতে পারে নাই। বীর সাঁওতাল কৃষকরা প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া ও হাজারে হাজারে জীবন দান করিয়া বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও ভাগলপুর জেলার বিস্তৃত এলাকা সামরিকভাবে দখল করিয়া লইলেও বিদ্রোহ স্থায়ীভাবে বিজয়ী হইতে পারে নাই। কিন্তু সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহীদের এই সংগ্রাম বাংলার ও ভারতের কৃষক

সংগ্রামের ঐতিহ্যকে আরো উজ্জ্বল ও গৌরবময় করিয়াছে, বিদ্রোহীদের বীরত্বের কাহিনী পরবর্তী কৃষক সংগ্রামে প্রেরণা যোগাইয়াছে, সারা দেশের ইতিহাসে সংগ্রামী জনগণের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। তাই সাঁওতাল বিদ্রোহের বীর শহীদদের নাম আজো আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি, আজো তাঁদের লাল সালাম জানাই।" (আবদুল্লাহ রসুল, সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী, পৃঃ ২২।)

কিন্তু বিদ্রোহের দাবি সম্পূর্ণ পূরণ না হলেও গবরমেণ্টকে তা অনেক পরিমাণে মানতে হয়েছিল। গবরমেণ্ট তাদের কার্যত একটা জাতীয় মাইনরিটি বা সংখ্যালঘু জাতি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। সাঁওতালদের বাসের ও কৃষির জন্য রাজমহল সমেত বীরভূম ও ভাগলপুর জেলার বিস্তীর্ণ অংশ নিয়ে নতুন জেলা সাঁওতাল পরগনা গঠন করেছিল। সেখানে অনেক সাঁওতাল কৃষক কিছু জমিও পেয়েছিল। অন্যান্য বিষয়েও শোষণ-পীড়নের তীব্রতা কমেছিল। তবে সেই সঙ্গে তাদের এলাকায় বাঙালীদের অবাধ যাতায়াত বন্ধ করে খ্রিষ্টান মিশনারিদের পাঠিয়ে তাদের "সভ্য" করবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

জমি, খাজনা, সুদ, ট্যাক্স, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সাঁওতালদের যেটুকু সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছিল তা অবশ্যই প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম ছিল। কাজেই তাদের শোষণ চলতে থাকে এবং ক্রমে বাড়তেও থাকে। সেই কারণে এই বিদ্রোহের পরও তাদের মধ্যে আরো কয়েকবার ব্যাপক গণবিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল।

নীল চাষীদের বিদ্রোহ

বাংলাদেশের উনবিংশ শতকের সমস্ত কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক হয়েছিল নীল চাষীদের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ঘটেছিল পুরোপুরি কৃষকদের অর্থনীতিক দাবির ভিত্তিতে, দেশী-বিদেশী সমস্ত নীলকরদের বিরুদ্ধে, সমগ্রভাবে নীল চাষেরই বিরুদ্ধে, যদিও তার প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংরেজ নীলকরদের বর্বর শোষণ ও অমানুষিক নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষা করা। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত নীল চাষীই যোগদান করেছিল। এই বিদ্রোহ সফল ও সার্থক হয়েছিল।

বস্ত্রশিল্পের কাজে প্রচুর পরিমাণ নীলের প্রয়োজন ছিল। ফলে নীলের

চাষ অত্যন্ত লাভজনক হবে বুঝে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কিছু অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আর কিছু ইংরেজ ছোকরা বাংলা ও বিহারের জমিদারদের নিকট জমি বন্দোবস্ত নিয়ে নীলের চাষ আরম্ভ করে। নীল চাষের স্বার্থে তারা প্রথম থেকেই যেভাবে এদেশের কৃষকদের উপর পাশবিক নির্যাতন ও প্রতারণা চালাতে থাকে তাই দেখে ভারত সরকারকে পর্যন্ত ১৮১০ সনে নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দিতে হয়। অবশ্য সে হুঁশিয়ারির ফল তেমন কিছু হয়নি, নীলকররা তাদের জুলুমবাজি সংযত করার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেনি।

নীলকররা নিজ নিজ কুঠি এলাকায় কৃষকদের দিয়ে জবরদস্তি নীল চাষ করাত, সেজন্য খুশিমতো কৃষকদের সেরা জমিগুলি বেছে নিত, সেসব জমিতে কৃষকদের নিজেদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মোতাবেক ফসল বুনতে দিত না। চাষের জন্য কৃষকদের যে দাদনী টাকা দিত তা দেওয়া ও আদায় করা সম্বন্ধে তাদের ঠকাত। আর নীলের ফসল উঠলে তারা জমির পরিমাণ, নীলের মাপ বা ওজন এবং নীলের দর সম্বন্ধেও কৃষকদের নানা কৌশলে বঞ্চনা ও প্রতারণা করত। এ সকল বিষয়ে কৃষকরা কোন রকম আপত্তি জানালে তাদের মারপিট তো করতই, অনেক সময় খুন পর্যন্ত করে লাস গুম করে ফেলত। তার বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য ইংরেজ সরকারের আইন আদালতের সাহায্য পাওয়া কৃষকদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল; আদালতে গেলেও সুবিচার পাওয়া যেত না।

নীলকররা থাকত গ্রামাঞ্চলে তাদের কুঠিতে। শুধু নীল উৎপাদনের ব্যাপারে তারা কৃষকদের উপরে শোষণ ও জুলুম চালিয়েই ক্ষান্ত থাকত না, সামাজিকভাবেও গ্রামের মানুষকে পীড়ন করত। অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির বৌঝিদের পর্যন্ত জোর করে ধরে নিয়ে যেত তাদের কুঠিতে এবং তাদের মানইজ্জতের প্রশ্নকে আমলই দিত না। তাদের এই সমস্ত বর্বর আচরণে সাহায্য করত তাদের দেশীয় কর্মচারীরা, পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজরা।

ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ

এছাড়া অনেক সময় আক্রোশের বশে তারা কৃষকদের জমির ফসল ধ্বংস করত, জিনিসপত্র ও গরুবাছুর লুট করে নিয়ে যেত, ঘরে আগুন দিয়ে সর্বস্বান্ত করে দিত। কৃষকরা বা গ্রামবাসীরা প্রতিকারের জন্য আদালতের

আশ্রয় নিলে অথবা সরকারের নিকট প্রার্থনা জানালে নীলকররা আরো ক্ষেপে উঠত।

এই সমস্ত উৎপীড়ন কৃষকরা দীর্ঘকাল বরদাস্ত করতে করতে আর যখন পারে না তখন তাদের মধ্যে বিক্ষোভ প্রকাশ পেতে থাকে। বিক্ষোভ কেবল কৃষকদেরই মধ্যে নয়, সমগ্র জনসাধারণের মধ্যেই দেখা দেয়। এই অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে নদীয়ার জেলা জজ স্কোন্স্ একটা তদন্ত কমিশন নিয়োগ করার জন্য ১৮৫৪ সনে গবরমেণ্টকে অনুরোধ জানান। গবরমেণ্ট সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করে।

জনগণের এই বিক্ষোভ কেবল নদীয়া জেলাতেই নয়, বাংলাদেশের বহু জেলাতেই, সকল নীলচাষ অঞ্চলেই প্রকাশ পায়। বিশেষভাবে তা দেখা দেয় মধ্যবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে—নদীয়া, বারাসাত, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ ও দিনাজপুর জেলায়।

কলকাতায় হরিশ মুখার্জির "হিন্দু পেট্রিয়ট", শিশির ঘোষের "অমৃত বাজার পত্রিকা" প্রভৃতি কাগজে নীলকরদের অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে প্রচার হতে থাকে। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর বিখ্যাত নাটক "নীল দর্পণ"এ এই অত্যাচারের কাহিনীর চিত্র তুলে ধরেন। ইংরেজ মিশনারিদের মধ্যেও অনেকে, বিশেষ করে রেবরেণ্ড জেমস লং নীল চাষীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধে একখানা পুস্তিকাও লেখেন। তাঁকে এই বিষয়ে অন্যায় মামলায় জড়িয়ে জেলে পাঠানো হয়।

পরিস্থিতি ক্রমে বিস্ফোরক পর্যায়ে এসে পড়ে। তাই দেখে খোদ নীলকররাও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তাদের বিরুদ্ধে একটা কৃষক অভ্যুত্থান দমনের উপযুক্ত আশু ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানায়।

সাধারণ ধর্মঘট

শেষে নীলচাষীদের গণ-অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়ে যায় ১৮৬০ সনের এপ্রিল মাসে। বারাসাত মহকুমার সমগ্র কৃষক সমাজ নীলচাষের বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্মঘটে শামিল হয়। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘট বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মতো—প্রায় তামাম বাংলা দেশে।

বাংলার ছোটলাট গ্রাণ্ট পূর্ববঙ্গে নদীপথে স্টীমারে ভ্রমণের সময়ে সমস্ত পথের দুধারে নদীতীরে হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষের জমায়েত দেখে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। গ্রাণ্ট কৃষক নেতাদের সঙ্গে আলাপ

আলোচনা করে এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন যে কৃষকদের অভিযোগের প্রতিকারের ও দাবিপূরণের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

সরকার বাধ্য হয়ে তখন একটা ঘোষণাপত্র জারি করেন। তাতে এই নির্দেশ দেওয়া হল যে কৃষক তার জমিতে নিজের খুশিমতো ফসল বুনবে, নীলকর জবরদস্তি তাকে নীলচাষ করাতে পারবে না, এবং এ বিষয়ে পুলিসের কাজ হবে রাইয়তকে রক্ষা করা; নীলকর যদি দাবি করে কৃষক নীল বুনবে বলে তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাহলেও সে তার জোর খাটাবে না, তার বিচার করতে পারে দেওয়ানী আদালত।

এই ঘোষণাই ছিল নীলবিদ্রোহের জয়লাভের ও সফলতার নিশ্চিত স্বীকৃতি। কৃষকদের ধর্মঘট বিজয়ী হল। তার ফলে কেবল বাংলাদেশে নয়, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের অনেক জেলাতেও নীলচাষ উঠে গেল।

এই বিদ্রোহ ছিল নীলকরদের পাশবিক উৎপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে উৎপীড়িত নীলচাষীদের কঠোর সংগ্রামী সংকল্প ও অসাধারণ একতা দ্বারা ব্যাপক প্রতিরোধের পরিণতি। নীলচাষ সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য সরকার যে নীল তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে তার রিপোর্টেও স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করা হয়েছে নীলচাষীদের নীল-বিরোধী কঠোর মনোভাব ও সুদৃঢ় সংকল্পের কথা।

"নীলচাষীদের বিদ্রোহ ছিল বাংলার কৃষক সমাজের একটা বৃহৎ, ব্যাপক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গণ-অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানে রাইয়ত বা কৃষকরা যোগদান করেছিল শ্রেণী হিসাবে, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে; ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রশ্ন এর মধ্যে স্থান পায়নি, সে প্রশ্ন কেউ তোলেওনি। রাইয়ত বা কৃষক হিসাবে বিদ্রোহীদের সকলেরই লক্ষ্য ও দাবি ছিল এক।

"এই বিদ্রোহ যতটা সচেতন আকারে ঘটেছিল তার চেয়ে বেশি ছিল স্বতস্ফূর্ত—দীর্ঘকাল ধরে নীলকরদের হাতে কৃষকদের যে বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতি, লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল, তার গভীর অনুভূতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি বাংলার জনগণের মধ্যে যে নতুন সামাজিক চেতনার উন্মেষ দেখা গিয়েছিল, নীল বিদ্রোহের মধ্যে তারও কিছু লক্ষণ সুস্পষ্ট ছিল।

"এই বিদ্রোহ ছিল প্রধানত অর্থনীতিক হলেও তার রাজনীতিক চরিত্রও যে ছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না।" ("নীল বিদ্রোহের অমর

কাহিনী," আবদুল্লাহ রসুল, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা, ১৯৬০, পৃ ৪৩।)

"এই বিদ্রোহের ফলে বাংলাদেশের জনগণের চেতনার স্তর আরো উন্নত হয়েছিল, পূর্বেকার গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহ্য আরো উজ্জ্বল ও গৌরবমণ্ডিত হয়েছিল, ভবিষ্যৎ গণ-সংগ্রামের পথ আরো স্পষ্ট ও প্রশস্ত হয়েছিল; পরবর্তী কালের সংগ্রামের জন্য নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা হয়েছিল। সে অভিজ্ঞতা অল্পকালের মধ্যে কাজেও লেগেছিল, যখন ১৮৬৯-১৮৭৩ সনে জমিদারী অত্যাচারের প্রতিরোধের জন্য ময়মনসিং, ঢাকা, পাবনা ইত্যাদি জেলায় ব্যাপকভাবে খাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয়।"

পাবনা ও বগুড়ার কৃষক অভ্যুত্থান

১৮৫৯ সনের বঙ্গীয় খাজনা আইনে রাইয়তদের জন্য কিছু কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তা আইনের ত্রুটির জন্য তাদের বিশেষ কোন কাজে লাগে না। এই সময়ে নাটোরের জমিদারী ভেঙ্গে যায় এবং পাঁচ জন জমিদার তা কিনে নিয়ে খাজনা বাড়াতে চেষ্টা করে। অন্যান্য জমিদারীতেও সেই চেষ্টা হয়। তাই তখন আবার কৃষকদের বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। নতুন কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে পাবনা ও বগুড়া জেলায় (১৮৭২-৭৩)। জমিদারদের সঙ্গে কৃষকদের সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষের আশু কারণ ছিল অতিরিক্ত হারে খাজনা বৃদ্ধি। অন্যান্য জমিদারদের মধ্যে এই জমিদাররাও নানারকম আবোয়াব বা বাজে আদায়ও করত এবং তাকে খাজনার আনুষঙ্গিক বলেই ধরে নিত। আইনত খাজনা বাড়াতে হলে সরকারকে নোটিস দিয়ে জানিয়ে দিতে হত কিন্তু এখানকার জমিদাররা তাও করেনি।

খাজনা বৃদ্ধি করা ও আবোয়াব বৃদ্ধি করা ছাড়া এই জমিদাররা বেআইনী ভাবে কৃষক ও রাইয়তদের অন্যান্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত করার চেষ্টা করত। জমিদারদের সঙ্গে বিবাদ হলে রাইয়তদের উচ্ছেদ করা চলবে এই মর্মে তারা কবুলিয়তনামায় সই দেবার জন্য রাইয়তদের উপর চাপ দিচ্ছিল; বহু রাইয়ত সই দিয়েও ফেলেছিল। কিন্তু কয়েকখানা গ্রামে রাইয়তরা তার বিরুদ্ধে মিলিতভাবে প্রতিরোধ আরম্ভ করে। জমিদাররা তাদের নামে অতিরিক্ত খাজনা দাবি করে আদালতে মামলা রুজু করে। তখন কৃষকরা সেখানে আসল খাজনার টাকা জমা দিয়ে দেয় কিন্তু বেআইনী আবোয়াব

দিতে অস্বীকার করে। তা সত্ত্বেও আদালত রায় দেয় জমিদারদের পক্ষে।

কৃষকরা তখন রাজশাহীর জজ কোর্টে আপিল করে। জজ রায় দেন তারা যা জমা দিয়েছে তাই ন্যায্য খাজনা, তার বেশি দিতে তারা বাধ্য নয়। খাজনার হার নির্দিষ্ট ছিল আড়াই টাকা কিন্তু জমিদারেরা দাবি করেছিল পাঁচ টাকা দশ আনা। ফলে ১২৯টি পরিবার জমিদারদের এই জুলুম থেকে রেহাই পেলে।

এই রায়ের খবর ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে কৃষকদের মধ্যে। যে সমস্ত কৃষক জমিদারদের চাপে পড়ে আগেই কবুলিয়তে সই দিয়ে ফেলেছিল তারা এখন নামল সংগ্রামের পথে। তারা চাইলে কবুলিয়তগুলি কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে। কিন্তু সংগ্রামের দাবি শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না, সংগ্রামী রাইয়তরা আওয়াজ তুললে : জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই।

তখন যে সংগ্রাম আরম্ভ হল তাতে কৃষকদের কেবল জমিদারদের সঙ্গেই লড়তে হল না, লড়তে হল জমিদারদের শ্রেণীস্বার্থের রাজনীতিক পাহারাদার ইংরেজ সরকারের সঙ্গেও।

পাবনার কৃষকদের সংগ্রামের পর ভূমিসংক্রান্ত বিরোধ আইন নামে একটা অস্থায়ী আইন পাশ করে আদলতের কাজের ব্যবস্থা কিছু পরিবর্তন করা হয়। স্থায়ীভাবে আইনগত পরিবর্তনের জন্য ১৮৭৮ সনে একটা কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়।

এরই সমসময়ে বাংলার বাইরে দাক্ষিণাত্যে কৃষক অভ্যুত্থান (সরকারী ভাষায় "দাঙ্গা") ঘটে (১৮৭৫), মালাবারেও কৃষক বিদ্রোহ চলতে থাকে। এই ঘটনাগুলি বাংলাদেশের বিবরণের বিষয় না হলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে কিছু প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে এখানে তার উল্লেখ করা হচ্ছে। তাতে বোঝবার সুবিধা হবে যে এদেশে ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থায়, সে যে ধরনেরই ব্যবস্থা হ'ক না কেন, সর্বত্রই কৃষক ও রাইয়তদের উপর জমিদার ও মহাজনদের শোষণ-পীড়নের পদ্ধতিটা ছিল মোটামুটি একই ধরনের এবং কৃষকদের প্রতিরোধও হত একই ধরনে।

দাক্ষিণাত্যের কৃষক অভ্যুত্থান

মহারাষ্ট্রের পুনা ও আহমদনগর জেলায় কৃষকদের এই অভ্যুত্থান ঘটেছিল ১৮৭৫ সনে। এখানে ভূমি ব্যবস্থা ছিল জমিদারী প্রথায় নয়, রাইয়তওয়ারি প্রথায়। এই প্রথায় রাইয়ত ছিল আইনগত জমির মালিক এবং তারা রাজস্ব দিত সরাসরি সরকারকে। কিন্তু খাজনার হার ছিল চড়া, অধিকাংশ রাইয়তের ক্ষমতার অতিরিক্ত। ফলে খাজনা দেবার জন্য প্রয়ই তাদের মহাজনদের নিকট টাকা ধার করতে হত। মহাজনরা ছিল প্রধানত গ্রামের সরকারী হিসাবরক্ষক অথবা ছোটখাটো দোকানদার।

মহাজনের ঋণের জন্য কৃষকরা জমি বন্ধক রাখত ; বন্ধকী জমি অনেকেরই পক্ষে খালাস করা সম্ভব হত না, সেজন্য তারা সুদে আসলে ঋণের টাকা শোধ করতে পারত না। তখন মামলা করে মহাজনরা আদালতের ডিক্রির জোরে সেই বন্ধকী জমির মালিক হয়ে যেত। এইভাবে এক একজন মহাজন (সাহুকার বা সাউকার) প্রচুর জমির মালিক ও জমিদার হয়ে বসত, সে জমি নিজেরা চাষ না করে চড়া খাজনায় কৃষকদের নিকট বন্দোবস্ত দিত। এই সব জমিদার মূলত জমিদার ছিল না, মহাজন বা সাউকার ছিল বলে জমিদারদের সাধারণত সাউকারই বলা হত।

এই অবস্থা চলতে থাকায় অসংখ্য কৃষক যেমন নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, তেমনি সুদখোর ও প্রতারক মহাজনরা অতি দ্রুত ফেঁপে উঠেছিল। তারা ছিল কৃষক ও খাতকদের ঘৃণার পাত্র। সেই সঙ্গে তাদের পক্ষ নেওয়ার কারণে সরকারী আদালতগুলিকেও তারা ঘৃণার চোখেই দেখত। এইভাবে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা জেগে উঠেছিল।

আইন ছিল এই যে জমিতে ফসল হ'ক না হ'ক, ভূমি রাজস্ব সরকারকে দিতেই হবে। খাজনা বাকি পড়লে জমি হাতছাড়া হয়ে যাবে। খাজনা দিতে অক্ষম খাতকদের বন্ধকী জমিও সরকারের হাতে চলে যেতে পারে এই আশংকায় ব্যাপকভাবে যখন মহাজনরা ঋণ শোধের দাবিতে খাতকদের নামে মামলা করে, তখন তাদের মধ্যে অনেকেই জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যায় এবং জমি চলে যায় মহাজনদের হাতে। তখন ভূমিহীন বঞ্চিত কৃষকদের বিক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠে। ১৮৭৪ সনের ডিসেম্বর মাসে পুনা ও আহমদনগর জেলায় কৃষকদের মধ্যে অভ্যুত্থানের সূচনা দেখা দেয়।

দমন ব্যবস্থা

খাতকরা চেয়েছিল মহাজনের কাছ থেকে ঋণের চুক্তিনামা ও মামলার ডিক্রি ইত্যাদি দখল করে সেগুলি পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিতে। একজন বড় মহাজন তা দিতে অস্বীকার করলে তার খড়ের গাদায় আগুন দেওয়া হয়। তখন সে ভয়ে দলিলপত্র দিয়ে দেয় এবং তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

এই সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে। তখন আতঙ্কিত মাড়োয়ারী ও গুজরাতী মহাজনরা গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। তাদের রক্ষার জন্য পুলিসবাহিনী পাঠানো হয় "আইন ও শৃংখলা" রক্ষার নামে। সরকারী পুলিসের সওয়ার বাহিনী ও ফৌজ পর্যন্ত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কৃষকদের উপর। শত শত কৃষককে গ্রেপ্তার করা হল। প্রচণ্ড দমন ব্যবস্থার দ্বারা আপাতত কৃষকদের এই সংগ্রামকে সরকার দাবিয়ে দিলে। পরে জুন মাসে (১৮৭৫) আবার কৃষকরা বিদ্রোহ করে, কিন্তু তাতেও তাদের দাবী পূরণের ব্যবস্থা হয় না। কৃষকের ঋণ মকুব করার যে দাবি নিয়ে তারা লড়াই শুরু করেছিল সে দাবি তখনো তাদের মধ্যে থেকে গেল এবং কৃষকরা বুঝলে যে সরকার তাঁদের শ্রেণীশত্রু জমিদার-মহাজনদেরই পৃষ্ঠপোষক।

আন্দোলন তখনই সফল না হলেও তা জমিদারী ও মহাজনী ব্যবস্থাকে যে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে গিয়েছিল, তার ফলে সরকার ১৮৭৯ সনে দাক্ষিণাত্য কৃষিজীবী সাহায্য আইন পাস করে এবং কৃষক উচ্ছেদের ও সুদের হারের উপরে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে। তাছাড়া এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য সরকার যে কমিশন নিয়োগ করে তার রিপোর্টে কৃষকদের ঋণের জন্য সমগ্র ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকেই দায়ী করা হয়।

মোপলা কৃষক অভ্যুত্থান

দক্ষিণ ভারতে আরব সাগরের তীরবর্তী মালাবারের (বর্তমানে কেরলের) তিনটি তালুকের (এরনাদ, বল্লুবনাদ ও উত্তর পোন্নানি) মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই মোপলা কৃষক। ধর্মের দিক থেকে তারা মুসলমান আর জমিদাররা (জেনমি) সব হিন্দু। (তাই অবিভক্ত বাংলাদেশের মতো এখানেও কৃষকদের জমিদার-বিরোধী শ্রেণী-সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে প্রচার করার সুবিধা হয়।) জমির খাজনার হার ছিল চড়া। ফসলের

দর পড়ে গেলে কৃষকদের পক্ষে খাজনা দেওয়া আগের চেয়েও কঠিন হয়ে পড়ে। খাজনার দায় মেটাতে তাদের মহাজনের কাছে জমি বন্ধক রেখে দেনা করতে হয়।

দেনা শোধে বিলম্ব হলেই মহাজনরা মামলা রুজু করে আদালতে। মামলায় ডিক্রিও পায়। এইভাবে কৃষকরা জমিহীন হতে থাকে এবং তাদের জমি চলে যায় মহাজনের হাতে। ভিটেমাটি থেকেও বহু কৃষক উৎখাত হতে থাকে। তখন এই সর্বহারা মোপলা কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ জমে ওঠে। বিক্ষোভ তীব্র হতে হতে শেষে ফেটে পড়ে বিদ্রোহের আকারে।

বিদ্রোহ প্রথম ঘটে ১৮৩৬ সনে এবং তার পরবর্তী ১৮ বছরে ২২ বার। ১৮৪৯ সনের অভ্যুত্থানে সরকারী পুলিস ও মিলিটারির বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হন ৬৪ জন মোপলা কৃষক বিদ্রোহী।

সরকার তখন একটা তদন্তের ব্যবস্থা করে। তদন্তের রিপোর্টে বিদ্রোহী কৃষকদেরই অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। সেজন্য, তাদের কোন ন্যায্য অধিকার দেওয়া দূরে থাক, মোপলাদের ভুজালি রাখবার অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে নিরস্ত্র করে ফেলা হয়। নিরস্ত্রকারী কালেকটর কনোলিকে ১৮৫৫ সনে একদল বিক্ষুব্ধ মোপলা কৃষক তার বাড়ি চড়াও হয়ে হত্যা করেন। পুলিস ও ফৌজের দ্বারা ঘেরাও হয়ে পরে তাঁরা সাত দিন একটানা লড়াই করে সকলেই শহীদ হন।

বিদ্রোহের আগুন কিন্তু জ্বলতেই থাকে; সাময়িক ভাবে আগুন নিবে গেলেও ধোঁয়াতে থাকে। ১৮৮০ সনের বিদ্রোহের পর সরকার আর এক বার তদন্তের ব্যবস্থা করে এবং তদন্তের কাজে লোগান নামে একজন ইংরেজ কর্মচারীকে নিযুক্ত করে।

কৃষকের দাবির স্বীকৃতি

দ্বিতীয় তদন্তের রিপোর্ট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। লোগান মন্তব্য করেন যে ইংরেজ শাসকরা মালাবারের ভূমিব্যবস্থায় জেনমির একচ্ছত্র মালিকানা; এবং কৃষককে খুশিমতো উচ্ছেদ করবার ও জমির খাজনা বাড়াবার অধিকার স্বীকার করে যে সব রায় কোর্ট থেকে দিয়েছে, তা আইনের ভুল ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের এই ভুল ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের কারণেই কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয় ও বারে বারে মোপলা অভ্যুত্থান ঘটতে থাকে।

তাই লোগান সুপারিশ করেন যে কৃষকদের যে সমস্ত পুরনো অধিকার থেকে বেআইনীভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে সেগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হ'ক তাদের স্থায়ী রাইয়তী স্বত্ব ও পূর্বেকার স্থিতিশীল হারে খাজনা দেবার অধিকার দেওয়া হ'ক ; আর যদি কোন আইন সংগত কারণে কোন কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে হয় তবে তাকে সেজন্য ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকার দেওয়া হ'ক।

কিন্তু যদিও এই সব সুপারিশ শুধু সরকারের একজন পদস্থ কর্মচারীর কাছ থেকেই নয়, সরকার নিযুক্ত তদন্ত কমিটি থেকেও এসেছিল, তবু সরকার কার্যত তা মানতে চায়নি, বাতিলও করেনি। সরকার মেনে নেবে কী করে? স্বভাবতই জেনমিদের শ্রেণীস্বার্থের দিকে নজর রেখে কৃষক স্বার্থের পক্ষে অনুকূল এই সুপারিশ মোতাবেক কাজ করতে সরকার চায় না, গড়িমসি করতে থাকে। এইভাবে বছর চারেক কেটে যায় এবং তার মধ্যে আরো পাঁচবার গোলযোগ বাধে। শেষে ১৮৮৮ সনে সরকার একটা আইন পাস করে এবং তার মধ্যেও অনেক ফাঁক রেখে কেবল উৎখাত কৃষকদের সংশ্লিষ্ট জমির উন্নতি সাধনের দরুন কিছু ক্ষতিপূরণের অধিকার দেওয়া হয় মাত্র।

স্বভাবতই কৃষকরা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, তাদের বিক্ষোভ থেকেই গেল। পরে ১৮৯৪ ও ১৮৯৬ সনে আবার গুরুতর অভ্যুত্থান হল। ১৮৯৬ সনের সংগ্রামে একটা মন্দিরকে ঘাঁটি করে যে ৯৯ জন মোপলা কৃষক সরকারী পুলিস ও ফৌজের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ৯৬ জন সেখানেই শহীদ হন। এই বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করতে জানতেন না।

১৯২১ সনে অসহযোগ আন্দোলনের সমসময়ে আর একবার মোপলা কৃষকদের বিদ্রোহ ঘটে। তাকে সরকারী এবং অনেক বেসরকারী বিবরণেও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বলে বর্ণনা করা হয়। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সরকার যে অমানুষিক বর্বরতার পরিচয় দেয় তার তুলনা মেলা ভার। প্রকাশ, ধৃত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেবার উদ্দেশ্যে প্রায় ১৩০ জন বিদ্রোহীকে একখানা মালগাড়ির ওয়াগনে ভরে তার দরজা বন্ধ করে অন্যত্র পাঠাবার জন্য রেলে চালান করা হয়। দারুণ গরমের মধ্যেও তার মধ্যে জলের কোন ব্যবস্থা থাকে না, হাওয়া ঢুকতেও পারে না। পিপাসায় এবং হাওয়ার অভাবে দম আটকে মাত্র কয়েকজন ছাড়া

বাকি সকলেই সেই ওয়াগনের মধ্যে মারা যায়। এই ছিল সত্যিকার অন্ধকূপ হত্যা। সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ছিল সুসভ্য ইংরেজ সরকার।

প্রজাস্বত্ব আইন

বাংলা দেশের কৃষক বিদ্রোহগুলির পরিণতি হয়েছিল প্রজাস্বত্ব আইনে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৮৫) প্রজা বা রাইয়তদের অধিকার সম্বন্ধে এবং ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে আরো অন্যান্য বিষয়ে মূল ও বিশদ ব্যবস্থার দলিল বলে গণ্য হয়। এই আইনে বলা হয় যে ১২ বছরের দখলের ফলে প্রজাকে দখলী স্বত্ব সহ স্থিতিবান রাইয়ত বলে গণ্য করা হবে। নতুন জমিতেও এই ধরনের স্বত্ব সাব্যস্ত হবে। সেই রাইয়তের স্বত্ব হবে সংরক্ষিত স্বত্ব; তার জমিদারের জমিদারী বিক্রী হয়ে গেলেও সে স্বত্ব নষ্ট হবে না। সে তার জমি বন্ধক দিতে পারবে, কোন অধীন-রাইয়ত বা কোর্ফা প্রজাকে অনধিক ৯ বছরের মিয়াদে বন্দোবস্ত দিতে পারবে। এবং বাকি খাজনার দায়ে তাকে উচ্ছেদ করা চলবে না। তবে দেওয়ানী আদালতে তার জমি নিলাম করা চলবে।

অবশ্য জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে এই আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে পরে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। সেজন্য আইনের সংশোধনেরও প্রয়োজন হয়েছিল। সংশোধনের পথে বারবার বাধাও দেওয়া হয়েছিল। বড় রকমের সংশোধন হয়েছিল ১৯২৮, ১৯৩৮ ও ১৯৪০ সনে। সে বিষয়ের আলোচনা এখানে করা হচ্ছে না।

২। সংগঠনের সূচনা

প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে জমির মালিক ছিল কৃষক। তবে জমির উৎপাদনের উপর রাজার বা রাষ্ট্রের একটা অধিকার আছে বলে রাজস্ব হিসাবে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ দিতে হত। সে নিয়ম চলে এসেছিল মোগল আমলেও।

মনুর ব্যবস্থা অনুসারে এই রাজস্বের পরিমাণ ছিল উৎপাদনের বারো, আট বা ছ ভাগের এক ভাগ, যদিও যুদ্ধের সময় ক্ষত্রিয় রাজা সিকিও নিতে পারত। "আইন-ই-আকবরী"তে মাঝারি ধরনের আবাদী জমির ক্ষেত্রে ফসলের এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব বাবদ নেবার ব্যবস্থা করা হয়। রাজস্ব অবশ্য দিতে হত উৎপাদন হলেই, এবং উৎপন্ন ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশই, বাঁধা পরিমাণে নয়। এ ছাড়া জমিতে কৃষকদের সমস্ত অধিকারই থাকত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন (১৭৬৫) সুবে বাংলার দেওয়ানী নেয় তখন দেশে একটা অরাজকতার অবস্থা ছিল। মোগল রাষ্ট্রশক্তির দুর্বলতার সুযোগে ইজারাদাররা অনেক বাজে আদায় মারফত কৃষকদের শোষণ বাড়িয়ে তুলেছিল। তারা ফসলের অর্ধেকও অনেক ক্ষেত্রে আদায় করে নিত। নিরুপায় কৃষকদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না তখন। ইজারাদাররা প্রায়ই বংশানুক্রমে রাজস্ব আদায়ের কাজ করত বলে তাদের জমিদারও বলা হত।

দেওয়ানী হাতে পাবার পর কোম্পানীর প্রথম লক্ষ্য হল রাজস্ব বৃদ্ধি করা এবং তার মোটা অংশ স্বদেশে (বিলাতে) পাঠানো। মোগল শাসনের শেষ বছরে (১৭৬৪-৬৫) মোট ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮ লাখ ১৮ হাজার পাউণ্ড। তাকে কোম্পানী তার প্রথম বছরেই (১৭৬৫-৬৬), বাড়িয়ে দিয়ে আদায় করে ১৪ লাখ ৭০ হাজার পাউণ্ড। তারই চার বছর পরে হয় ছিয়াত্তরের (১১৭৬ সালের) মন্বন্তর। তাতে কৃষক জনসংখ্যার অর্ধেক মারা যায়। প্রচুর আবাদী জমি চাষ করবার লোকের অভাবে পতিত পড়ে থাকে। তাসত্ত্বেও রাজস্বের পরিমাণ বাড়তেই থাকে এবং চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত প্রবর্তনের বছরে (১৭৯৩) তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০ লাখ ৯১ হাজার পাউণ্ড। (R. P. Dutt, "India Today," PPH, 1947, p 7.)

রাজনীতিক উদ্দেশ্য

ইংরেজ কোম্পানীর শাসনে সাবেক ভূমিব্যবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেওয়া হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মারফত। কৃষকদের কাছ থেকে জমির মালিকানা অন্যায়ভাবে কেড়ে নিয়ে জমিদারদের মালিক করে দেওয়া হয়। কৃষকরা সম্পূর্ণ জমিদারদের হাতে গিয়ে পড়ে। কোম্পানীর সরকার চেয়েছিল প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্দিষ্ট সময়ে যেন রাজস্ব নিশ্চিতভাবে আদায় হয়। তাই এই জমিদারদের একটা শ্রেণী তৈরী করা হয়। এই শ্রেণী সৃষ্টি করার অন্য উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে বিদেশী সরকারের পক্ষে জোরালো সামাজিক সমর্থন গড়ে তোলা।

নতুন বন্দোবস্তে প্রজাদের খাজনা দিতে হত জমির পরিমাণ অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণে এবং নগদে, জমিতে ফসল কী পরিমাণ উৎপন্ন হবে তা বিবেচনা করে নয়।

জমির বা কৃষি ব্যবস্থার কোন রকম উন্নয়ন না করেও সেই খাজনার হারও বাড়তে পারত ; প্রজাদের পাট্টা না দেওয়ায় এ বিষয়ে তাদের বিশেষ অসুবিধা ছিল না। খাজনার উপরেও তারা বাজে বা বেআইনী আদায় করতে পারত, সে শোষণ থেকে প্রজাদের রক্ষার বা নিরাপত্তার জন্য সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করত না। জমিদারদের পাওনা মেটাতে না পারলে তারা কৃষকদের জমির ফসল ক্রোক করতে পারত, এমনকি কৃষকদের কয়েদ করেও রাখতে পারত।

জমিদারের পাওনা যখন দিতেই হবে, অথচ জমির আয় থেকে তা দেওয়া সম্ভব নয়, তখন প্রজাকে মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয়। বহু কৃষক পড়ত সেই অবস্থায়। মহাজন চড়া সুদে টাকা কর্জ দিত। ইংরেজ আমলের পূর্বেও সমাজে মহাজন ছিল, সুদী কারবার চলত। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল কম, ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। এখনকার মতো এত বেশি লোককে, বিশেষ করে এত কৃষককে কর্জ নিতে হত না, তাও খাজনা মেটাবার দায়ে।

মহাজনী প্রথায় সরকারী সাহায্য

এখন প্রয়োজনের তাগিদে মহাজনী সুদী কারবার ব্যাপক হয়ে উঠল,

সমাজের অর্থনীতিক জীবনের প্রায় সর্বস্তরে একটা প্রথায় পরিণত হল। ঋণের টাকা ও সুদ নিশ্চিতভাবে ফেরত পাবার জন্য জমি বন্ধকের রেওয়াজ কায়েম হল। টাকা শোধ করে সময়মতো জমি ফেরত নিতে না পারলে মহাজন বন্ধকী জমি দখল করে কৃষককে উচ্ছেদ করত। মহাজনের এই কাজে ক্রমে সরকারী আইন তার পুঁজি ও সুদের হেফাজতের জন্য সাহায্য করতে লাগল। দেনার দায়ে কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করার অধিকার তার জন্য সাব্যস্ত হয়ে গেল রাষ্ট্রের সাহায্যে। সুদের ব্যবসা খুব লাভের কারবার দেখে অনেক জমিদারও মহাজনী করতে লাগল। অনেক মহাজনও কৃষক উচ্ছেদ করে জমির মালিক হয়ে পড়ল। ক্রমশ জমিদার ও মহাজন দুই শ্রেণী খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল, তাদের শ্রেণী স্বার্থ প্রায় অভিন্ন হয়ে গেল।

স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যবস্থার আমলেই এই প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে চলছিল। কৃষকরা জমিহীন হতে লাগল ব্যাপকভাবে। আবার হাজাশুখা অথবা অন্য কোন কারণে ফসল উৎপন্ন না হলে বা ফলন কম হলে এই প্রক্রিয়া আরো জোর ধরত, জমিহীনের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করত।

পূর্বে উৎপাদন সম্বন্ধে সেচ ও জল নিষ্কাশন প্রভৃতি বিষয়ে কৃষককে সুযোগ দেওয়া ছিল সরকারের দায়িত্ব। কৃষককে সে সুযোগ না দিলে ফসল নষ্ট হবে সুতরাং রাজস্ব আদায় হবে না জেনে সরকার সে দায়িত্ব পালন করত। এখন ইংরেজ শাসনে সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল জমিদারদের উপর। কিন্তু জমিদাররা জানত সে দায়িত্ব পালন না করলেও তারা আইনত তাদের খাজনা বাবদ পাওনা থেকে বঞ্চিত হবে না, আদায়ের কাজে সরকারই তাদের সাহায্য করবে। কাজেই দায়িত্ব পালনের বালাই থেকে তারা নিজেদের রেহাই দিত, বিশেষ করে যে জমিদাররা গ্রাম ছেড়ে শহরে বাস করত।

শ্রেণী বিরোধ ও সংঘর্ষ

এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একদিকে কৃষক-প্রজারা জমিহারা হয়ে গেল ব্যাপকভাবে, অন্যদিকে জমিদার-মহাজনদের হাতে তাদের জমি কেন্দ্রীভূত হতে থাকল। দুই পক্ষের অর্থনীতিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্য গভীর ও বিস্তৃত হয়ে পড়ল। শোষক ও শোষিতদের মধ্যে শ্রেণী স্বার্থের বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দিতে লাগল। সরকারের সাহায্য সব সময়েই

থাকল শোষক শ্রেণীর দিকে। জমিদার তার পাওনা আদায়ের জন্য কৃষকের জমির ফসল কেটে নিলেও তার কিছু করবার থাকল না।

দীর্ঘকাল ধরে, বিশেষ করে গত এক শতাব্দী ধরে এই প্রক্রিয়া বাংলার অর্থনৈতিক জীবনকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে এসেছে। কৃষক-প্রজাদের কিছু নিরাপত্তার, কিছু পরিমাণে রক্ষার আইনগত ব্যবস্থা করা হয়েছিল ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে। তাতে দখলী স্বত্ববান রাইয়ত বা প্রজাদের কিছু কিছু অধিকার স্বীকার করা হয়েছিল, জমিদারদের দ্বারা অন্যায় উচ্ছেদের জুলুম থেকে রক্ষার কতকটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে শোষণের একচেটিয়া আইনগত অধিকার ভোগ করে এবং তার দৌলতে সমাজে কর্তৃত্ব করে আসার ফলে জমিদাররা শ্রেণী হিসাবে কেবল শোষকই থাকল না, অত্যাচারীও হয়ে পড়ল। অর্থনৈতিক জীবনে ছাড়া সামাজিক জীবনেও রাইয়ত ও কৃষকদের উপর তারা নানা কারণে এবং নানা কৌশলে রীতিমতো জুলুম ও উৎপীড়ন চালাতে লাগল। এই উৎপীড়ন তুচ্ছ ব্যক্তিগত কারণেও চলত, জমিদারের যে কোন সামান্য কর্মচারী বা দালালের অভিযোগেও বিনাবিচারেই জুলুম করা হত। কোন প্রজা কোন জমিদারের বা তার কর্মচারীর অন্যায় অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে বা আদালতে মামলা করলেও তার উপর জমিদারী প্রতিহিংসা ও নির্যাতন এসে পড়ত। অসংগঠিত ও জমিদার প্রভাবিত গ্রামসমাজ তাকে রক্ষা করতে পারত না। ফলে কৃষককে মুখ বুজেই থাকতে হত, সমস্ত জোর জুলুম সহ্য করতে হত।

এমনি করে জমিদারী প্রথা বাংলার গ্রামজীবনে হয়ে পড়ল এক মারাত্মক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অভিশাপ। সেই অভিশাপের পীড়ন ও লাঞ্ছনা সারা সমাজকে বরদাস্ত করতে হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে।

বহুস্তরের মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি

জমিদারী প্রথায় শুধু সেই সমস্ত জমিদারই ছিল না, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাদের প্রথমে সৃষ্টি করেছিল। একদিকে জমিদারী তার প্রথম জমিদার গোষ্ঠীর বংশবৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে সম্পত্তি বণ্টনের ফলে অসংখ্য শরিকের ছোট ছোট সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল, সেজন্য তাদের শোষণের মাত্রাও বেড়েছিল। অন্যদিকে জমিদারীগুলির স্তর বিভাগ হওয়ায়, তালুকদার, পত্তনিদার ইত্যাদি খাজনাভোগী মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করে রাইয়তদের শোষণের

মাত্রা আরো বৃদ্ধি করা হয়েছিল ; ১৯২১ থেকে ১৯৩১ এই দশ বছরেই তাদের সংখ্যা বেড়েছিল শতকরা ৬২ ভাগ। এ রকম একাধিক স্তর তো হামেশাই দেখা যেত, পর পর চার, ছয় বা দশ বারো স্তরও ছিল, চরম অবস্থায় ৫২টি স্তর পর্যন্ত তৈরী হয়েছিল (বাকরগঞ্জ জেলায়)। প্রত্যেক স্তরেই মধ্যস্বত্ব ভোগীরা কিছু কিছু মুনাফা অবশ্য করত। কাজেই রাইয়ত-কৃষককে প্রথম জমিদারের পাওনা যে পরিমাণে দিতে হত, স্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে বেশি পাওনাই মেটাতে হত। মধ্যস্বত্বের স্তর যতই থাক, চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে মোট পাওনা তাদের যা হত তার দায় পোয়াতে হত কৃষককেই। কাজেই জমিদারী প্রথায় কৃষকের উপর শোষণের তীব্রতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল।

রাইয়ত-কৃষকদেরও বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জোত ভাগ হয়ে যেত। তাতে প্রত্যেক কৃষকের জোতের পরিমাণ ক্রমেই কমে যেতে থাকত। জমির আয় থেকে খাজনা-দেনার বর্ধিত দায় চুকিয়ে অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব হত না। ব্যয় কমাতে কমাতে জীবনের ও চাষের নিম্নতম প্রয়োজনও যখন আর পূরণ করা সম্ভব হত না তখন জমি বিক্রী করে গ্রাম্য সর্বহারার দল ভারি করত তারা। জমিহীন নিঃস্বের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল।

জমিতে বেকার কারিগরের দল

ইংরেজ কোম্পানী এদেশে এসেছিল ব্যবসা করতে। তাদের দেশে যখন কারখানা শিল্প গড়ে ওঠে তখন সেই কারখানার মাল আমদানী করে এদেশের বাজারে ছাড়া হয়। তার সঙ্গে এদেশের কারিগরী শিল্পের পক্ষে প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো কঠিন হতে থাকে। ফলে বহু কারিগর নিজেদের ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সরকারী কর্তৃত্ব হাতে থাকায় সরাসরি প্রতিযোগিতার পথ ছাড়াও অন্যান্য কৌশলে ইংরেজ সরকার এদেশের কারিগরী শিল্পকে ধ্বংস করতে থাকে, অথচ তার পরিবর্তে কারখানা শিল্প গড়ে না তুলে বা তুলতে সাহায্য না করে বেকার শিল্পীদের কাজের ও রোজগারের ব্যবস্থাও করে না। তখন এই বেকারের দল জীবিকার তাগিদে কৃষির কাজে যোগ দিতে থাকে। তাদের এই ভিড়ের ফলে জমির উপর চাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। আদম শুমারীর হিসাবে দেখা

যায় ১৮৯১ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে বাংলার কৃষিজীবী জনসংখ্যা ২৫৫ লাখ থেকে ৩৬১ লাখে উঠেছিল।

কৃষি-নির্ভর জনসংখ্যা সারা ভারতে কী ভাবে বেড়েছে তা এই হিসাব থেকে দেখা যায়: ১৮৯১ সনে কৃষি-নির্ভর লোকের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬১.১, ১৯০১ সনে ৬৬.৫, ১৯১১ সনে ৭২.২ এবং ১৯২১ সনে ৭৩। আরো দেখা যায় মোট জনসংখ্যার তুলনায় শিল্প-নির্ভর মানুষের সংখ্যার শতকরা হার ছিল এই: ১৯১১ সনে ৫.৫, ১৯২১এ ৪.৯ এবং ১৯৩১এ ৪.৩। এই বিশ বছরে শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা কমেছিল ২০ লক্ষ অথচ ঐ সময়ে জনসংখ্যা বেড়েছিল অনেক বেশী।

ব্যাপক জমির ক্ষুধা

এইভাবে যারা জমিহীন হয়ে বা জমিহীন অবস্থায় এসে জমির উপর চাপ বাড়াচ্ছিল, কোন রকমে খেটেখুটে দিন গুজরান করবার জন্য ভাগচাষী বা খেতমজুর হিসাবে কাজে যোগ দিচ্ছিল, জমির মালিকরা তাদের অসহায় ও বেকার অবস্থার সুযোগ নিয়ে স্বভাবতই তাদের শোষণের মাত্রা আরো তীব্র করে তুলছিল। জমির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ কৃষকদের জীবিকার মানকে কেবল ক্রমাগত সংকুচিতই করছিল না, জীবনের সর্বনিম্ন প্রয়োজন হিসাবে ভাতকাপড় ও বাসের ঘরটুকুর সংস্থানকে পর্যন্ত অসম্ভব করে তুলছিল।

যে সব কৃষকের নিজেদের জমি ছিল তাদেরও জোতের পরিমাণ ছিল কম। ১৯২১ এর সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় বাংলার কৃষকদের জোতের পরিমাণ গড়ে ৩.১ একর (দশ বিঘারও কম), অথচ বোম্বাইয়ে ১২.২, মাদ্রাজে ৪.৯, মধ্য প্রদেশে ৮.৫ ও পাঞ্জাবে ৯.২ একর। ঐ রিপোর্ট থেকেই বাংলাদেশের খোদ-চাষীদের হিসাব নিলে দেখা যাবে গড়ে প্রত্যেক কৃষকের জোতের পরিমাণ ২.২ একর (সাত বিঘারও কম)। কৃষকের দারিদ্র্য বোঝাবার পক্ষে এই হিসাবই যথেষ্ট।

এই অবস্থায় কৃষকদের মধ্যে জমির ক্ষুধা থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। সে ক্ষুধা অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই ছিল এবং তা ক্রমে বেড়েই চলেছিল। কিন্তু সে ক্ষুধা মেটাবার কি কোন উপায় ছিল না? আবাদযোগ্য পতিত জমি কি বাংলাদেশে মোটেই পাওয়া যেত না? সে রকম জমি যথেষ্টই ছিল। বাংলায় মোট জমির শতকরা অন্তত ১৮ ভাগ ছিল যা আবাদযোগ্য স্থায়ী

পতিত জমি। কিন্তু সে সব জমি জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদ করবার জন্য যে পুঁজির প্রয়োজন তা এই গরিব ও নিঃস্ব কৃষকদের ছিল না। দ্বিতীয়ত, জমির মালিক যখন জমিদার তখন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সরকার সে জমি চাষের ব্যবস্থা করে কৃষকদের বাঁচবার প্রয়োজন ও দায়িত্ব অনুভব করত না। জমিদারও সেজন্য গরজ বোধ করত না।

সেচ ব্যবস্থার অবনতি

জমিদাররা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তি মোতাবেক সেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকলেও সে দায়িত্ব পালন করত না এবং সরকারও সেজন্য তাদের বাধ্য করত না। অধিকাংশ কৃষকেরও এমন পুঁজি ছিল না যাতে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ছোট-খাটো উন্নয়নের কাজ করতে পারে। ফলে কৃষি ব্যবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। জমির উৎপাদন অনিশ্চিত হতে থাকে।

সেচ ব্যবস্থার উন্নতি দূরে থাক, প্রাচীন সেচ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। তার পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল সরকারের কিন্তু তাও করা হয়নি। হাজামজা নদী খাল ইত্যাদির সংস্কার না হওয়ায় বাংলার মতো নদীপ্রধান দেশে জলনিকাশীর পথ বন্ধ ও বিকৃত হয়ে দেশকে ম্যালেরিয়ার শিকারে পরিণত করেছিল। লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। আর সেই সঙ্গে ঘটেছিল জমির উৎপাদন হ্রাস। কৃষি উৎপাদন কমেছিল কেবল বাংলা দেশেই নয়, সারা ভারতবর্ষে।

বাংলাদেশে "সারের অভাবের কারণে আবাদী জমির উর্বরতা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন ক্রমেই কমে যাচ্ছে।" (**Bengal Provincial Banking Enquiry Committee Report, 1930, p. 21, quoted in "India Today", pp. 180-81, PPH, 1947.**) অঙ্কের হিসাবে হ্রাস পেয়েছে প্রতি পাঁচ বছরের গড় হিসাব মোতাবেক (বাংলায় একর প্রতি চালের উৎপাদন পাউণ্ডে): ১৯০৬-০৭ ১২৩৪; ১৯১১-১২ ৯৮৩; ১৯১৬-১৭ ১০৩৬, ১৯২১-২২ ১০২৯; ১৯২৬-২৭ ১০২২; ২০ বছরে ২১২ পাউণ্ড উৎপাদন কম। (**"India Today", p. 181**)

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকরা যে গোবর সার ব্যবহার করতে পারত তা তারা পয়সার অভাবে জ্বালানি কিনতে না পেরে পুড়িয়ে ফেলত। আর্থিক দুর্দশার কারণে ঘরের সারটুকু পর্যন্ত তারা কাজে লাগাতে পারত না।

বাংলার ও ভারতের কৃষকরা উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব বুঝত না একথা

অবশ্যই কেউ বলবে না। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ও তাকে নিশ্চিত করবার জন্য সেচ ও জলনিকাশীর প্রয়োজনীয়তা ও সারের উপযোগিতা সম্বন্ধেও তাদের জ্ঞান কিছু কম ছিল না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার ভিত্তিতে বাংলায় দীর্ঘকাল ধরে যে অর্থব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাচ্ছিল, কৃষির অবনতি ও কৃষকের দুর্দশা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সেদিকে না সরকার না জমিদার কারোই দৃষ্টি ছিল না, গরজও ছিল না।

ভূমি বিপ্লবের প্রয়োজন

স্বভাবতই এই পরিস্থিতির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থা ও তার সাহায্য-পুষ্ট সামন্তবাদী ভূমি-সম্পর্কের ফলে কৃষি-উৎপাদনে এবং কৃষকের জীবনে সংকট দেখা দিয়েছিল এবং সংকট ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠছিল। ভূমি-ব্যবস্থার ও কৃষি-ব্যবস্থার মধ্যে এই সংকট দূর করবার একমাত্র উপায় ছিল জমির একচেটিয়া মালিকানা দূর করে ভূমি-সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন, ভূমি-বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্লব।

এই ভূমি-সম্পর্ক ও কৃষি-সংকট বাংলার ভূমি-নির্ভর জমিদারদের এবং রাইয়ত ও কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী-পার্থক্য বাড়িয়ে তুলেছিল। বাংলার সেন্সাস রিপোর্ট থেকে এই সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়:

	১৯২১	১৯৩১	পরিবর্তন
অকৃষক জমির মালিক বা খাজনাভোগী	৩,৯০,৫৬২	৬,৩৩,৮৩৪	৬১%
খোদ-চাষী মালিক ও বর্গাদার	'৯২,৭৪, ৯২৪	৬০,৭৯,৭১৭	—৩৪%
খেতমজুর	১৮,০৫,৫০২	২৭,১৮,৯৩৯	+৫০%

মজুরদের বিনা খোরাকির রোজ মজুরি (আনায়) কীভাবে কমে আসছে তার একটা হিসাব এই:

	১৮৪২	১৮৫২	১৮৬২	১৮৭২	১৯১১	১৯২২
খেতমজুরের	১	১'৫	২	৩	৪	৪ থেকে ৬
ছুতোর মিস্ত্রির	২	৩	৪	৬ থেকে ৮	৭ থেকে ১০'৫	৮ থেকে ১২
ঘরামির	২	৩	৪	৫	৬	৬
চালের দর (প্রতি টাকায় সের)	৪০	৩০	২৭	২৩	১৫	৫

'(R. Mukherjee, 'Land Problems of India', p. 222, Longmans, 1933.)

এর থেকে দেখা যায় এই ৮০ বছরে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে চারগুণ থেকে ছ' গুণ, কিন্তু চালের দর বেড়েছে আটগুণ, অর্থাৎ প্রকৃত মজুরীর হার সিকি থেকে অর্ধেক কমে গেছে। শোষণের তীব্রতা কত বেড়েছে এ তার একটা পরিচয়।

কৃষকদের অবস্থার অবনতি যে বেড়ে যাচ্ছিল তার কারণ মূলত ও প্রধানত জমিদারী শোষণ (খাজনা প্রভৃতির চাপ), মহাজনী শোষণ (ঋণের বোঝা ও সুদের চাপ) এবং সরকারী শোষণ (ট্যাক্সের চাপ)। কৃষকদের উপর খাজনার শোষণ ছাড়া দেনার বোঝা যে বরাবর বেড়েই গেছে এবং ক্রমেই বেশি সংখ্যায় কৃষকরা মহাজনের দেনায় জড়িয়ে পড়েছে, তার আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। একথা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটিও (১৯৩১) স্বীকার করেছিল। স্বাধীনতার পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া যে দু বার গ্রাম্য ঋণ সম্বন্ধে সমীক্ষা করেছিল (Survey of Rural Indebtedness, 1956-57 & 1961-62) তার রিপোর্ট থেকেও একই তথ্য পাওয়া যায়। বরং এই ঋণ-গ্রস্ততা যে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে গেছে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। রিপোর্টে দেখা যায় প্রথম তদন্তের সময়ে সারা ভারতে যেখানে এই ঋণের পরিমাণ ছিল মোট ৯০০ কোটি টাকা, তা পাঁচ বছরে বেড়ে হয়েছিল তিন হাজার কোটি টাকা।

যুদ্ধ ও আন্দোলনের চিন্তা

১৯১৪ সনে যখন দুনিয়ার প্রধান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ বাধে —প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তখন থেকে এদেশেও জিনিসপত্রের দর চড়তে থাকে, ট্যাক্সের পরিমাণ বেশি বেশি বাড়তে থাকে, গরিব মেহনতকারী মানুষগুলো বিশেষভাবে ঘা খেতে থাকে। যুদ্ধের চার বছরে সর্বত্র লোকের মধ্যে একটা সাড়া জাগতে আরম্ভ করে, গ্রামের অশিক্ষিত লোকেও ভাবতে শুরু করে যে তাদের দেশও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে একটা দেশ, অন্যান্যদের বাদ দিয়ে তারা নিজেদের খুশীমতো চলতে পারে না।

সেই সঙ্গে একথাও অনেকের চিন্তায় আসতে থাকে যে তাদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান আপনা থেকে ঘটবে না, তাদের নিজেদের সংগঠিত ও মিলিত চেষ্টার দ্বারাই তা ঘটাতে হবে। যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বে যখন রুশ দেশে শ্রমিক বিপ্লব ঘটে যায় (নবেম্বর ১৯১৭) তার খবরটা দেশের সাধারণ লোকের কাছ পর্যন্ত যেতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার সর্বপ্রকারে বাধা দিয়েছিল

বটে, তবু কিছু কিছু খবর অনেক লোকে, বিশেষত শহরে, জানতে পেরেছিল।

দেশের লোকের জাগরণে খিলাফত আন্দোলনও সাহায্য করেছিল। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডও (এপ্রিল ১৯১৯) ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছিল। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১৯২০ থেকে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তার ফলে দেশে ব্যাপক গণজাগরণ দেখা দেয়। তার পূর্বে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট চলতে থাকে। এসবের ফলে ভারতে ও বাংলায় কৃষক সমাজের মধ্যেও চাঞ্চল্য জাগে। ১৯২১ সনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যদিও কায়েম হয়েছিল বিদেশে—সোবিয়েত দেশের উজবেকিস্তানের তাশকন্দ শহরে—তাহলেও ঐ বছরই তার কিছু কাজের আভাষ এখানেও পৌঁছেছিল।

সাধারণভাবে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন এবং শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের প্রতিফলন ব্যাপকভাবে ভারতের ও বাংলার কৃষক সমাজের মধ্যে এই সময়ে দেখা যায়। কৃষক সংগঠনের কাজ বাংলার কোন কোন জেলায় শুরু হয়ে যায় তৃতীয় দশকেই, এমন কি তারও পূর্বে। বাংলার বাইরেও এই সংগঠন কোন কোন প্রদেশে আরম্ভ হয়।

অর্থনীতিক সংকটের আঘাত

কৃষকদের দুর্দশা আর একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে অতি দ্রুত গতিতে অত্যন্ত শোচনীয় ও মারাত্মক হয়ে পড়ে। ১৯২৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যে বিশ্ব অর্থনীতিক সংকট সারা পৃথিবীর পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ভীষণভাবে গ্রাস করে ফেলে তার আঘাত এদেশেও আসে প্রচণ্ডভাবে এবং তার প্রধান শিকার হয় এদেশের কৃষকরা আর শ্রমিকরা।

সংকটের আঘাত খায় শ্রমিকরা দলে দলে বেকার হয়ে। আর কৃষকদের উপর আঘাতটা বিশেষভাবে আসে ফসলের দর পড়ে যাওয়াতে। গ্রামের মজুরদের মধ্যে বেকারীও বাড়ে। সরকারী হিসাবে দেখা যায় সংকটের আগের বছর (১৯২৮-২৯) গড় দরের হিসাবে ভারতের মোট উৎপন্ন ফসলগুলির দাম ছিল ১০৩৪ কোটি টাকা। ১৯৩৩-৩৪ সনে সেই দর নেমে গিয়ে হয় ৪৭৩ কোটি টাকা—শতকরা ৫৫ ভাগ হ্রাস। (Statistics published by the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, quoted in India Today, p. 215.)

বাংলার কৃষকের অবস্থা হয় আরো শোচনীয়। বঙ্গীয় পাট তদন্ত কমিটির রিপোর্টে (১৯৩৪) ১৯২০-২১ থেকে ১৯৩২-৩৩ এর মধ্যে ক্রয় ক্ষমতার যে তারতম্য দেখান হয় তার মধ্যে এই তথ্য পাওয়া যায় : বাংলায় মোট বিক্রয়যোগ্য ফসলের দর ১৯২০-২১ থেকে ১৯২৯-৩০ এই দশ বছরে ছিল গড়ে বার্ষিক ৭২'৪ কোটি টাকা এবং ১৯৩২-৩৩এ তা নেমে গিয়ে হয় ৩২'৭ কোটি টাকা, অথচ এই সময়ে নগদ পরিশোধের দায়িত্ব বেড়ে ওঠে ২৭'৯ থেকে ২৮'৩ কোটিতে। এই হিসাব অনুসারে কৃষকদের "অবাধ ক্রয় ক্ষমতা" ৪৪'৫ কোটি থেকে নেমে গিয়ে হয় (৩২'৭—২৮'৩) ৪'৪ কোটি টাকা—শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়। (India Today, p. 215)

এই অবস্থায় কৃষকদের মধ্যে খুব বেশির ভাগ লোকের পক্ষে খাজনা ও দেনার টাকা শোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে লক্ষ লক্ষ কৃষকের জমি হস্তান্তরিত হয়ে মুষ্টিমেয় ধনী জমিদার-মহাজনের কাছে চলে যায়, জমির মালিকানা পূর্বের চেয়েও বেশি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে, জমির এক-চেটিয়া মালিকরা আরো বেশি জমির মালিক হয়ে কেঁপে ওঠে। অন্যদিকে মাঝারি চাষীরা ছোট চাষীতে এবং ছোট চাষীরা নিঃস্ব ভূমিহীনে পরিণত হতে থাকে। শ্রেণীগত পার্থক্য আরো ব্যাপক ও তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯২১ থেকে ১৯৩১ এই দশ বছরেই জমিহীন মজুরের সংখ্যা বেড়ে যায় শতকরা ৪৯ ভাগ। ১৯৪০ নাগাত তাদের সংখ্যা বেড়ে হয় মোট কৃষিজীবী জন-সংখ্যার শতকরা ২৯।

প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন

১৮৮৫ সনের প্রজাস্বত্ব আইনে রাইয়ত কৃষকরা যেসব সুবিধা পেয়েছিল তাও সবটুকু ভোগ করতে পায়নি, আর যাদের জমির স্বত্ব সম্বন্ধে নিরাপত্তা ছিল না তাদের তো কথাই নাই। আইনে জমি হস্তান্তর সম্বন্ধে যে সব বিধান ছিল তার সঠিক ব্যাখ্যা কী হবে এবং সে বিষয়ে দেওয়ানী আদালতগুলি কী ধরনের রায় দেবে তাই নিয়ে অনেক অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। সে অসুবিধা দূর করার জন্য হাইকোর্ট গবরমেণ্টকে জানিয়েছিল। তখন ১৯২১ সনে বাংলা সরকার সার জন কারকে চেয়ারম্যান করে একটা কমিটি নিযুক্ত করে দেয় আইনের সংশোধনের ব্যবস্থার জন্য।

কমিটি অনেক গড়িমসির পর একটা বিল রচনা করে এবং ১৯২৫-এ তা

বিধান পরিষদে পেশ করা হয়। পরে তাকে দেওয়া হয় সিলেক্ট কমিটিতে। সিলেক্ট কমিটি বিলে অনেক পরিবর্তন করে। তখন সে কাউন্সিলে আর বিল আনা হয় না, হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন চীফ জাস্টিস ও অন্য তিন জন কর্মচারীকে নিয়ে একটা ছোট কমিটি নিযুক্ত করে তার হাতে দেওয়া হয়।

এই কমিটি জুলাই ১৯২৭-এ রিপোর্ট পেশ করে। তাতে মূল বিলের যেসব ধারা সিলেক্ট কমিটি বাতিল করেছিল তার অনেকগুলি রাখবার সুপারিশ করা হয়, যেমন অধীন রাইয়তদের দখলী স্বত্ব দেওয়া, কিন্তু সেই সঙ্গে সিলেক্ট কমিটির এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে যে-কৃষক নগদে-খাজনা বা নির্দিষ্ট পরিমাণে ফসলে-খাজনা দেয় না, তাকে রাইয়ত বা প্রজা বলে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ বর্গাদারকে জমিতে স্বত্ব দেওয়া চলবে না।

এই সময়ে বঙ্গীয় বিধান পরিষদে বা কাউন্সিলে স্বরাজ পার্টির কংগ্রেসী জমিদার-জোতদার সদস্যদের সংখ্যা ছিল অনেক। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও এই শ্রেণীগুলির প্রতিনিধি কম ছিল না। তাই বর্গাদারকে স্বত্ব দেওয়ার বিরুদ্ধে ঐ সময়ে আইন সভায় এবং বাইরেও বহু বিতর্ক চলে। বর্গাদারদের পক্ষে বলবার লোক তখন খুবই কম। কাজেই ১৯২৮এ প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনী বিল সেইভাবেই পাস হয়ে যায়। পার্টি হিসাবে স্বরাজ পার্টি তার পক্ষে ভোট দেয়। এই কারণে বাংলার কৃষক সমাজের ব্যাপক অংশের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা বেশ কমে যায়।

কৃষকের আন্দোলন

প্রজাস্বত্ব আইনের এই সংশোধনকে ভিত্তি করে ভূমি স্বার্থের সহিত জড়িত সমাজে বেশ আলোড়ন দেখা দেয়। তার মধ্যে জোতদারী স্বার্থের বক্তব্য স্পষ্টই শোনা যায়। সেও শুধু কংগ্রেসী জোতদারদেরই নয়, কংগ্রেসের বাইরের জোতদাররাও, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে, বর্গাদারদের জমিতে তাদের কোন রকম স্বত্ব দেওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে সংগঠিত হবার জন্যও কিছু ঝোঁক দেখা যায়।

এর মধ্যে কিছু কিছু সক্রিয় আন্দোলনও কৃষকদের মধ্যে আরম্ভ হয়। ১৯১৭-১৮ সনে চম্পারনে (বিহার) নীলচাষীদের গান্ধী-নিয়ন্ত্রিত সত্যাগ্রহ ও ১৯২৮ সনে বাড়দোলিতে (গুজরাত) ভূমিকর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কংগ্রেস পরিচালিত কৃষক সত্যাগ্রহ সার্থক হয়েছিল। বাড়দোলিতে কৃষক আন্দোলন ১৯২১ সনেও একবার হয়েছিল।

আর একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে ১৯২০-২২ সনের কংগ্রেস ও খিলাফত পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে। যুক্ত প্রদেশের গোরখপুর জেলায় জমিদারী জুলুমের বিরুদ্ধে কৃষকদের যে বিক্ষোভ জমে উঠেছিল তা এই আন্দোলনের মধ্যে ফেটে পড়ে চৌড়িচৌড়া গ্রামে। জমিদারী জুলুমের সঙ্গে পুলিসী অত্যাচার ওতপ্রোতভাবে বরাবরই জড়িত থেকেছে, এক্ষেত্রেও ছিল। তাই এই বিশেষ ক্ষেত্রে পুলিসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ কৃষকরা ঐ গ্রামের থানা আক্রমণ করে আগুন দেয়। তাতে ২২ জন পুলিসের লোক পুড়ে মরে।

শ্রেণী আন্দোলনের বিরোধিতা

ঘটনাটি ঘটে ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে। কৃষকদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল গবরমেণ্ট নয়, জমিদার। তার উপর তার মধ্যে "হিংসা"র পথ গ্রহণ করা হয়েছিল। কাজেই কংগ্রেসের তৎকালীন ডিকটেটার বা সর্বাধিনায়ক মহাত্মা গান্ধী তা সহ্য করতে পারলেন না! কংগ্রেসের অন্যান্য প্রধান নেতারা তখন জেলে থাকা সত্ত্বেও তিনি তাড়াতাড়ি, ঐ মাসের ১২ তারিখেই, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডেকে, অন্য নেতাদের কোন পরামর্শ বা মত না নিয়েই, সারা দেশের অসহযোগ আন্দোলনটাই বন্ধ করে দিলেন। অথচ সেই সময়েই আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপক জনগণের যোগদানের সুযোগ এসেছিল এবং ব্রিটিশ রাজ এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। আসল কথা জমিদার-বিরোধী কৃষক সাধারণের শ্রেণী আন্দোলনকে গান্ধীজী কখনও সমর্থন করতে বা হজম করতে পারেননি।

তাহলেও এ ঘটনার কিছু প্রভাব কৃষকদের চেতনার উপর অবশ্যই পড়েছিল।

১৯২১ সনে মালাবারে মোপলা কৃষকদেরও জমিদার-বিরোধী বিদ্রোহ আর একবার ঘটেছিল, যদিও তার মধ্যে কিছু কিছু গলদ থাকায় তাকে "সাম্প্রদায়িক" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের পিছনে এই যে ব্যাপক বিক্ষুব্ধ গণশক্তি ছিল, কংগ্রেস নেতৃত্বের এবং বিশেষ করে গান্ধীজীর প্রতিকূল শ্রেণী-চিন্তার কারণে তাকে শুধু জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে কাজে লাগানোই যে হয়নি তাই নয়, এই শক্তিকে দাবিয়ে রাখারই চেষ্টা হয়েছিল, সেজন্য

জাতীয় আন্দোলন যতই ক্ষতিগ্রস্ত হ'ক না কেন। তার পরিণতি অত্যন্ত আংশিকভাবে দায়ী ছিল পরবর্তী সময়ে শ্রেণী আন্দোলনকে জোরদার করার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে সংহত হতে ও দাঙ্গা বাধাতে সুযোগ দেবার জন্য। কারণ সক্রিয় শ্রেণী আন্দোলনই সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও হাঙ্গামার পথ বন্ধ করবার জন্য একমাত্র কার্যকরী শক্তি। ১৯২২ থেকে কয়েকটা বছর সারা দেশে ব্যাপক ভাবে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ও হাঙ্গামা বাধতে থাকে, রাজনীতিক আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে ওঠে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

কৃষক সংগঠনের সূত্রপাত

১৯২৬-এর এপ্রিলে কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম হাঙ্গামা বাধে পর পর তিন বার। পাবনা জেলার (উত্তরবঙ্গ, বর্তমানে পাকিস্তানে) হাঙ্গামার মূলে শ্রেণী স্বার্থ থাকলেও তাকে সাম্প্রদায়িক বলা হয়। ১৯৩০ সনে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন চলা কালে কিশোরগঞ্জ মহকুমায় (ময়মনসিং জেলা) মহাজন-বিরোধী কৃষক-খাতক আন্দোলনের সুস্পষ্ট শ্রেণী চরিত্রকে অস্বীকার করে তাকেও বলা হয় হিন্দু-মুসলিম হাঙ্গামা। স্বভাবতই শোষক শ্রেণীদের এই ধরনের ভ্রান্ত বা উদ্দেশ্যমূলক প্রচার শুধু শোষিত শ্রেণীগুলির ন্যায্য আন্দোলনকেই কমজোর করেনি, স্বাধীনতা আন্দোলনকেও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। শোষক শ্রেণীদের স্বার্থে অন্ধ নেতারা হয়তো ভেবেছিলেন তাও ভালো।

এই সকল বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সংঘাতের মধ্যে দিয়েও কৃষকদের শ্রেণী আন্দোলন অন্য কতকগুলি প্রদেশের মতো বাংলায়ও দানা বাঁধছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রাথমিক ধরনের সংগঠনের কাজ শুরু হয়েছিল। ১৯২০ সনে জে. এন. রায় (ব্যারিস্টার) প্রাদেশিক স্তরে ও কোন কোন জেলায় রায়ত সভা গঠনের কাজে অগ্রণী হন। সে সংগঠন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে না পারলেও প্রাথমিক স্তরে সেজন্য একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল। ১৯২১ সনে নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার কাপাসডাঙ্গা গ্রামে একজন স্থানীয় ইতালীয় মিশনারির উদ্যোগে একটি কৃষক সমিতি গঠিত হয়েছিল এবং তার সম্মেলনও হয়েছিল। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আরো ব্যাপক ভিত্তিতে কয়েকটি জেলায় কৃষক সংগঠন তৈয়ের হয়েছিল। ১৯২৫-২৬ সনে হাওড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় রায়ত সভা গঠন করা হয়েছিল।

প্রজা সমিতি এবং কৃষক ও শ্রমিকদল

স্যার আবদুর রহীম, মৌলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ, শামসুদ্দীন আহমদ প্রভৃতির উদ্যোগে প্রজা সমিতি গঠন করা হয় এবং রাজীবুদ্দীন তরফদারের উদ্যোগে নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয় উত্তরবঙ্গের বগুড়া শহরে (ফেব্রুয়ারী ১৯২৫)। এই সম্মেলনে নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন করা হয়। বঙ্গীয় বিধান পরিষদে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন সম্বন্ধে যে আলোচনা হবার কথা ছিল সে বিষয়ে রায়ত বা প্রজাদের মতামত প্রকাশ করাই ছিল এই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগরে, ফেব্রুয়ারী ১৯২৬এ। সম্মেলনের আর একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কৃষক ও শ্রমিক দল গঠন।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল এই সম্মেলনেই গঠিত হয় এবং তার পরই সেখানেই তার প্রথম সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। "রুশ বিপ্লবের ফলে এদেশে ধীরে ধীরে যে কমিউনিষ্ট ভাবধারা প্রভাব বিস্তার করছিল, কৃষক ও শ্রমিক দল গঠনের মূলে ছিল সেই ভাবধারার প্রভাব।" ("কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও সমস্যা", পৃ ১৬, ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৫৯।) এই দল বা পার্টির দ্বিতীয় (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হল, কলকাতা, মার্চ ১৯২৭) ও তৃতীয় (কাঁচরাপাড়া, অক্টোবর ১৯২৮) সম্মেলন হয়ে যাবার পর ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের (ইংরেজীতে বলা হত ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্টস পার্টি) প্রথম অধিবেশন বসে কলকাতার আলবার্ট হলে।

বিভিন্ন জেলায় সমিতি গঠন

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কৃষ্ণনগর সম্মেলন সিদ্ধান্ত করে এখন থেকে কৃষকদের জন্য ব্যাপকভাবে স্বতন্ত্র কৃষক সমিতি গঠন করতে হবে। তারপরই বিভিন্ন জেলায় কৃষক সমিতি গঠনের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। মেদিনীপুর জেলার দাসপুর অঞ্চলে (ঘাটাল মহকুমা) এক কৃষক সম্মেলন হয়। ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলায় এবং পরে বর্ধমান জেলায় (হাটগবিন্দপুর, মে ১৯৩৩) কৃষক সমিতি গঠন করা হয়। এই সব সমিতির পতাকা ছিল লাল পতাকা। ত্রিপুরা জেলার লাল পতাকায় কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্ন ছিল।

কৃষক ও প্রজা দল প্রজা সমিতি থেকে পৃথকভাবে কৃষক সমিতি গঠন করলেও প্রজা সমিতিও তার কাজ করতে থাকে। প্রজাস্বত্ব আইনের সংশো-

ধনের (১৯২৮) ফলে কেবল রাইয়তদের দান, বিক্রয় বা জমা বন্দোবস্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হল বটে কিন্তু মোটের উপর কৃষকদের সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই হল বেশি। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হল তাকে অবলম্বন করে প্রজা সমিতির প্রভাব ও সংগঠন বাড়তে থাকে। ১৯২৮এর পর অর্থনৈতিক সংকটের কারণে পাটের দর অত্যধিক পড়ে যাওয়ায় পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে কৃষক বিক্ষোভ আরো বেড়ে যায় এবং প্রজা সমিতিও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

পরে ১৯৩৪-এ নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতির ঢাকা সম্মেলনে তার নাম বদলে করা হয় নিখিলবঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি। তখন থেকেই পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্যে কৃষক প্রজা পার্টি'র কাজকর্ম শুরু হয় এবং ফজলুল হক তার নেতৃত্ব নেন। ১৯৩৭-এ বাংলার বিধান সভার সাধারণ নির্বাচনে এই পার্টি মুসলিম লীগকে পরাস্ত করে কৃষক-প্রজা মন্ত্রীসভা গঠন করে।

কংগ্রেসের শ্রেণী আন্দোলনের ভীতি

বিশ্ব অর্থনীতিক সংকট যেভাবে সমগ্র কৃষক সমাজকে আঘাত করে তার ফলে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কৃষকদের শুধু বেঁচে থাকার জন্যই আন্দোলনের পথে নামতে হয়, তাদের সংগঠন করার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অবস্থার গুরুত্ব কংগ্রেস অবশ্যই বুঝত কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা তাদের পৃথক আন্দোলন ও সংগঠন চাইতেন না। তাঁরা জানতেন যদি কৃষকদের আন্দোলন ও সংগঠন পৃথকভাবে গড়ে তোলা হয়, তার শ্রেণী চরিত্রকে চেপে রাখা যাবে না, সে ফুটে বেরোবেই। এবং কৃষক সংগঠনের শ্রেণীচরিত্র স্বভাবতই জমিদার-জোতদার-মহাজনদের শ্রেণী স্বার্থের বিরোধী হবে, অথচ কংগ্রেস হল বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী শ্রেণীর মতো তাদেরও শ্রেণী সংগঠন।

কাজেই কৃষকদের শ্রেণী সংগঠন তৈরী করার দায়িত্ব এসে পড়ল সেই সব রাজনীতিক পার্টি ও কর্মীর উপর যারা নীতিগতভাবে ভূমিবিপ্লব ও কৃষিবিপ্লবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনকে স্বীকার করে, তাকে অবশ্যম্ভাবী বলে বিশ্বাস করে এবং সেই বিপ্লবকে অগ্রসর করে নেবার কাজকে নিজেদের রাজনীতিক কর্তব্য বলে মনে করে।

তখনকার ভারতের মতো ঔপনিবেশিক দেশে ভূমি-বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্লব

ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অচ্ছেদ্য অংশ ও তার মেরুদণ্ড, সমগ্র কৃষক শ্রেণীর শোষণ-মুক্তির নিশ্চিত ও অপরিহার্য উপায়। সমগ্র জাতির স্বার্থে, সমস্ত মেহনতকারী শ্রেণীগুলির স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ থেকে মুক্তি অর্জনই প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতার ও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বুনিয়াদ, এবং এই বুনিয়াদের উপরই নির্ভর করে স্বাধীন ভারতের অগ্রগতি, কৃষি ও শিল্পের অবাধ উন্নয়ন ও বিকাশ, দেশের শিল্পায়ন ও সাংস্কৃতিক জীবনের জয়যাত্রা।

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব সে ধরনের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে যেতে চাইলেন না। সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থের চিন্তাই তাঁদের নিকট বড় হয়ে থাকল। বিপ্লবের চিন্তা তাঁদের আতংকিত করলে। যারা এ ধরনের কোন বিপ্লবী আন্দোলনে থাকবে তাদের থেকে তাঁরা গা বাঁচিয়ে একটু দূরে দূরে থাকাই সমীচীন বোধ করলেন।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা তৃতীয় দশকেই বিপ্লবী কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজ হাতে নিয়েছিলেন, সে পথে ধীরে ধীরে অগ্রসরও হচ্ছিলেন। কৃষক ও শ্রমিক পার্টির মধ্যে দিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন তাঁরা। ১৯৩৪ সনে কমিউনিস্ট পার্টিকে যখন বেআইনী ঘোষণা করা হয় তখনো তার কর্মীরা পূর্বের মতো কিন্তু আরো বিস্তৃত ক্ষেত্রে কৃষক সংগঠনের কাজ করছিলেন।

কংগ্রেসী আন্দোলনের ব্যর্থতা

১৯৩০ সনে কংগ্রেস যে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেছিল, ১৯৩১-এর মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে তা বন্ধ করা হয়। চুক্তির মধ্যে শ্রমিক বা কৃষকদের শ্রেণী দাবি হিসাবে একটি দাবিও রাখা হয়নি। এবং যে ১১ দফা দাবি বড়লাটের কাছে পেশ করা হয়েছিল তারও কোনটাই স্বীকৃত হয়নি। চুক্তিটা আসলে ছিল ব্রিটিশ সরকারের নিকট কংগ্রেস নেতৃত্বের আত্মসমর্পণ। বিপ্লবের পথ না ধরলে এই পথেই যেতে হবে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। কংগ্রেস যে গোলটেবিল বৈঠক বয়কট করেছিল, এই চুক্তির ফলে তাতেই যোগদান করতে প্রতিনিধি পাঠালে।

এই চুক্তির ফলে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা মোটেই উৎসাহবোধ করেননি। চুক্তির দ্বারা কংগ্রেসের সাফল্যের কথা প্রচার করা হলেও, অনেকের মন ব্যর্থতার বিষাদে ভরে ছিল। তাঁদের মধ্যে বামপন্থী

মনোভাব জেগে উঠতে থাকে। গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে আসার পর গবরমেন্ট কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করে (৪ জানুয়ারি ১৯৩২)। অমনি স্বতস্ফূর্তভাবে আবার আইন অমান্য শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এবার জেলে গিয়ে কংগ্রেস কর্মীরা অনেকে সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম সম্বন্ধে পড়াশুনা ও আলাপ আলোচনা করেন, কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্যর্থতা দেখে শ্রেণী আন্দোলনের কথা চিন্তা করতে থাকেন। গান্ধী-নেতৃত্ব সম্বন্ধে অনেকের মোহভঙ্গ শুরু হয়। প্রধানত এই মোহভঙ্গ ও শ্রেণী চিন্তারই পরিণতি কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি'র প্রতিষ্ঠা।

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি' তার ঘোষিত নীতি হিসাবে মার্কসবাদী মতাদর্শকে গ্রহণ করে এবং জাতীয়তাবাদকেও মেনে চলে। মোটামুটি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণী আন্দোলন ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে। এই চিন্তাধারা অনুসারে এই পার্টি' কাজও আরম্ভ করে। বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতাদের সঙ্গে এই পার্টি'র যোগাযোগ থাকে, আলাপ আলোচনাও চলে।

কমিউনিস্ট পার্টি' ও সোশ্যালিস্ট পার্টি'র মেম্বররা সকলেই কংগ্রেসেরও মেম্বর ছিলেন। এই দুই পার্টি'র বাইরেও অনেকে ছিলেন যাঁরা শুধু কংগ্রেসেই ছিলেন, অন্য কোন পার্টি'তে যোগদান করেননি। এমন অনেকেও ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কংগ্রেসের কর্মনীতি সম্বন্ধে মোহমুক্ত হয়ে কৃষকদের আন্দোলন ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেন এবং আন্দোলন শুরুও করে দেন।

এই সমস্ত প্রগতিশীল ও বামপন্থী পার্টি' ও ব্যক্তি ছাড়া সে সময়ে ছিল আর এক পার্টি', যা সাধারণত রায়বাদী পার্টি'—এম. এন. রায়ের অনুগামী পার্টি' বলে পরিচিত ছিল। ছোটখাটো আরো দু একটা পার্টি' ছিল যাদের মোটামুটি বামপন্থী বলা চলে।

সারা ভারত কৃষক সভা

১৯৩৪-৩৫ সনে বিভিন্ন প্রদেশে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে দেখে এই সব পার্টি' ও ব্যক্তিদের মধ্যে কৃষকদের একটা সর্বভারতীয় সংগঠন কায়েম করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে

আলোচনা হয়। তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুসারে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি'র সর্বভারতীয় সম্মেলনের সময় মীরাটে (যুক্ত প্রদেশ) সারাভারত কৃষক সংগঠনী কমিটি গঠিত হয় (১৫ জানুয়ারি ১৯৩৬) এবং স্থির হয় বিভিন্ন প্রদেশের কৃষক আন্দোলনের প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী লখনৌ অধিবেশনের সময় সেখানেই সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের (তখন বলা হত কৃষক কংগ্রেস) অধিবেশন হবে। এই সম্মেলনকেই সারা ভারত কৃষক সভার প্রথম সম্মেলন বলা হয়।

মীরাটের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশে বিশেষভাবে লেবার পার্টি উদ্যোগী হয়ে লখনৌ সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। নোয়াখালির মোহম্মদ ফজলুল্লাহ (চুন্নুমিয়া) তাঁর জেলায় বিভিন্ন এলাকার কৃষক কর্মীদের নিয়ে একটি প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন আহ্বান করেন। সেখানে চুন্নুমিয়া, কমল সরকার ও অনন্ত মুখার্জি সহ মোট চার জনকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একমাত্র কমল সরকার ছাড়া অন্য কেউ লখনৌ গিয়ে সারা ভারত সম্মেলনে যোগদান করতে পারেননি। তবে নির্বাচিত প্রতিনিধি না হলেও নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও ত্রিপুরা জেলার কংগ্রেস নেতা আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরীও কমরেড সরকারের সঙ্গে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

লখনৌ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১১ই এপ্রিল ১৯৩৬ সনে। বিহারের কৃষক নেতা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলন থেকেই বাংলায় প্রাদেশিক কৃষক সভা সংগঠনের জন্য কমল সরকার ও নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

তাঁরা ফিরে এলে এই কাজের জন্য ফজলুল্লাহ সাহেবকে আহ্বায়ক করে কলকাতায় একটি ছোট কমিটি গঠন করা হয় এবং পরে সেই কমিটির আহ্বানে ১৬-১৭ আগস্ট ১৯৩৬ সনে কলকাতার আলবার্ট হলে বিভিন্ন জেলার কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে কুড়িটি জেলার প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং সেখানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। তার আহ্বায়ক নির্বাচিত হন বঙ্কিম মুখার্জি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা

এই সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে জেলাগুলিতে কৃষক আন্দোলন ও

সংগঠনের কাজের উপর জোর দেওয়া হয় এবং অনেক জেলাতে কৃষক সমিতি গঠন করা হয়। বাঁকুড়া জেলা কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে জগদীশ পালিতের আহ্বানে বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়েরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসে ২৭-২৮ মার্চ ১৯৩৭ সনে। এই সম্মেলনেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক কমিটি নির্বাচিত হয়

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার কর্মীরা ১৯২৫-২৬ সন থেকেই কৃষকদের শ্রেণী আন্দোলন ও সংগঠন সম্বন্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে এসেছেন। তার কারণ শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হিসাবে তাঁদের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিবিপ্লব ও কৃষিবিপ্লবের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁদের সুস্পষ্ট ধারণা। এ বিষয়ে কমিউনিস্ট কর্মীরা কীভাবে চিন্তা করেন তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উদ্ধৃত করা হল ("কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও সমস্যা"; ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১৯৫৯, পৃঃ ৩৪-৩৭।):

"শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত স্বাধীন ভারতের ও বাংলার প্রয়োজন ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্রী বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করা, কৃষি বিপ্লবের জন্য ভূমি সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করা এবং এই উপায়ে, দেশের বাস্তব প্রয়োজন অনুসারে, সাবেক অর্থব্যবস্থার ও উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে তার স্থানে নতুন এক অর্থব্যবস্থা ও উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন করা। বাস্তব অবস্থা বিচারে এইভাবে দেশকে সমাজবাদের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল এবং তার জরুরী প্রয়োজনও ছিল। সে সম্ভাবনা ও প্রয়োজন আজও আছে।"

"জাতীয় মুক্তির কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে এবং দেশে গণতন্ত্র কায়েম করতে হলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও প্রভাবকে, দেশীয় একচেটিয়াপতিদের শোষণকে এবং সামন্তবাদী শোষণ ও প্রভাবকে নির্মূল করা একান্ত প্রয়োজন। এই উপায়েই দেশে ব্যাপকভাবে সাধারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রভাব কায়েম করা সম্ভব। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী, বিপ্লবের দ্বারাই সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক কাজগুলি সমাধা করা যেতে পারে, কৃষি বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করা যেতে পারে।"

কৃষক হবে জমির মালিক

কৃষি বিপ্লবের জন্য ভূমি সংস্কার অর্থাৎ জমিদারের ও একচেটিয়া জমির

মালিকদের জমি বাজেয়াপ্ত করে বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা এবং কৃষককে জমির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে অপরিহার্য প্রথম ধাপ। শ্রমিক শ্রেণী এই কাজের প্রতি খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। এই ভূমি সংস্কার একদিকে যেমন কৃষককে অর্থনীতিক ধ্বংস থেকে রক্ষা করে, অন্যদিকে তেমনি রাজনীতির দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তার মিতালিকে পোক্ত করে দেয়।

"ভূমি সংস্কারের সামাজিক ও রাজনীতিক তাৎপর্য এই সমস্ত বিষয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে :

"(ক) জমির উপর জমিদারী মালিকানা খতম করে এবং সেই জমি কৃষকের হাতে তুলে দিয়ে কৃষকের মালিকানা কায়েম করা। (খ) সাম্রাজ্য বাদী শাসনের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ জমিদার শ্রেণীকে শ্রেণী হিসাবে খতম করা এবং চিরকালের জন্য সামন্তবাদের অবশেষগুলোকে এবং সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে নির্মূল করা। (গ) মেহনতকারী কৃষকদের অর্থনীতিক অবস্থা উন্নত করা, গ্রামাঞ্চলে ধনিকের শোষণকে অনেক পরিমাণে খর্ব করা। (ঘ) কৃষি ব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তির অগ্রগতির জন্য নতুন পর্যায় শুরু করা। (ঙ) শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যেকার মিতালিকে আরো পোক্ত করা এবং সেই মিতালির মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকাকে বাড়িয়ে তোলা। (চ) এই সঙ্গে সাধারণভাবে সমাজের রাজনীতিক জীবনকে এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আরো গণতান্ত্রিক করে তোলা।"

"কৃষককে জমির মালিক করা, তাকে ঋণমুক্ত করা, তার উৎপাদনের কাজে যন্ত্র, ঋণ, সেচ, সার ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য ও সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং এইভাবে কৃষি ব্যবস্থায় নতুন উৎপাদন শক্তি সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করার ফলে একদিকে যেমন খাদ্যশস্য ও শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন বাড়িয়ে সারা দেশের সমৃদ্ধি বাড়ান হয়, তেমনি অন্যদিকে সমগ্র কৃষক সমাজের অর্থনীতিক অবস্থার ও ক্রমে সাংস্কৃতিক অবস্থারও উন্নতি করা হয়।"

"কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতির বা ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার, তার ফলে শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, কারখানা শিল্পের ব্যাপক প্রসার ও শিল্পায়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, সাধারণভাবে মেহনতকারী জনগণের জীবিকার মান উন্নয়ন, এবং

বা সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন। সম্মেলনে হাজির ছিলেন ২০টি জেলা থেকে প্রায় ২০০ প্রতিনিধি। তাঁরা বঙ্কিম মুখার্জিকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সংগঠনী কমিটি গঠন করেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সবেমাত্র অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে কলকাতা ফিরেছিলেন, তিনিও এই সম্মেলনে যোগ দেন।

সংগঠনী কমিটির চেষ্টায় বাংলার অনেকগুলি জেলায় জেলা কৃষক সংগঠনী কমিটি তোয়ের করা হয়। কয়েকটি জেলায় ইতিমধ্যেই বিভিন্ন নামে জেলা কৃষক সংগঠন কাজ করছিল। তার মধ্যে ছিল ত্রিপুরা, নোয়াখালি, বর্ধমান ও যশোহর জেলা। বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতি তখনি সারা ভারত কৃষক সভার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নেয়। তাছাড়া সংগঠনী কমিটি গঠিত হয় বাঁকুড়া, হুগলি, যশোহর, ঢাকা ও বরিশাল জেলায়।

প্রাথমিক কাজ শুরু

১৯৩৬ সনের ডিসেম্বর মাসে যখন ফয়েজপুরে (মহারাষ্ট্র) জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন বসে, সেই সময়ে সেখানেই সারা ভারত কৃষক সম্মেলনেরও দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই অধিবেশনে বাংলার প্রাদেশিক ও জেলা কৃষক সংগঠনী কমিটিগুলির কয়েকজন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

১৯৩৫এর ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তিত হয়। সেই উপলক্ষে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে বাংলার কৃষক সভা সাধারণত কংগ্রেসের ও কৃষক-প্রজা সমিতির প্রার্থীদের সমর্থন করে। কিন্তু ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলায় সেখানকার জেলা কৃষক সমিতির নিজস্ব প্রার্থীও দাঁড় করানো হয়েছিল।

ত্রিপুরা জেলায় মোট দশটি আসনের সবগুলির জন্যই কৃষক সমিতি প্রার্থী খাড়া করে এবং তার মধ্যে সমিতির সভাপতি ওসিমুদ্দীন আহমদ সহ পাঁচ জন জয়লাভ করেন। নোয়াখালি জেলায় কৃষক নেতা সৈয়দ আহমদ খাঁও কৃষক সমিতির প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করেন।

নির্বাচনের পর জেলাগুলিতে সভার প্রাথমিক মেম্বর সংগ্রহের কাজ চলে। হাওড়া, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, ২৪পরগনা, ফরিদপুর ও চট্টগ্রাম জেলায় সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। তখন ত্রিপুরা ও নোয়াখালির জেলা কৃষক সমিতিও প্রাদেশিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়।

প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন ঃ পাত্রসায়ের

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২৭-২৮ মার্চ ১৯৩৭ তারিখে বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের গ্রামে। তখন সারা প্রদেশে প্রাথমিক মেম্বর ছিল মোট ১১,০৮০। এই সম্মেলনে জেলা সংগঠনী কমিটি-গুলির প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। তখন বীরভূম ও নদীয়া জেলায় স্বীকৃত সংগঠন না থাকলেও ঐ জেলাগুলি থেকেও কৃষক কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পাত্রসায়ের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি পাঁচ জনের একটি সভাপতি পরিষদ গঠন করে। তাতে ছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, সৈয়দ আহমদ খাঁ, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। সম্মেলন প্রথম প্রাদেশিক কৃষক কমিটি নির্বাচন করে। কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন বঙ্কিম মুখার্জি এবং সহকারী সম্পাদক মনসুর হবিব ও অনন্ত মুখার্জি।

সভাপতি পরিষদের তরফ থেকে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ একটি নীতি-গত দলিল পেশ করেন। এই দলিলে কৃষক সভার অনেক নীতি ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। "এই লেখাটিই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার প্রথম রাজনীতিক-সাংগঠনিক দলিল হিসাবে সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল।" (মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, "কৃষক সমস্যা" নামে ছাপান এই নিবন্ধের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা, ১৪ আগষ্ট ১৯৫৪।) সম্মেলনে প্রাদেশিক কৃষক সভার একটি গঠনতন্ত্রও পাস হয়েছিল।

তখনো সারা ভারত কৃষক সভার গঠনতন্ত্র রচিত ও গৃহীত হয়নি, যদিও তার নাম ও উদ্দেশ্য অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। পরে এই বিষয়ে গঠনতন্ত্রে যা লেখা হয়েছে, সারা ভারত ও প্রাদেশিক সভার গঠনতন্ত্র থেকে তাই উদ্ধৃত করছি। সারা ভারত সভার নাম ও উদ্দেশ্য এই :

কৃষক সভার লক্ষ্য

"নাম : সারা ভারত কৃষক সভা প্রদেশগুলির ও ভারতীয় [দেশীয়] রাজ্যগুলির কৃষকদের গণ প্রতিষ্ঠান। কৃষকদের মধ্যে গ্রাম্য মজুরদেরও ধরা হয় এবং তারা নিজেদের পৃথকভাবে সংগঠিত করতে পারে এবং সেই পৃথক সংগঠনগুলিকে সভার সহিত যুক্ত করতে পারে।

সংখ্যা ছিল প্রায় ২৯১ জন। ১৯৩১ সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে এই সংখ্যা বাড়িয়া প্রতি হাজার জন কৃষকে ৪০৭ জনে দাঁড়াইয়াছে। ইহা শুধু বাংলার সমস্যা নহে, ইহা সারা ভারতের সমস্যা।" (পৃ ৩০)

"এই কারণে বৃটিশ সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শাসনের কবল হইতে ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা অপরিহার্যরূপে আবশ্যক। কিন্তু যদি আমরা কেবল স্বাধীনতাই লাভ করি, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে কোন সামাজিক বিপ্লব না ঘটে, তাহা হইলে সেই স্বাধীনতা লাভের কোন মূল্যই থাকিবে না। দেশের জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া আমাদের বিরাট কৃষক-সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগের একটা চরম প্রতিকার শুধু এক আমূল সামাজিক পরিবর্তনের দ্বারাই হইতে পারিবে। তবে বৃটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের অস্তিত্ব দেশে বর্তমান থাকিলে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। তাহারই জন্য সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শাসনের হাত হইতে ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা আবশ্যক।" (পৃ ৩১)

জাতীয় বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্লব

"আমরা যে ভারতের জাতীয় বিপ্লবের কথা বলিয়া থাকি তাহা একমাত্র সাম্রাজ্যতন্ত্র-বিরোধী কৃষি-বিপ্লবের দ্বারাই সফলতা লাভ করিতে পারিবে। আমাদের জাতীয় বিপ্লব কথাটার মানেই হইতেছে কৃষকদের জীবনে এক বিরাট, বিশাল সামাজিক বিপ্লব।" (পৃ ৩২)

"মোট কথা, আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামকে আমরা কিছুতেই আমাদের কৃষি-বিপ্লবের সংগ্রাম হইতে পৃথক করিতে পারিব না। কৃষকদের উৎপাদন প্রথার সহিত যত প্রকার শোষণের ও পরগাছা-সম্প্রদায়ের সংশ্রব রহিয়াছে, সে-সমুদায়কে সমূলে উৎপাটিত করিয়া না ফেলিলে কৃষক-সমস্যার প্রকৃত সমাধান কিছুতেই হইবে না।" (পৃঃ ৩৪)

"কাজেই, কৃষকদের সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইয়া কলকারখানার মজুরদের সহায়তা লাভ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, সংগ্রামের নেতৃত্বের ভারও শ্রমিক শ্রেণীর হাতেই অর্পণ করিতে হইবে।" (পৃ ৩৪-৩৫)

"দেশের শিক্ষিত ভদ্র-সম্প্রদায়ের যে-সকল লোক শোষণের মনোবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে পারিয়াছেন এবং শ্রমিক ও কৃষকগণের স্বার্থকেই নিজেদের স্বার্থ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছেন, সে-সকল লোকও শ্রমিক ও কৃষকগণের সংগ্রামে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারিবেন।" (পৃ ৩৫)

"আজ এই সম্মেলনেই আমরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা যথারীতি গঠন করিব। আমাদের এই প্রাদেশিক কৃষক-সভা অবশ্য নিখিল ভারত কৃষক-সভার প্রাদেশিক শাখা ছাড়া আর কিছুই হইবে না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা বাংলার কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া তুলিবে। ইতিমধ্যেই বাংলার কয়েকটি জিলায় আমাদের সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা কৃষক-সংগঠন সমূহকে উপর হইতে গড়িবার চেষ্টা না করিয়া নিচে হইতে গড়িয়া তুলিবে। কমপক্ষে ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই আমরা আমাদের সংগঠনের কাজ আরম্ভ করিব।···বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা বাংলার কৃষকগণের একটি শ্রেণী-সংগঠন। কৃষকদের যাহারা শোষণকারী তাহাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রামের পরিচালনা করাই কৃষক-সভার উদ্দেশ্য।" (পৃ ৩৮)

সংগ্রামী সংগঠন

"বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা বাংলার কৃষকগণের অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানই শুধু হইবে না, ইহা কৃষকদিগকে তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের সংগ্রামের জন্যও প্রস্তুত করিয়া তুলিবে। ইহা কৃষকগণের একটি সংগ্রামশীল সংগঠন হইয়া উঠিবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা বাংলার কৃষকগণের কোন অভি-যোগকেই এড়াইয়া চলিবে না, তা সে-অভিযোগ যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন। কৃষক সমিতিগুলি যদি কৃষকদের প্রতিদিনের ছোট-খাটো অভিযোগগুলির প্রতিকারের জন্য লড়াই করিতে না পারে তাহা হইলে বুঝিয়া লইতে হইবে যে কৃষকদের বড় লড়াইও কৃষক-সমিতি লড়িতে পারিবে না। কৃষক সংগ-ঠনের কাজে যাঁহারা নিয়োজিত রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই বিষয়টির প্রতি সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।" (পৃ ৪১)

"গ্রামের কৃষক-আন্দোলন ও শহরের শ্রমিক-আন্দোলনের মধ্যে একটা যোগাযোগ আমাদিগকে অবশ্যই স্থাপন করিতে হইবে। শ্রমিক আন্দোলনের সংস্রবে না আসিলে কৃষক-সংগঠন গড়িয়া তুলিবার পরিষ্কার ধারণা কৃষক-সংগঠনকারীদের মনে জন্মিবে না।"(পৃ ৫১)

"ভূমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা আমাদের দেশে সাড়ে তিন কোটিরও বেশি। তাহারা ভূমি পাইবে কি না, সে কথাও নব শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উঠে। এইরূপে কল-কারখানার শ্রমিক এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সুখ-সুবিধার কথাও উঠে। নূতন শাসন-

পদ্ধতিতে এসবের কোন ব্যবস্থাই নাই। এই সকল কারণে নব শাসন-পদ্ধতি আমাদের নিকটে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।" (পৃ: ৫৩)

নীতিগত ঐক্য

উপরে যে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া হল তার মধ্যে কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে এবং তার লক্ষ্য সম্পর্কে কতকগুলি তত্ত্ব ও নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই মূল নীতিগুলিকে আজো সঠিক বলেই ধরা হয়। এই বিষয়গুলিকে সমস্ত প্রদেশে বা সারা ভারতের ক্ষেত্রে যে ঠিক এই ভাবেই গ্রহণ বা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল তা বলা যায় না। কিন্তু আলোচনা করলে তাই নিয়ে নেতৃত্বের মধ্যে প্রকাশ্য ও মৌলিক মতভেদ দেখা দিত না বলেই মনে হয়।

সারা ভারত কৃষক সভার প্রতিষ্ঠা থেকে বছর চারেক অন্তত এ ধরনের নীতিগত বিষয় নিয়ে মতভেদটা তেমন প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি। বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টি ও তখনকার কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কৃষক সভার রাজনীতিক চরিত্র বিশ্লেষণে অনেক পরিমাণে একমত ছিলেন এবং অদলীয় প্রধান নেতারাও অনেক পরিমাণে একই ধরনের মত পোষণ করতেন। তাহলেও একথা বলা যায় যে কমিউনিস্ট প্রভাবিত না হলে এই নিবন্ধের বক্তব্যগুলি প্রকাশের ভাষা হয়তো একটু ভিন্ন ধরনের হত।

পাত্রসায়ের সম্মেলনের পরে এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে কয়েকটি জেলায় জেলা কৃষক সম্মেলন হয় ও নিয়মিত জেলা কৃষক কমিটি গঠিত হয়। তার মধ্যে ছিল যশোহর, খুলনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ। অনেক জেলায় মহকুমা ও থানা সম্মেলনও করা হয়। আগস্ট মাস নাগাত ময়মনসিং, দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহী জেলাতেও জেলা কৃষক সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। বরিশাল ও ২৪ পরগনা জেলায় সরকারী দমন ব্যবস্থার কারণে কৃষক সমাবেশ সহ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। তবে ২৪ পরগনা জেলার প্রথম প্রতিনিধি সম্মেলন করা হয় কলকাতায়।

মে দিবস পালন

সারা ভারত কৃষক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে এই বৎসর (১৯৩৭) অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলা দেশেও কয়েকটি "দিবস" পালন করা হয়েছিল। সেগুলি ছিল মে দিবস (১লা মে), সারা ভারত কৃষক দিবস (১লা

সেপ্টেম্বর), ঋণ মকুব দিবস, কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনী ঘোষণা করার দাবি দিবস, বিহার কৃষক দিবস, ও চীন দিবস। যে দিবস উপলক্ষে প্রাদেশিক কৃষক সভা থেকে যে বাংলা ও হিন্দী পোস্টার প্রচার করা হয়েছিল তার কারণে সভার আফিসে পুলিস তল্লাসী করে এবং আফিস সম্পাদককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

যে দিবস পরেও পালন করা হয়েছিল অন্তত ১৯৪০ পর্যন্ত। সারা ভারত কৃষক দিবস সাধারণ ভাবে কৃষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সারা ভারতে একই দিনে প্রচার করার উদ্দেশ্যে পালন করা হয়। ১৯৪৪ সনেও তা হয়েছে। এখন আর হয় না। ঠিক কোন্ সময় এবং কী কারণে বন্ধ হল বলতে পারি না। এ ধরনের সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিক দিকটার গুরুত্ব কমে যাওয়া বন্ধ হবার একটা কারণ হতে পারে।

কৃষক আন্দোলনে ও সংগঠনে কমিউনিস্ট পার্টির যে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, বেআইনী পার্টির উপর থেকে নিষেধআজ্ঞা তুলে নেবার দাবি নিয়ে সারা ভারতে একটা দিবস ঘোষণা ও পালনের মধ্যে তার স্বীকৃতি স্পষ্ট। শুধু তাই নয়, কৃষক সভার মধ্যে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে যে-কোন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা তাঁদের পার্টি নেতৃত্বও যে এই দাবির গুরুত্ব স্বীকার করতেন তাও পরিষ্কার। তার মধ্যেও যে নিছক ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নই ছিল সে কথা বলা ভুল হবে; বিষয়টা সকলের চেতনাতেই ছিল সম্পূর্ণ রাজনীতিক বিষয় হিসাবে। আসল কথা, তখনকার দিনে কৃষক সভার মধ্যে নীতিগত প্রশ্ন নিয়ে এখনকার মতো বিরোধের কারণ ঘটেনি। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার স্বার্থকে ঠিক অভিন্ন মনে করা না হলেও, মোটামুটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে মনে করা হত, এবং তারই ফলে মত বিরোধের ক্ষেত্র তখনো প্রস্তুত হয়নি, অন্তত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

বিহারের বাকাশ্ত আন্দোলন

বিহার কিসান দিবসের একটা বিশেষ তাৎপর্য ছিল। এই সময়ে বিহারে গয়া, মুঙ্গের প্রভৃতি জেলায় বাকাশ্ত জমি সম্বন্ধে প্রবল আন্দোলন চলছিল। এই জমি কৃষকরা দীর্ঘকাল ধরে চাষ করে আসছিল। কিন্তু নতুন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের পর বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করে সেই বাকাশ্ত জমিতে কৃষকদের

পূর্ণ স্বত্ব স্বীকার করে নেবে এই আশংকা করে জমিদাররা ব্যাপকভাবে কৃষকদের উচ্ছেদ করতে এবং সেই জমি খাসে আনতে লাগল। তখন কৃষকদের প্রতিরোধ আরম্ভ হল এবং তা ব্যাপক ও জোরদার আন্দোলন হয়ে উঠল। তখন কংগ্রেস সরকারের পুলিস এল জমিদারদের সাহায্যে—উচ্ছেদ বহাল রাখতে। মুঙ্গের জেলার বাড়হাইয়াটালে ২০০ বাকাশ্‌ত সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হল। শেখপুরায় ষোল জন সত্যাগ্রহী কৃষক নারীকে (তার মধ্যে বারো জনের কোলে শিশু) এক বছরের সাজা দিয়ে জেলে পাঠানো হল। পাঁচ জন কৃষককে খুন এবং আরো অনেককে জখম করা হল। এমনি বহু নির্যাতনের ঘটনা ঘটল। সর্বত্র বড় বড় কৃষক জমায়েত ডেকে প্রতিবাদের ঝড় তোলা হল। সারা ভারতের ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের সমর্থনে ১৮ই অক্টোবরকে (১৯৩৭) বিহার কিসান দিবস বলে ঘোষণা করা হয়।

এই বছর জুলাই মাসে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা বিনা প্ররোচনায় নতুন করে চীন আক্রমণ করেছিল। চীনের জনগণ এবং বিশেষ করে চীনের কৃষক সমাজ সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে যে দেশরক্ষার যুদ্ধ আরম্ভ করে, তার সমর্থনে এবং চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করার জন্য চীন দিবস পালন করা হয়।

এই সমস্ত "দিবস" ঘোষণা ও পালন করার মধ্যে দেখা যায় যে একদিকে যেমন কৃষকদের শ্রেণী দাবী ও তার আন্দোলনকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি অন্যদিকে তার রাজনীতিক চরিত্র, সর্বভারতীয় চরিত্র ও আন্তর্জাতিক চরিত্র আর সেই সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সহিত মিতালির আগ্রহও পরিস্ফুট হয়েছে।

জমিদারী-উচ্ছেদ অভিযান

পাত্রসায়ের সম্মেলনের পর সারা বাংলা দেশে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হয় জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের দাবি নিয়ে, মহাজনের ঋণ মকুবের ও অন্যান্য দাবি নিয়ে। কৃষকদের সাড়াও তেমনি পাওয়া গিয়েছিল সর্বত্র। বড় বড় কৃষক জমায়েত হয়েছিল জেলায় জেলায়। আন্দোলনের এক জোয়ার এসে গিয়েছিল। কৃষকদের এই সব শ্রেণী দাবি এখনি নতুন তোলা হয়নি, তোলা হয়েছিল বহু পূর্বেও, তাই নিয়ে বড় বড় আন্দোলনও হয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রায় প্রত্যেকটি কৃষক বিদ্রোহের আশু দাবির সঙ্গে এই জমিদারী ও মহাজনী প্রথা-বিরোধী দাবিগুলিও স্বতস্ফূর্তভাবে

তোলা হয়েছিল, সরাসরিই হ'ক বা পরোক্ষেই হ'ক। কিন্তু এখনকার মতো সংগঠিত ও সচেতন আন্দোলন পূর্বে কখনো হয়নি।

পাত্রসায়ের সম্মেলনের পরে প্রাদেশিক কৃষক সমিতির প্রথম বৈঠক ডাকা হয় বর্ধমান জেলার কুড়মুন গ্রামে (ডিসেম্বর ১৯৩৭)। তখন কৃষক সভার সভ্য সংখ্যা ছিল ৩৫,৫৭৫।

লাল পতাকা গৃহীত

এই সময়ে বাংলার কৃষকদের মধ্যে যে সমস্ত নির্দিষ্ট স্থানীয় দাবীর আন্দোলন চলছিল তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বর্ধমান জেলায় ক্যানাল কর-বিরোধী আন্দোলন এবং ২৪ পরগণা জেলায় খাস জমির আন্দোলন।

বাংলাদেশে জমিদারী উচ্ছেদের দাবিই কৃষক সভার আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ও প্রধান দাবি হলেও আরো অসংখ্য ছোট বড় দাবি তোলা হয়েছিল। মহাজনী ঋণ আদায় কিছু কালের জন্য স্থগিত রাখার দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তাছাড়া বেগার বন্ধ করা থেকে পোষ্টকার্ডের দাম কমিয়ে দু পয়সা থেকে এক পয়সা করা পর্যন্ত কৃষকদের জন্য প্রয়োজনীয় বহু বিষয়ের দাবি নিয়ে আন্দোলন চলেছিল।

কৃষক সভার কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত লাল পতাকা চূড়ান্তভাবে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়েছিল সারা ভারত কৃষক কমিটির সভায় (কলকাতা, ২৭-২৮ অক্টোবর ১৯৩৭)। তার পূর্বে এই কমিটির নিয়ামতপুর (গয়া জেলা) অধিবেশনে ১৩ জুলাই ১৯৩৭ তারিখে যে আলোচনা হয় তার ভিত্তিতে সারা ভারত সভার সভাপতি ও সম্পাদকদের বিবৃতিতে লাল পতাকা গ্রহণের কথা ঘোষিত হয়। সেই ঘোষণাকে কলকাতা অধিবেশনের এক প্রস্তাবে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করে বলা হয় কৃষকরা এবং কৃষক সভাগুলি ও কমিটিগুলি যেন এই লাল পতাকাকেই নিজেদের পতাকা বলে গ্রহণ করে এবং তারই নিচে সমাবেশ ও অভিযান করে, আর সেই সঙ্গে তারা যেন কংগ্রেসের পতাকাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক বলে মেনে নেয় এবং মর্যাদা দেয়।

কৃষক সভার এই পতাকাকে পরে সারা ভারত কৃষক সভার পঞ্চদশ অধিবেশনে (বনগাঁ, ১-২ নবেম্বর ১৯৫৭) পরিবর্তন করে লাল পতাকার উপর কাস্তে-হাতুড়ির পরিবর্তে কেবল কাস্তে চিহ্ন রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

এই পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল এই যে কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্ন কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতেও আছে বলে কংগ্রেসী কৃষকরা কৃষক সভায় যোগ দিতে চায় না, সেজন্য এই চিহ্ন পরিবর্তন করে তাঁদের কৃষক সভায় যোগদানের পথ প্রশস্ত করতে হবে। আসলে এই যুক্তি ছিল তাঁদের যাঁরা কৃষক সভার শ্রেণী চরিত্রকে লঘু করে দেখে কংগ্রেসের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হবার প্রয়োজনকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতেন এবং শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের প্রয়োজনকে ছোট করে দেখতেন। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের গুরুত্বকে যাঁরা বড় করে দেখতেন তাঁদের নিকট এ যুক্তির বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। এই পরিবর্তনের ফলে বেশি কংগ্রেসী কৃষককে কৃষক সভায় আনাও যায়নি। বরং শ্রমিক শ্রেণীর চিহ্ন হাতুড়িকে তুলে দেওয়ায় শ্রমিক-কৃষক মিতালির প্রতীককে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছিল।

১৯৩৮ সনের মে মাসে সারা ভারত কৃষক সভার তৃতীয় সম্মেলন হয়েছিল বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরে (বর্তমানে পাকিস্থানে)। স্বভাবতই এই সম্মেলনের আয়োজনের জন্য দায়িত্ব এসে পড়ল প্রাদেশিক কৃষক সভার উপর। এই সম্মেলনের কারণে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের আয়োজন বিলম্বিত হল।

কুমিল্লা সম্মেলনে যোগদানের জন্য বাংলাদেশের ৩৫,৫৭৫ জন প্রাথমিক মেম্বরের প্রতিনিধি হিসাবে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের একটা সভা ডাকা হয় কলকাতার আলবার্ট হলে ১১ই এপ্রিল তারিখে। তাঁদের কাজ ছিল সম্মেলনের সভাপতি ও সারা ভারত কৃষক কমিটির বাংলাদেশের মেম্বরদের নির্বাচন করা।

তখন ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বে তাঁর কৃষক-প্রজা পার্টির মন্ত্রীসভা বাংলা সরকারের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার কাজ করছিলেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের এই মন্ত্রীসভা ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হামলা চালালেন এবং তার শিকার হলেন বিশেষভাবে কৃষক সভার কর্মীরা তাঁদের বিরুদ্ধে নানা জায়গায় দমনের ব্যবস্থা চলল। ২৪ পরগনার হাড়োয়া থানায় ১৪৪ ধারা জারি করা হল, ১০৭ ও ১৫৩ ধারায় সাধারণ কৃষকদের গ্রেপ্তার করা হল, কিছু কর্মীকে জেলেও পাঠানো হল। নোয়াখালির কৃষক নেতা সৈয়দ আহমদ খাঁ, এম. এল. এ. এবং ঐ জেলার ও ত্রিপুরার ইউসুফ আলি প্রভৃতি আরো

অনেক কৃষক কর্মীকে ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস আইন অনুসারে সন্দেহভাজন বলে ঘোষণা করা হল। এই সময়ে বিভিন্ন জেলায় পুলিসের গুপ্তচরেরা কৃষক কর্মীদের হয়রান করতে থাকল। সারা ভারত কৃষক সম্মেলন সম্বন্ধে কুমিল্লায় প্রচার করতে গেলে অন্তত দুজন প্রাদেশিক কৃষক নেতাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা হল। কিন্তু এই সমস্ত অন্যায় জুলুম সত্ত্বেও সরকার কৃষক সভার কাজ অবশ্য বন্ধ করতে পারলে না।

খাস জমির লড়াই

২৪ পরগণা জেলার হাড়োয়া থানায় খাস জমির আন্দোলন চলছিল। ইংরেজ জমিদার পোর্ট ক্যানিং ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানী জোর করে কতকগুলি গ্রামবাসী ও কৃষককে তাদের জমি খাস করে নিয়ে জমিছাড়া ও ভিটেছাড়া করেছিল। প্রতিরোধ করলে নারীপুরুষ অনেক কৃষককে গ্রেপ্তার করে দীর্ঘ সময় হাজতে রাখা হয়েছিল; পরে বিচারে তাদের খালাস করে দেওয়া হয়। এখানকার কৃষকরা ১৯৩৮ সনের এপ্রিল মাসে মার্চ করে বিধান সভায় গিয়ে ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীকে নিজেদের দাবি জানায়। অন্য কতকগুলি জেলাতেও জেলা কর্তৃপক্ষকে নিজেদের দাবি জানাবার জন্য কৃষক অভিযান সংগঠিত করা হয়। ফল সর্বত্রই যে তখনি পাওয়া গিয়েছিল তা বলা যায় না, তবে দাবির পক্ষে জনমত সংগঠনে সাহায্য অবশ্য হয়েছিল।

একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ঋণ সালিসী বোর্ডের কাজ। ১৯৩৬ সনে বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন প্রথমে পাস হয়। তাতে সরকারের মনোমত স্থানীয় মাতব্বরদের উপর ঋণ সম্বন্ধে সালিসী করবার ভার দেওয়া হয় এবং আদালতের মামলা বা ডিক্রি জারি মুলতুবি রাখবার ক্ষমতা দেওয়া হয় ঋণ সালিসী বোর্ডকে। তার ফলে দেনাদার কৃষকদের সুবিধা হয় এই যে ঋণ আদায় স্থগিত রাখা হয় এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা দীর্ঘ মিয়াদে কিস্তিবন্দী করে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে কৃষক সভার কর্মীরা বহু কৃষক-খাতককে সাহায্য করেন এবং তার ফলে কৃষক সভার সংগঠন ও প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

চাষী খাতক আইনে আদালতের ডিক্রির টাকা কমাবার বা দেনার দায়ে জমি নিলাম রদ করবার ক্ষমতা ছিল না। সে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল ১৯৪০ সনে যে বঙ্গীয় মহাজনী আইন এবং ১৯৪২ সনে যে চাষী খাতক আইনের সংশোধনী আইন পাস করা হয় তাতে।

দ্বিতীয় সম্মেলন ঃ বড়া

প্রাদেশিক কৃষক সভার দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২-৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮ তারিখে হুগলী জেলার বড়ায়। সম্মেলনের সভাপতি পরিষদে যে পাঁচ জন নির্বাচিত হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, বঙ্কিম মুখার্জি, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। তাঁদের তরফ থেকে একটি সময়োচিত নিবন্ধ রচনা করা ও প্রতিনিধি সম্মেলনে পেশ করা হয়। পরে সেটা ছাপানও হয়েছিল।

এই নিবন্ধ ছাড়া পাত্রসায়েরে গৃহীত গঠনতন্ত্রকে সংশোধন ও পরিবর্তন করে একটা গঠনতন্ত্র পাস করা হয়। তাতে প্রাদেশিক কৃষক সভার সংগঠন এবং প্রদেশের মধ্যে জেলা, মহকুমা ও ইউনিয়ন স্তরের সংগঠন সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়মাবলী থাকে। প্রাথমিক বা ইউনিয়ন কৃষক সমিতির সংগঠন ও কাজকর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ও শৃংখলার সহিত প্রত্যেকটি সাংগঠনিক কাজ সমাধা করার উপর জোর দেওয়া হয়। তার যথেষ্ট সুফলও পাওয়া গিয়েছিল, যদিও পরে দেখা গিয়েছিল যে অত বেশি কড়াকড়ি ও খুটিনাটি শৃংখলা মেনে নিয়ে সাংগঠনিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বহু কর্মীর পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। তখন আবার সেই গঠনতন্ত্র সংশোধন ও সংক্ষিপ্ত করা হয়।

এই সম্মেলনে কমিউনিষ্ট পার্টি (তখনো বে-আইনী) ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি একমত হয়ে স্থির করে প্রাদেশিক কৃষক কমিটির মধ্যে তারা একযোগে কাজ করবে এবং একজন সাধারণ সম্পাদক সহ মোট দশ জন সম্পাদক নির্বাচন করা হবে, তার মধ্যে প্রত্যেক পার্টি থেকে পাঁচ জন করে নেওয়া হবে। আর এই দশ জন সম্পাদক ও সভাপতি পরিষদের পাঁচ জন মেম্বর নিয়ে মোট ১৫ জনের সম্পাদক-মণ্ডলী গঠিত হবে। সম্পাদক-মণ্ডলীই হবে প্রাদেশিক কৃষক কমিটির কার্যকরী সমিতি।

সম্পাদকদের বিভাগ

সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন: সাধারণ সম্পাদক—মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল; বিভাগীয় সম্পাদকগণ: সংগঠন—অনন্ত মুখার্জি, শুজাত আলি মজুমদার, গবেষণা রেবতী বর্মন, পার্লামেণ্টারি বিষয়—স্মৃতীশ (মানিক) ব্যানার্জি, অর্থনীতি—নিরাপদ মুখোপাধ্যায়, সমবায়—শিবনাথ ব্যানার্জি,

আইন আদালত—চারু ব্যানার্জি, এবং ভলন্টিয়ার সংগঠন—রবি মজুমদার। বিমল প্রতিভা দেবীকেও একজন সম্পাদক হিসাবে নির্বাচন করা হয়।

এত জন বিভাগীয় সম্পাদক নিয়ে যে রকম ঘটা করে প্রাদেশিক কৃষক সভার কাজ চালানো হবে বলে প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল, পরে দেখা গেল তার প্রয়োজন ছিল না। সাধারণ সম্পাদক ও দু জন সংগঠন সম্পাদক ছাড়া আর দু তিন জন কিছু কিছু কাজ করতেন, কিন্তু বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁরা কার্যত অলংকারই হয়ে থাকলেন, কেবল কমিটির সভাগুলিতে যোগ দিতেন। তবে এই ঘটা থেকে এটুকু পরিষ্কার বেরিয়ে আসে যে বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়েছিল।

বড়া সম্মেলন উপলক্ষে দু দিন কৃষক সমাবেশ হয়। দ্বিতীয় দিনের সমাবেশে ২৫ হাজার কৃষক যোগদান করেছিল।

বড়া সম্মেলনের পরেই প্রাদেশিক কৃষক সভার শাখা হিসাবে নদীয়া জেলায় কৃষক সংগঠনী কমিটি গঠন করা হয়। ঐ ডিসেম্বর মাসেই কুষ্টিয়া মহকুমার হরিনারায়ণপুরে (বর্তমানে পাকিস্তানে) নদীয়ার প্রথম জেলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক সভার তরফ থেকে তাতে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ যোগদান করেছিলেন এবং সম্মেলন উপলক্ষে হাজার হাজার কৃষকের সমাবেশ হয়েছিল।

নতুন রাজনীতিক চিন্তাধারা

এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদানের অভিযোগে হাজার হাজার বাঙালী যুবককে গ্রেপ্তার করে আটক রাখা হয়েছিল। এই আন্দোলন যে মতবাদ অবলম্বন করে চলত তাতে ব্যাপক গণচেতনা জাগিয়ে জনগণকে আন্দোলনের মধ্যে আনা সম্ভব ছিল না, সেটা তার লক্ষ্যও ছিল না। ফলে সক্রিয় কর্মী ও সংগঠকদের দীর্ঘ সময় ধরে আটকে রাখায় আন্দোলনের শক্তি ক্ষীণ ও প্রভাব স্তিমিত হতে থাকে।

জেলের মধ্যে আটক থেকে এই বন্দীরা তা অবশ্যই লক্ষ্য করছিলেন। সুতরাং আন্দোলনের গুণাগুণ তাঁদের বিচারও করতে হচ্ছিল। সেই সময়ে বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ও সংবাদ আদান প্রদানের সুযোগ পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছিল। তাতে বাইরের জগতে সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট ভাবধারা, জার্মানী ও ইতালিতে এবং অন্যান্য দেশেও ফাশিস্ট

প্রভাবের ফলাফল, সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও জুলুম থেকে উপনিবেশী ও আধা-উপনিবেশী দেশগুলির জনগণের মুক্তি সংগ্রাম, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য সাম্রাজ্যবাদী অবরোধের কঠোরতা ভেদ করে যে সামান্য পরিমাণেও এদেশে ঢুকতে পেরেছিল তার প্রভাব, এবং সবার উপরে কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতৃত্বে সমাজবাদী সোবিয়েত দেশের জয়যাত্রার সংবাদ আটক বন্দীদের চিন্তাধারার মোড় প্রবলভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল মিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার প্রভাব, জেলের বাইরে শিক্ষিত তরুণ সমাজে নতুন প্রগতিশীল ও সোশ্যালিস্ট চিন্তাধারার ব্যাপক আলোড়ন, এবং তথাকথিত "হালিমস থিসিস" বা অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা আবদুল হালিম কমিউনিস্ট পার্টি'র যে বক্তব্য লিখিত ভাবে বিভিন্ন জেলে ডেটিনিউদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন তার প্রভাব।

এই সমস্ত বিষয় মিলে ডেটিনিউদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার জন্য একটা নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করে দিয়েছিল। নবীন চিন্তার বাহক বইপুস্তকও জেলের মধ্যে কম যায়নি। তার প্রতিফলন হয়েছিল অধিকাংশ শিক্ষিত অন্তরীণের মনোভাব ও চিন্তাধারায় পরিবর্তনের মধ্যে। শ্রেণী সংগ্রামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেকেরই মনে দাগ কেটেছিল।

ডেটিনিউদের মুক্তি

দেশের রাজনীতিক পট পরিবর্তনও কিছু পরিমাণে ঘটেছিল ১৯৩৭ সনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন আরম্ভ হবার সময় থেকে। জেলের বাইরে ব্যাপক আন্দোলন ও প্রচারও হয়েছিল অন্তরীণদের মুক্তির দাবি নিয়ে। ব্যক্তি স্বাধীনতা ইউনিয়ন বহু ডেটিনিউর মুক্তির সপক্ষে সক্রিয় হয়ে অনেকগুলি দলিলও তখন তৈয়ের করেছিল। কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনীতিক পার্টিগুলি আন্দোলনকে জোরদার করে তুলেছিল।

এই সমস্ত প্রভাবগুলির মিলিত ফল বিবেচনা করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে আটক বন্দীদের মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত করে। নতুন মন্ত্রীসভার হাত দিয়ে মুক্তি দানের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৩৭ সনে এবং ১৯৩৮ সনের মধ্যে সমস্ত ডেটিনিউই মুক্ত হয়ে আসেন।

তাঁরা যে নতুন চিন্তাধারা নিয়ে বেরিয়ে আসেন তা তাঁদের মধ্যে অনেককে শ্রেণী আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে। যাঁরা গ্রামাঞ্চলে বাস করেন তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন।

স্বভাবতই ১৯৩৮-৩৯ সনে কৃষক আন্দোলনের কাজ তাতে বেশ প্রসার লাভ করার সুযোগ পায়।

তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যুক্ত থাকার ফলে যাঁদের শাস্তি দিয়ে জেলে পাঠানো হয়েছিল, তাঁরাও অনেকে আরো পরে এইভাবে জেলের মধ্যে থেকে নতুন চিন্তাধারা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং বাইরে এসে অনেকে কৃষক আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।

এই সমস্ত নতুন কর্মীদের মধ্যে অনেকে কৃষক আন্দোলনকে গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন এবং আজো আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয়ে রয়েছেন।

বড়া সম্মেলনের কয়েক মাস পরে (এপ্রিল ১৯৩৯) যখন গয়াতে সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন হয় তখন সেখানে গৃহীত রাজনীতিক প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছিল: "কৃষকরা দেশের সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে শুধু পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি অংশ গ্রহণ করেছে তাই নয়, শ্রেণী হিসাবেও তারা তাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ও সজাগ হয়ে উঠেছে, নির্মম সামন্তবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মুখে মরিয়া হয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে। তাই তাদের শ্রেণী সংগঠনগুলির সংখ্যা বেড়ে গেছে, এই শোষণের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম উচ্চ স্তরে উঠেছে যা বহু আংশিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, এবং তাদের মধ্যে নতুন রাজনীতিক চেতনা সঞ্চার করছে। যে সব শক্তির বিরুদ্ধে তারা লড়ছে তাদের প্রকৃতি তারা উপলব্ধি করেছে, এবং তাদের দারিদ্র্য ও শোষণের যথার্থ প্রতিকার কী তাও তারা বুঝেছে। সেই কারণে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে খোদ সাম্রাজ্যবাদেরই উপর শক্তিশালী আক্রমণ ও তার উৎখাত এবং ভূমি বিপ্লব যা তাদের জমি দেবে, রাষ্ট্র ও তাদের মধ্যেকার সমস্ত মধ্যবর্তী শোষকগুলিকে উৎখাত করবে, তাদের ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করবে, এবং তাদের শ্রমের ফল ষোল আনা ভোগ করবার ব্যবস্থা করে দেবে।"

সারা ভারত কৃষক সভার এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত আজও বজায় আছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন যে একটা ফোঁপরা ব্যবস্থা এবং কায়েমী স্বার্থের বাধাগুলি ঠেলে যে তার মধ্যে থেকে বিশেষ কিছু আদায় করা যাবে না,

এ কথা বলার পর প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে কৃষক সভা "আজ গর্বের সহিত ঘোষণা করছে যে ভারতীয় কৃষকদের সামন্তবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে নিজেদের মুক্ত করার সংকল্প এবং সেজন্য তাদের প্রস্তুতি পূর্বেকার যেকোন সময়ের তুলনায় বেশি।"

"কৃষক সংগঠন জোরের সহিত ঘোষণা করছে যে সময় এসে গেছে যখন কংগ্রেস, দেশীয় রাজ্যের জনগণ, কৃষকরা, শ্রমিকরা, এবং সাধারণভাবে সংগঠনগুলি ও জনগণ সমেত দেশের সম্মিলিত শক্তিগুলির উচিত এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব বজায় রাখার এই যে গোলামীর সংবিধান তারই উপর আঘাত হানা, যাতে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা ও ভারতীয় জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করা যায় এবং তাই থেকে শেষ পর্যন্ত কৃষক-মজুর রাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"

সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের এই ধরনের রাজনীতিক চিন্তা অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলার কৃষক আন্দোলনের ও কর্মিদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। সংগঠিত এলাকাগুলিতে কৃষকদের মধ্যে সভার কর্মীরা ক্লাস করেও এই রাজনীতি প্রচার করতেন।

তৃতীয় সম্মেলন : নঘরিয়া

৪-৬ মে ১৯৩৯এ প্রাদেশিক সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হয় মালদহ জেলার নঘরিয়া গ্রামে। পূর্বে সিদ্ধান্ত ছিল সম্মেলন হবে ২৪ পরগনা জেলায়। সরকারি দমন ব্যবস্থার কারণে সেখানে সম্ভব না হওয়ায় মালদহ জেলায় সম্মেলন হবে স্থির হয়। এই সম্মেলনের সময় কৃষক সভার মেম্বর ছিল ৫০,০০০।

সম্মেলন উপলক্ষে প্রচারের জন্য সভার অন্যতর সংগঠন সম্পাদক সুজাত আলি মজুমদারকে কিছু দিনের জন্য মালদহ জেলায় পাঠানো হয়। সেই সময়ে ঐ অঞ্চলে চাঁচোল রাজের প্রজাদের উপর বাকি খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারি পীড়ন চলছিল। প্রজাদের মধ্যে বিক্ষোভ জমে উঠেছিল। সুজাত আলি ও জেলার কৃষক কর্মীরা এই বাকী খাজনা মকুব করার দাবি নিয়ে আন্দোলন করেন। প্রায় আট হাজার কৃষকের একটা বিরাট জাথা নিয়ে অভিযান করা হয় মালদহ শহরে। শহরের জনসংখ্যা তখন হাজার দশেক। স্বভাবতই এই বিপুল আকারের কৃষক অভিযান শহরের সমস্ত

লোকের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সরকারী কর্তৃপক্ষও দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়।

এই অবস্থায় পড়ে স্থানীয় জননেতারা এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও কলকাতায় টেলিগ্রাম করে বাকি খাজনা মাফের দাবি জানান চাঁচোল রাজের কর্তৃপক্ষের নিকট। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে চাঁচোল রাজ সেই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। সংবাদটা প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে শহরের ও গ্রামাঞ্চলের জনগণের মধ্যে যেমন স্বস্তি দেখা দেয় তেমনি বিপুল সাড়াও পড়ে যায়। কৃষক সভার নেতৃত্বে কৃষকদের এই বিজয় কৃষক সভাকে এই জেলায় প্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

এই ঘটনা ঘটেছিল নঘরিয়া সম্মেলনের ঠিক পূর্বে। তার সুবিধাও পেয়েছিল এই অঞ্চলের কৃষকরা। ফলে সম্মেলন উপলক্ষে যে দুদিন কৃষক সমাবেশ হল তাতে বিপুল সংখ্যায় কৃষকরা যোগ দিয়েছিল। দ্বিতীয় দিনের সমাবেশে আনুমানিক ৭৫ হাজারের জমায়েত হয়েছিল।

প্রতিনিধি সভায় নতুন সিদ্ধান্ত বিশেষ কিছুই গ্রহণ করা হয়নি। বড়া সম্মেলনের সিদ্ধান্তই মোটামুটি বহাল রাখা হয়েছিল। সম্পাদক মণ্ডলীর মধ্যেও কোন পরিবর্তন হয়নি।

সম্মেলনের পর সম্পাদক মণ্ডলী পরবর্তী বছরে আন্দোলন পরিচালনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করেন এবং সেখানেই বিভিন্ন জেলার কমরেডদের নিয়ে আলোচনা বৈঠক হয়। সেই আলোচনার ভিত্তিতে কমিটির মধ্যে আরো যে আলোচনা হয় তার ফলাফল প্রাদেশিক সভার ৮ই আগস্টের ৫নং ইশতেহারে জেলা সমিতিগুলিকে পাঠানো হয়।

এ পর্যন্ত সভার কাজ বিশেষভাবে চলেছিল প্রচার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। এখন সিদ্ধান্ত হল প্রচারের কাজকে আরো সংগঠিত করে সংগ্রামের পথে নিয়ে আসতে হবে। সেজন্য ইশতেহারে বিশেষভাবে জোর দিয়ে এই প্রয়োজনগুলির কথা বলা হল: আন্দোলনকে আর বেশি ব্যাপক করা অপেক্ষা গভীর ও সংগ্রামশীল করে তোলা; আন্দোলনের মধ্যে গরিব চাষী ও খেতমজুরদের আরো বেশি সংখ্যায় টেনে আনা; সংগঠনের কাজের জন্য সর্বত্র কৃষক ভলন্টিয়ার বাহিনী গঠন করা, তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে শ্রেণীসচেতন করে তোলা, এবং কৃষক বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদেরই আন্দোলনের কর্মীতে পরিণত করা; আর ইউনিয়ন বা প্রাথমিক সমিতিগুলিকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করে তোলা।

কৃষক-প্রজা সমিতি

এইখানে কৃষক-প্রজা সমিতি সম্পর্কে দু একটা কথা বলা দরকার। নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি বাংলাদেশের কৃষক ও রাইয়তদের সমিতি বলে পরিচিত ছিল। এই সমিতির কোন সংগ্রামী প্রোগ্রাম ছিল না, কোন উল্লেখ-যোগ্য সংগ্রামও এই সমিতি করেনি। তবে সাধারণভাবে রাইয়তদের দাবি নিয়ে প্রচার আন্দোলন করেছিল এবং স্থানীয়ভাবে তার কর্মীরা কিছু কৃষক দাবি নিয়ে আন্দোলন-আলোড়ন করেছিলেন, সমিতির নামে দরখাস্ত ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে তার প্রধান কাজ হয়েছিল ১৯৩৭ সনের নতুন বিধান সভার নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টির কাজ।

তাহলেও কৃষক-প্রজা সমিতির যখন কৃষকদের সঙ্গে যোগ ছিল এবং তার ঘোষিত নীতি ছিল কৃষক ও প্রজাদের স্বার্থের দিকে নজর রাখা, তখন কৃষক সমিতি তার সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এবং সম্ভব হলে মিলিত হয়ে কাজ করা দরকার মনে করে। কৃষক-প্রজা মন্ত্রীসভা গঠনের সময় ফজলুল হক তার মধ্যে ঢাকার নবাব হবিবুল্লাহ ও চকদিঘির জমিদার বিজয় প্রসাদ সিংহরায়কেও রাখেন। ফলে কৃষক-প্রজা সমিতি দু ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ ফজলুল হকের নেতৃত্বে থাকে মন্ত্রীত্ব-ঘেঁষা হয়ে, অন্যভাগ কতকটা "বামপন্থী" হয়ে পড়ে। এই "বামপন্থী" অংশের সঙ্গে কৃষক সভা আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতে চায়। কৃষক সভার নেতারা তখন কৃষক-প্রজা সমিতিকে কৃষক সভার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার কথাও চিন্তা করেন।

সেই উদ্দেশ্যে প্রাথমিক আলোচনার ফলে দুই সমিতির পক্ষ থেকে পাঁচ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। তাতে কৃষক সমিতির প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, বঙ্কিম মুখার্জি ও আবদুল্লাহ রসুল, এবং কৃষক-প্রজা সমিতির প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন জনাব আবুল মনসুর আহমদ ও নবাবজাদা হাসান আলি চৌধুরী।

কিন্তু কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে বারবার চেষ্টা করেও সমন্বয় কমিটিকে বসিয়ে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি ; যাঁর বাড়িতে বৈঠক হবার কথা তিনি ছাড়া কৃষক-প্রজা সমিতির অন্য কোন প্রতিনিধি বৈঠকে হাজির হননি। তখন শেষ পর্যন্ত সমন্বয় কমিটি কিছু করতে না পেরে কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

ক্যানাল কর আন্দোলন

১৯৩৯ সনের প্রথম দিকে বর্ধমান জেলায় ক্যানাল কর প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে।

দামোদর নদের জল এনে সেচের ব্যবস্থা করবার জন্য খাল বা ক্যানাল কাটার কজ শেষ হয় ১৯৩৪ সনে। এই ক্যানালের নাম ছিল দামোদর ক্যানাল। তার পূর্বে ১৯৩৩ সনের মে মাসে হাটগোবিন্দপুরে কৃষক কর্মীদের সভায় ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতি গঠিত হয়। তার সম্পাদক হেলারাম চট্টোপাধ্যায় ছাড়া দাশরথি চৌধুরী, অশ্বিনী মণ্ডল, বিপদ বারণ রায়, তারাপদ মোদক, জাহেদ আলি, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রভৃতি কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

সরকার ঘোষণা করে যে সেচের জন্য জল নিতে হলে কৃষকদের ক্যানাল কর দিতে হবে। করের হার ধার্য হয়েছিল এক বছরের মিয়াদে একরে সাড়ে চার টাকা এবং তিন বছরের (দীর্ঘ) মিয়াদে বছরে সাড়ে তিন টাকা। সেজন্য লীসবণ্ড সই করানো আরম্ভ হয়। কিন্তু কৃষক সমিতির নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে কৃষকরা এই চড়া হারে কর দিতে আপত্তি জানায় এবং বণ্ডে সই দিতে অস্বীকার করে। তখন সরকার কৃষকদের জল নিতে ও ট্যাক্স দিতে বাধ্য করবার জন্য ১৯৩৫ সনে উন্নয়ন আইন (বেঙ্গল ডেভেলপমেণ্ট অ্যাকট) পাশ করে। এই আইন অনুসারে ট্যাকস ধার্য হয় সর্বোচ্চ সাড়ে পাঁচ টাকা। কৃষকদের বিক্ষোভ তাতে আরো বেড়ে যায়। আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে ওঠে।

এই সময়ে ফসলের দর ছিল খুব কম। সেচের জলের জন্য কৃষকদের পক্ষে একরে সাড়ে পাঁচ টাকা হারে কর (অন্তত আড়াই মন ধানের দাম) দেওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন। তাই সরকারের আক্রমণ আসছে বুঝে ১৯৩৭-৩৮ সনে কৃষক সমিতি আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। উন্নয়ন কর আদায়ের জন্য গবরমেণ্ট ১৭ হাজার সার্টিফিকেট জারি করে। ক্যানাল এলাকার জমির মালিক ও কৃষকদের উপর ১৯৩৯ এর ফেব্রুয়ারি মাসে ট্যাক্স আদায় শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে কৃষকরা সরাসরি সংগ্রামের মধ্যে এসে যায়। আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকার বর্ধমান শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে।

বকেয়া ট্যাক্সের দায়ে সরকার মেমারি থানার কাদরা গ্রামের একজনের

গরু ক্রোক করে এনে আউসা গ্রামে পুলিস পাহারায় খোঁয়াড়ে ভরে। কৃষকরা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন এবং পাহারা দিতে থাকেন যাতে গরুগুলোকে বাইরে নিয়ে যাওয়া না হয়। এক হাজার কৃষক নারী ভলন্টিয়ার সত্যাগ্রহে যোগ দেন। গোর্খা ও গোরা পল্টন আনা হয় দু হাজার। তারা গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। মোট ৮৪ জন ভলন্টিয়ার ও কৃষক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় ও বিচারের পর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু তামাম এলাকায় ক্রোকী গরু নিলামে কেনবার লোক একজনও পাওয়া যায় না। শেষে গবরমেণ্ট নত হয় এবং করের হার কমিয়ে দু টাকা ন আনা (তখন এক মণ ধান ও এক পণ খড়ের দাম) ধার্য করে। কৃষক সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের এই বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনের কথা বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারিত হয়।

আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেলে কিছু কাল পরে আবার সুযোগ বুঝে গবরমেণ্ট ক্যানাল করের হার ধাপে ধাপে বাড়িয়েছিল তিন টাকা, চার টাকা ও সাড়ে পাঁচ টাকা পর্যন্ত (১৯৪৬)। তাই নিয়ে আবার আন্দোলন হয়েছিল ১৯৪৬-৪৭ সনে। সরকার আবার গরু ক্রোক করেছিল, এবার সারগাছি গ্রামে। এবার ক্রোকী গরু খোঁয়াড় থেকে খুলে নেওয়া হয়। তখন করুড়ি গ্রামে পুলিসের গুলি চলে (১২ই মার্চ ১৯৪৭)। তিনজন কৃষক আহত হন। তখন কংগ্রেসের উদ্যোগে একটা রফার মধ্যে দিয়ে ট্যাক্স ধার্য হয় চার টাকা। কৃষক সমিতি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার না করলেও কার্যত এই হার মেনে নেয় এবং রাইয়তরা ট্যাক্স দিয়ে দেয়। পরে ১৯৪৭ সনে দেশ স্বাধীন হলে কংগ্রেস সরকার গঠিত হবার পর কৃষক সমিতির সঙ্গে সরকারের একটা আপস হয় এবং করের হার ধার্য করা হয় চার টাকা।

আরো পরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডি. ভি. সি.) দামোদর ক্যানালকে অনেক বেশি বাড়িয়ে ফেলে এবং সেই সঙ্গে করের সর্বোচ্চ হার ধার্য করে খরিফ ফসলের জন্য সাড়ে ১২ টাকা আর রবি ফসলের জন্য ১৫ টাকা। সেজন্য ১৯৫৮ সনে আবার আন্দোলন হয়। কৃষকদের দাবি ছিল ক্যানাল ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একর প্রতি অনধিক সাড়ে পাঁচ টাকা কর ধার্য হ'ক। কিন্তু দশ টাকা ধার্য হয়ে আছে, বাড়াবারও চেষ্টা হচ্ছে। এই কর ছাড়া পাঁচ বছরের জন্য বার্ষিক আরো ৩০ টাকা হারে

উন্নয়ন লেভি ধার্য করার উদ্যোগে আইন সভায় বিল আনা হয়। কিন্তু আন্দোলনের চাপে সে বিল প্রত্যাহার করা হয়।

প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন

১৯৩৮ সনে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসে পড়ে কৃষক সভার সামনে। বিষয়টা ছিল বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন। ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা মন্ত্রীসভা এই আইনের একটি সংশোধনী বিল পাস করে ১৯৩৮এর এপ্রিল মাসে। তাতে জমিদার স্বার্থের পরিপন্থী কয়েকটি বিষয় প্রজা স্বার্থের অনুকূলে গ্রহণ করা হয়। (এর বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।) সেই কারণে ইংরেজ গবর্ণর বিলে তাঁর অনুমোদন দিয়ে তাকে পাকা আইনে পরিণত করতে বিলম্ব করছিলেন।

এই বিল প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের জন্য কৃষক সভার সব দাবি মেনে নেয়নি বটে কিন্তু রাইয়তদের পক্ষে কিছু সুবিধার ব্যবস্থা করেছিল। সেই কারণে প্রাদেশিক কৃষক কমিটি এ বিষয়ে কী করণীয় তা আলোচনার জন্য কর্মীদের এক সভা আহ্বান করে। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে এই বিলকে অবিলম্বে আইনে পরিণত করতে হবে, নইলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হবে—এই দাবির ভিত্তিতে ব্যাপক প্রচার চালানো দরকার। প্রচার-আন্দোলনের ফলে প্রাদেশিক সরকারের প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক এবং অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার প্রকাশ্য ভাবে আশ্বাস দেন যে দু মাসের মধ্যে এই বিল আইনে পরিণত হবে। আগস্ট মাসে তাই হয়েছিল।

কৃষকদের মধ্যে ১৮৫৯এর খাজনা আইন (দশ আইন) সত্ত্বেও যখন ব্যাপক কৃষক বিক্ষোভ বারে বারে প্রকাশ পেতে থাকে তখন পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ১৮৮৫ সনে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়।

এই আইনে ব্যবস্থা ছিল: রাইয়ত বা প্রজা দুই ধরনের—রাইয়ত এবং অধীন-রাইয়ত বা কোর্ফা প্রজা। রাইয়ত তিন রকম: (ক) যাদের জমি কায়েমী এবং খাজনার পরিমাণ কখনো বাড়বে না তারা রাইয়ত মোকররী; (খ) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট (অকুপ্যান্সি) রাইয়ত, যাদের সাধারণত স্থিতিবান রাইয়ত বলা হয়; এবং (গ) দখলীস্বত্ব-বিহীন (নন-অকুপ্যান্সি) রাইয়ত। অধীন-রাইয়ত বা কোর্ফা প্রজা (আণ্ডার-রাইয়ত) আবার দু রকম: দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট এবং দখলীস্বত্ব-বিহীন (বা শুধু) কোর্ফা প্রজা।

আইনে আরো বলা হয়: জমিতে যে সব প্রজার দখলীস্বত্ব নাই তারা

অনেকটা মালিকের ইচ্ছাধীন প্রজা। মালিক ইচ্ছা করলে তাদের জমি খাস করে নিয়ে উচ্ছেদ করে দিতে পারে। যাদের দখলীস্বত্ব আছে তারাই শুধু জমিতে কিছু কিছু ভোগদখলের অধিকার পায়। কোর্ফা প্রজার জমি হস্তান্তর করবার অধিকার নাই; সে মারা গেলে তার জমি তার ছেলে পাবে না, মালিকের খাস হয়ে যাবে। বাকী খাজনার সুদ লাগবে টাকায় দু আনা আর বাকী খাজনার জন্য নালিশ হলে টাকায় চার আনা হারে ড্যামেজ বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মালিক আবোয়াব আদায় করলে তাতে আইনে বাধা নাই। খাজনার হার পনর বছর অন্তর টাকায় আট আনা হারে বাড়ান চলবে। ভাগচাষী বা বর্গাদার প্রজা বলে গণ্য হবে না। বর্গা জমির মালিক তার জমির অর্ধেক ফসল নিতে পারবে।

১৯২৮-এর সংশোধন ও কংগ্রেস

১৯২৮ সনে প্রজাস্বত্ব আইনের যে সংশোধন হয়েছিল তাতে রাইয়তের সুবিধার চেয়ে অসুবিধা বেড়েছিল। তাতে ব্যবস্থা ছিল স্থিতিবান রাইয়তরা ইচ্ছামতো তাদের জমি বিক্রী বা দান করতে পারবে, নিজেদের জমা (হোল্ডিং) বন্দোবস্ত দিতে পারবে। কোর্ফা প্রজারা দান বা বিক্রী করতে পারবে না তবে জমা বন্দোবস্ত দিতে পারবে! কিন্তু জমি বিক্রীর ক্ষেত্রে বিক্রী দামের শতকরা কুড়ি টাকা মালিক বা জমিদারের ফিস বাবত রেজিষ্ট্রি আফিসে জমা না দিলে কোন দলিল রেজিষ্ট্রি হবে না।

এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রধানত জমিদারদের স্বার্থে। বাংলাদেশে জমিদার-তালুকদাররা এবং বড় জোতদাররা ছিল কংগ্রেসের সমর্থক ও বিশেষ প্রভাবশালী শক্তি। সেই কারণে আইন সভায় স্বরাজ পার্টি (কংগ্রেসের লেজিসলেটিব কাউন্সিল বা আইন সভার দল) এই সংশোধনী বিলকে সমর্থন করে এবং তার পক্ষে ভোট দেয়। কাউন্সিলের হিন্দু মেম্বরদের মধ্যে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেণ্টস পার্টির ডক্টর নরেশ সেনগুপ্তের মতো দু একজন মাত্র এই বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেন। তার ফলে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কংগ্রেসের মর্যাদা ও প্রভাব কমে যায়, বিশেষ করে মুসলিম কৃষকদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়।

বাংলাদেশে মুসলিম সম্প্রদায় ছিল মোট জনসংখ্যার মধ্যে মেজরিটি বা সংখ্যাগুরু। তার মধ্যে আবার কৃষক সমাজের অনুপাত হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় খুব বেশী। কাজেই মুসলমানদের মধ্যে কৃষক ও খাতকদের সংখ্যা হিন্দু

সম্প্রদায়ের তুলনায় খুব বেশি থাকায়, এবং অন্যদিকে জমিদার-মহাজনদের সংখ্যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের তুলনায় খুব বেশি থাকায় সাধারণ লোকের নিকট কৃষক-খাতকদের সঙ্গে জমিদার-মহাজনদের শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধকে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিরোধের আকারে তুলে ধরা ও তাদের বিভ্রান্ত করা সহজ ছিল। স্বার্থবান গোষ্ঠী ও সংবাদপত্রগুলি অনেক সময় করতও তাই। শ্রেণী বিরোধকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বলে প্রচার করে দেশের রাজনীতিক আবহাওয়া বিষাক্ত করে তুলত। কংগ্রেসকে যে অনেক মুসলমান ও কোন কোন সংবাদপত্র হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলত, কংগ্রেসের এই বিলের সমর্থন ও তার পিছনের শ্রেণী চিন্তা তার একটা কারণ।*

শ্রেণী স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িকতা

প্রসংগত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলাদেশে, বিশেষত মুসলিম-প্রধান পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে কৃষির কাজ করত প্রধানত মুসলমান ও তপশীলী হিন্দু কৃষকরা, বর্ণ হিন্দু তাদের মধ্যে খুব কম ছিল। সাম্প্রদায়িক অনুপাত বিচার করলে যেমন হিন্দুদের মধ্যে শোষকের ও মুসলমানদের মধ্যে শোষিতের অংশ খুব বেশি ছিল, তেমনি বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে শোষকের ও তপশীলী হিন্দুদের মধ্যে শোষিতের অংশও ছিল খুব বেশি, হিন্দু-মুসলিম অনুপাতের চেয়েও বেশি। বর্ণ হিন্দু ও তপশীলী হিন্দুদের মধ্যেকার এই শ্রেণীগত পার্থক্য ছিল একটা কারণ যেজন্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার ও আন্দোলন চালাবার সময় মুসলিম লীগ তপশীলী হিন্দুদের সঙ্গে ঐক্যের আবেদন জানাত, তাদের অনেক দাবী দাওয়ার এবং তাদের সংগঠনের প্রতি সহানুভূতিও প্রকাশ করত। লীগের এই আবেদন ও সহানুভূতি প্রকাশ একেবারে নিষ্ফল যায়নি।

---

* "রায়তদের স্বত্বের দাবির কথা কানে ঢোকবামাত্র চমকে ওঠেন এমন লোকের এদেশে অভাব নেই। যে প্রজার অধিকারের কথা তোলে, কারো মতে সে 'বলশেভিক', কারো মতে সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শত্রু, আবার কারো মতে বা সে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের মারামারি-কাটাকাটির পক্ষপাতী।" (পৃ: ১৫) "আশা করি এ প্রবন্ধ পড়ে কেউ মনে করবেন না যে আমি সাম্প্রদায়িক বিবাদের সূত্রপাত করছি। সাম্প্রদায়িক বিরোধ হতে বাঙালী সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রায়তের সঙ্গে জমিদারের কো-অপারেশন এর প্রয়োজন আছে, বিশেষত যখন বাংলার বেশির ভাগ জমিদার হিন্দু, আর বেশির ভাগ রায়ত মুসলমান। এই হচ্ছে প্রবন্ধের সার কথা।" (পৃ ৪২, প্রমথ চৌধুরী, রায়তের কথা, ১৩৫৪।)

প্রজাদের সুবিধা বৃদ্ধি

১৯৩৮ সনে ফজলুল হক মন্ত্রীসভা প্রজাস্বত্ব আইনের যে সংশোধন আইন পাস করে তাতে এই সুবিধাগুলি পাওয়া গিয়েছিল : দখলী স্বত্ববান রায়ত ও কোর্ফা প্রজা সকলকেই দান-বিক্রয় ও হস্তান্তরের অধিকার দেওয়া হল এবং মালিক ফিস (খারিজ বা নাম খারিজ ফিস) তুলে দেওয়া হল। প্রজার অনুকূলে উচ্ছেদের কড়াকড়ি লাঘব করা হল। খাইখালাসী বন্ধক সম্বন্ধে চুক্তি যেমনই হয়ে থাকুক না কেন, পনর বছরে তার দেনা শোধ ও মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে বলে ব্যবস্থা হল। বাকি খাজনার দায়ে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম বিক্রি করার এবং প্রজাকে গ্রেপ্তার করে জেলে দেবার ব্যবস্থা রহিত হল। আবোয়াব বা বাজে আদায়ী নেওয়াকে ফৌজদারী অপরাধ বলে গণ্য করা হল। সুদের হার টাকায় দু আনা থেকে কমিয়ে এক আনা করা হল। হকশোফা অধিকার জমিদারের হাত থেকে সরিয়ে শরিককে দেওয়া হল। খাজনা বৃদ্ধির যাবতীয় অধিকার দশ বছরের জন্য স্থগিত রাখা হল। পরে ১৯৪০ সনের সংশোধনী আইনে ব্যবস্থা করা হল এই যে প্রতি পনর বছরে মাত্র একবার খাজনা বৃদ্ধি করা চলবে এবং তাও এক সময়ে টাকায় দু আনার বেশি বাড়ানো যাবে না।

কৃষক-প্রজা মন্ত্রীসভা প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন যেভাবে করেছিল তাতে অবশ্যই রায়তদের অনেকটা সুবিধা হয়েছিল। কিন্তু খেতমজুর, ভাগচাষী ও উঠবন্দী প্রজাদের পক্ষে কোন সুবিধা এর দ্বারা হয়নি। কৃষক সভার দাবি ছিল তাদের জন্যও যেন অন্তত কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা হয়।

ভূমি-রাজস্ব কমিশন

প্রজাস্বত্ব আইনের এই সংশোধনের পর ১৯৩৮ সনের ৫ই নবেম্বর ফজলুল হক মন্ত্রীসভা বাংলার ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করে তার সংস্কারের সুপারিশ করবার জন্য একটি ভূমি রাজস্ব কমিশন নিয়োগ করে। এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন বিলাতের স্যর ফ্রান্সিস ফ্লাউড। সেই কারণে এই কমিশনকে ফ্লাউড কমিশনও বলা হয়। কমিশন দু খণ্ডে তার রিপোর্ট দাখিল করে ২১ মার্চ ১৯৪০ তারিখে। (এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।)

ফ্লাউড কমিশন নিযুক্ত হবার পর প্রাদেশিক কৃষক কমিটি এবং সমস্ত জেলা ও অন্যান্য কৃষক কমিটিগুলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার

বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালায়। কৃষক কমিটি অনেক আলোচনার পর একটি মেমোর‍্যাণ্ডাম বা স্মারক রচনা করে কমিশনের নিকট পেশ করে। তাছাড়া কমিশনের আহ্বানে কমিটির প্রতিনিধিরা তাঁদের মৌখিক বক্তব্যও বলেন।

কৃষক সভার মেমোরেণ্ডামে অন্যান্য কথার মধ্যে বলা হয়: "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের অব্যাহত অধিকার দিয়েছে এবং তার ফলে এই ব্যবস্থা আবার তার নিদারুণ চাপের দরুন একটি একচেটিয়া অধিকার ও নির্যাতনের ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।...উৎপীড়িত কৃষক মনে করে এই ব্যবস্থাই তার নানা রকম দালাল, জমিদার, মহাজন ও পুলিস মারফৎ তাকে জমি থেকে উৎখাত করবার জন্য সদাই সচেষ্ট রয়েছে। এই সব অবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ করার দাবি বিভ্রান্ত চিন্তার ফল নয়, বরং এই দাবি এসেছে এই গভীর অনুভূতি থেকে যে বর্তমান ভূমি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা মামুলি সংশোধনের দ্বারা অসম্ভব।

হাট তোলা আন্দোলন

১৯৩৯এর শেষভাগে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। তোলাগণ্ডি আন্দোলন শুরু হয় জলপাইগুড়ি জেলায় এবং পরে তা রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। আরো পরে এই আন্দোলন চলে মালদহ, ময়মনসিং, যশোহর, ২৪ পরগনা ও অন্যান্য জেলায়।

হাটের ও মেলার জমিদার বা ইজারাদাররা ব্যাপারীদের নিকট থেকে অত্যধিক হারে তোলা আদায় করত। সামান্য তরিতরকারি থেকে আরম্ভ করে কাপড়চোপড় ও গরু মহিষ পর্যন্ত সব কিছু বিক্রীর জন্য প্রতি হাটে তাদের এই খাজনা দিতে হত। তরিতরকারি ইত্যাদি কাঁচা জিনিসের বিক্রেতাদের নিকট থেকে তারা খুশীমতো পরিমাণে তাদের জিনিস জোর করে আদায় করত, আর অন্যান্য জিনিসের জন্য নানাভাবে নগদ টাকা পয়সা নিত। জিনিসের পরিমাণ সব সময় ধার্য থাকত না, মালিক বা ইজারাদারের লোক ইচ্ছামতো নিজ হাতে তুলে নিত, সেজন্য বিক্রেতার অনুমতিরও অপেক্ষা করত না। নগদ খাজনার ব্যাপারে মোটামুটি একটা হার ধার্য থাকত, তবে তা বেশ চড়াই হত। আর জিনিসে যে তোলা আদায় করা হত তা একা জমিদার বা ইজারাদারই নিত না, তাদের আদায়কারী পেয়াদা-পাইকরাও নিজেদের জন্য একটা পরিমাণ নিয়ে নিত।

জলপাইগুড়ি জেলায় কৃষক সভার প্রথম জেলা সম্মেলন হয় ঐ বছরের (১৯৩৯) জুলাই মাসে ময়দানদিঘি গ্রামে। সেখানে নিয়মিত জেলা কৃষক কমিটি গঠিত হয়। কমিটি লক্ষ্য করে এই তোলাগণ্ডির বা তোলাবটির চাপের বিরুদ্ধে কৃষকদের মধ্যে, এবং যারাই কিছু বিক্রী করতে হাটে আসে তাদেরই মধ্যে রীতিমতো বিক্ষোভ রয়েছে। তখন তোলাগণ্ডির হার কমানোর জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়।

বিভিন্ন জেলায় এই হাটতোলা আন্দোলন কমবেশি সাফল্য লাভ করেছিল। ২৪ পরগনার ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলে আন্দোলন এমন পর্যায়ে এসে গিয়েছিল যে এ বিষয়ে স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। তখন কৃষকদের পক্ষে সুবিধাজনক শর্তে সরকারী মধ্যস্থতায় একটা আপস হয়ে যায়।

১৯৩৯এর সেপ্টেম্বরে ইয়োরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর ভারত সরকার ভারত রক্ষা আইন জারি করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সরকারও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার খর্ব করে এক অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইন জারি করে। এই আইনের প্রথম আঘাত আসে কৃষক সভার আন্দোলনের ও কর্মীদের উপর। কিন্তু সেপ্টেম্বর থেকে নবেম্বর পর্যন্ত তিন মাস এই আইনের আঘাত জলপাইগুড়ির কমরেডদের উপর বিশেষ পড়েনি বলে সেখানে তোলা-গণ্ডির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানো অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। আন্দোলনের ফলে কৃষকরা কিছু লাভবান হয়েছিল।

মেলার আন্দোলনে জয়লাভ

জলপাইগুড়ির সঙ্গে সঙ্গে হাটতোলা কমাবার আন্দোলন রংপুর ও দিনাজ-পুরেও আরম্ভ হয় এবং অনেক পরিমাণে সফল হয়। দিনাজপুর জেলায় বিহার সীমান্তের নিকটে দুটো বড় মেলা বসত—দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমায় (বর্তমানে পাকিস্তানে) আলোয়াখোয়ার মেলা, অন্যটি কালীর মেলা, সীমান্তের ওপারে বিহারে। মেলা দুটিতে এই দুই প্রদেশের সীমানা থেকে দূর দূর এলাকা থেকেও ক্রেতা ও বিক্রেতারা জমায়েত হত। অসংখ্য গরু মহিষের কারবার হত এখানে। গরু মহিষ বিক্রির জন্য মেলার মালিক জমিদাররা, এই পশুগুলি যে তাদের মেলায় কেনাবেচা হয়েছে, এইটুকু লিখে দেবার জন্য তাদের লোক নিযুক্ত করত। তারা কেবল এই লেখাই বাবদ গরু পিছু দু টাকা ও মোষ পিছু চার টাকা আদায় করত।

এত অধিক হারে লেখাই খরচ আদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ ছিল। জেলা কৃষক কমিটি তাই লেখাই খরচের হার কমিয়ে দেবার দাবিতে প্রচার চালায় এবং তার সমর্থনে মেলার পূর্বেই একটা জনমত তৈরি করে ফেলে। মেলার সময় সেই দাবি যখন সেখানে তোলা হয় তখন তা ব্যাপারীদের নিকট বিপুল সমর্থন লাভ করে।

কিন্তু জমিদাররা দেখে ব্যাপারীদের দাবি মেনে নিলে তাদের হাজার হাজার টাকা আয় কমে যাবে, জমিদারীর একটা প্রধান আয় থেকে তারা বঞ্চিত হবে। তখন দুই পক্ষের বিরোধ পেকে ওঠে, কৃষক সমিতির নেতৃত্বে সমস্ত ব্যাপারী ও কৃষকরা এই দাবির পিছনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। সংগ্রাম এমন পর্যায়ে গিয়ে পড়ে যে জমিদাররা দাবি না মানলে সমিতি মেলার ক্ষেত্র নিকটবর্তী একটা জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক করে। তাহলে কৃষক সমিতির ভলন্টিয়াররা সমিতির নামে লেখাইয়ের কাজ করবে আর তাতে জমিদার এক পয়সাও পাবে না। কালীর মেলায় জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর জেলার প্রায় এক হাজার কৃষক ভলন্টিয়ার কাজে নিযুক্ত থাকে।

এই প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে জমিদারের লোকজন রাজি হয় যে তারা লেখাই খরচ বাবত দু টাকা ও চার টাকার পরিবর্তে দু আনা ও চার আনা মাত্র পাবে।

আধিয়ার আন্দোলন

এই আন্দোলনের সাফল্যের প্রভাব কৃষকদের উপর এমন গভীর ছাপ রেখেছিল যে তারপর ধান কাটার সময় তারা নিজেদের অন্যান্য দাবির আন্দোলনের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন এক বিরাট সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়।

উত্তর বঙ্গের এই তিনটি জেলায় বহু সংখ্যক রাজবংশী ক্ষত্রিয় কৃষকের বাস। তারা তপশীলভুক্ত বাঙ্গালী বলে গণ্য। তবে তাদের সামাজিক জীবনে ও আচার ব্যবহারে কিছু কিছু ভিন্ন ধরনের প্রাচীন ছাপ দেখা যায়। এই সব অঞ্চলে বাঙ্গালী জমির মালিকরা সেখানকার খুব পুরনো বাসিন্দা নয়, সাধারণত তারা অন্যান্য জেলা থেকে এসে বাস করতে আরম্ভ করেছে অপেক্ষাকৃত অল্প কাল পূর্বে। তাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা এক একজন বিপুল পরিমাণ জমির মালিক এবং সে জমি তারা নিজেরা চাষ না করে রাজবংশী, সাঁওতাল ও মুসলমান গরিব কৃষকদের আধিয়ার বা বর্গাদার

হিসাবে চাষ করতে দেয়। আধিয়ারদের উপর এই সমস্ত বড় বড় জমির মালিক বা জোতদাররা নানা কৌশলে অমানুষিক শোষণ চালায়। এই উৎকট শ্রেণী শোষণের ফলে জোতদার-আধিয়ার শ্রেণী-বিরোধের চেতনা আধিয়ারদের মধ্যে তীব্র হতে থাকে।

সেই কারণে জোতদারদের প্রতি আধিয়াররা অত্যন্ত বিরূপ ছিল এবং সে বিরূপ ভাব চেনা-অচেনা সমস্ত "ভদ্রলোকদের" প্রতিই ছিল। তাদের তারা বিশ্বাস করত না। ১৯৩৯-এর শেষ দিকে মেলার ও ধান কাটার কিছুদিন পূর্বে আমি ঐ এলাকায় গিয়ে আধিয়ারদের দাবি ও আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ করে বুঝেছিলাম তাদের দাবির বিষয় বললে তারা আমাদের কথায় সায় দিয়ে যায় বটে, কিন্তু অন্তরের সহিত আমাদের কথা মেনে নেয় না। আন্দোলনের প্রস্তাবে তখন তাদের কার্যকর সাড়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু মেলার আন্দোলন সফল হবার পরই দেখা গেল তাদের চিন্তা ও চেতনার মোড় ঘুরে গেছে। চাষের মরসুমে জোতদাররা তাদের যে ধান কর্জ দিত তার উপর অতিরিক্ত হারে সুদ আদায় করত—মণে আধমণ হিসাবে, অর্থাৎ দেড়া বাড়িতে। আধিয়াররা এই সুদের হার কমাতে চায়।

আধিয়াররা ধান কেটে জোতদারের খোলানে (খামারে) তুললে দেখা যেত আধিয়াররা তাদের পাওনা অংশ (ফসলের অর্ধাংশ) ঠিকভাবে পায় না, জোতদাররা নানা বাজে অজুহাতে—মহলদারি, বরকন্দাজি, গোলাপূজা, জোতদার বাড়ির হাঁস মুরগীর খোরাক ও থিয়েটার-যাত্রার খরচ বাবত। তার অনেকটা অংশ অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয়। তাই আধিয়াররা চায় নিজেদের খোলানে ধান তুলে জোতদারকে তার পাওনা দিতে। সেই সঙ্গে কৃষকদের আরো দাবি ছিল: কর্জা ধানের সিকি সুদ ও বীজ ধানের সুদ নাই। কিন্তু জোতদাররা তাতে রাজি নয়। ফলে এই নিয়ে জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর জেলায় আধিয়ার-জোতদার সংঘর্ষ বাধে। তখন নিয়ম মাফিক জোতদারদের সাহায্যে এসে হাজির হয় সরকারী পুলিস, ভারত রক্ষা আইন প্রভৃতি। ব্যাপকভাবে ধরপাকড় হতে থাকে, পুলিসের মারপিট চলে, নেতাদের আন্দোলন থেকে আইনের জোরে সরিয়ে দেওয়া হয়, আধিয়ারের খামারে তোলা ধান জোর করে জোতদারের খামারে নেবার চেষ্টা হয়।

তিন পক্ষের চুক্তি

পুলিসী পীড়ন জলপাইগুড়িতে অতিমাত্রায় দেখা দেয়। তার ফলে

সেখানকার আন্দোলন তখনকার মতো থেমে যায়। কিন্তু দিনাজপুরের কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগে এবং তারা জোতদার ও পুলিসের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। কৃষকদের সংগঠিত শক্তি দেখে সরকারী কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। সরকারী চেষ্টায় উভয় পক্ষে একটা সমঝোতা হয়ে যায়। দশ হাজার লাঠিধারী নারী পুরুষ কৃষকের জনসভায় কৃষক সভার লাল পতাকার নিচে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষণা করেন যে আধিয়ার ও জোতদার পক্ষের মনোনীত প্রতিনিধি ও স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করে ভবিষ্যৎ বিরোধ মীমাংসার ভার দেওয়া হবে এবং আধিয়ার ও জোতদারের মত অনুসারে ধান কোন মাঝামাঝি জায়গায় খামারে তোলা হবে (পাঁজিয়া সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট, ১৯৪০)। পরবর্তীকালের পঞ্চায়েত খামারের দাবি এই সিদ্ধান্ত থেকেই এসেছিল।

এই সাফল্য দিনাজপুরের কৃষকদের এবং বিশেষ করে আধিয়ারদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি করে। কৃষক সমিতি তাদের একান্ত আপন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। কৃষক সভার হাজার হাজার মেম্বর—নারী পুরুষ সকলেই—কৃষক বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক হয়ে পড়ে এবং লাল ঝাণ্ডা ও লাঠি নিয়ে ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে থাকে। পারস্পরিক অভিবাদনের সময় তারা বলে কমরেড, ইনকিলাব! এই অভিবাদন বাণী আজও চলছে। (পাঁজিয়া রিপোর্ট)

পরে আবার পুলিসী অত্যাচারের মাত্রা এত বেড়ে যায় যে এই শক্তিশালী আন্দোলনকেও সাময়িকভাবে পিছু হঠতে হয়। (শিক্ষা কোর্স ১৯৪৩)।

চার

১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বরে ইয়োরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বড়লাট ভারত রক্ষা অর্ডিন্যান্স জারি করে আমাদের দেশকেও এই যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেন ৷৷ বাংলার গবর্নরও এক অর্ডিন্যান্স জারি করে নানাভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করেন। তাতে শ্রমিক ও কৃষকদের সভা ডাকবার জন্যও সরকারী অনুমতির প্রয়োজন হয়। কৃষক আন্দোলনের কাজ তাতে বিশেষভাবে বাধা পেতে থাকে।

যুদ্ধের পরিপেক্ষিতে এই পরিস্থিতির মধ্যে আন্দোলন ও সংগঠনের কাজ চালাবার জন্য অবস্থা ব্যাখ্যা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার জন্য প্রাদেশিক কৃষক কমিটির ২৬।২৭ নবেম্বর ১৯৩৯এর সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সম্পাদক মণ্ডলী একখানি ইশতেহার ছাপিয়ে প্রচার করে। অর্থাভাবে মাত্র দশ হাজার কপি ছাপানো হয় এবং ২০ পৃষ্ঠার পুস্তিকা মাত্র এক পয়সা দামে বিক্রী করা হয়।

এই ইস্তেহারে কৃষক জীবনের বিভিন্ন অবস্থা আলোচনা করে তাদের অভাব অভিযোগ দূর করবার জন্য পথ বাতলে দেওয়া হয়েছিল। পথ অবশ্য সংগঠিত আন্দোলন ও সংগ্রামের পথ। এর মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে খাজনার হার অর্ধেক কমানো, নদীনালা সংস্কার করা, পাটের নিম্নতম দর যুদ্ধের সময় মণ প্রতি ২০ টাকা ও অন্য সময়ে ১০ টাকা ধার্য করা, ধানের নিম্নতম দর ধার্য করা, খেতমজুরদের নিম্নতম মজুরীর হার বেঁধে দেওয়া, ভাগচাষীদের জন্য জমিতে দখলীস্বত্ব দেওয়া ও ফসলের কমপক্ষে দশ আনা ভাগের অধিকার স্বীকার করা, জমিদারদের আবোয়াব আদায় বেআইনী করা, ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সাব্যস্ত করা, ইত্যাদি বিভিন্ন দাবির বিষয়।

আরো বলা হয়েছে যে কৃষক নেতাদের শুধু কৃষকদের অর্থনীতিক দাবি-দাওয়ার কথা বুঝলেই চলবে না, দেশের রাজনীতিক অবস্থাও বুঝতে হবে, এবং রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকলে কৃষকদের সর্বনাশ হবে। কল-কার-

খানার মজুরদের সঙ্গে কৃষকদের সম্বন্ধ রাখতে হবে, পাট চাষী ও চটকল মজুরদের মধ্যে একটা বিশেষ যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ নিয়ে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সৃষ্টি করা হয় তার থেকে বাঁচবার ও তাকে রোখবার জন্য কৃষকদের অসাম্প্রদায়িক শ্রেণী স্বার্থের দৃষ্টি নিয়ে কাজ করতে হবে।

সংগঠন সম্বন্ধে ইস্তেহারে বলা হয়েছে যে কৃষকদের ভিতর থেকেই কৃষকদের আন্দোলন ও সংগ্রামের নেতা গড়ে তুলতে হবে এবং প্রাথমিক বা ইউনিয়ন কৃষক সমিতিগুলিকে সজীব ও সক্রিয় সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার উপর খুব বেশি নজর দিতে হবে।

জেলাগুলিতে এই ইস্তেহার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয়েছিল এবং তার সুফলও পাওয়া গিয়েছিল; পুলিসী হামলা সত্ত্বেও কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন পূর্বের চেয়ে জোরদার হয়েছিল।

পালটা সংগঠনের ব্যর্থ চেষ্টা

১৯৩৯ সনে কিছু লোক কোথাও কোথাও দু একটি প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষক প্রতিষ্ঠান গড়বার চেষ্টা করেছিল কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তার অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেয়ে যায়। ১৯৪০এর এপ্রিল মাসে হাওড়া জেলা কৃষক সম্মেলনকে পণ্ড করবার জন্য কিছু কৃষক সভা-বিরোধী রাজনীতিক কর্মী উৎপাত সৃষ্টি করেছিল কিন্তু তাদের এই অপচেষ্টা প্রতিহত করা হয়। পরে মে মাসে ঢাকা জেলায় "কৃষক সম্মেলন" নামে একটি সভা হয়। তার সঙ্গে কৃষকদের বিশেষ যোগ ছিল না। কিন্তু যোগ ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক কমিটির অন্যতম প্রাক্তন নেতা নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের; এই "সম্মেলনে" যে সংগঠনী সমিতি তোয়ের করা হয়, তাঁকে তার সংগঠক নিযুক্ত করা হয়েছিল।

দত্ত মজুমদার প্রথম থেকে প্রাদেশিক কৃষক সভার একজন নেতা বলে গণ্য হতেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতেও ছিলেন। কিন্তু পার্টির বিরোধিতা করায় তাকে ১৯৩৯ সনে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। তখন তিনি কৃষক সভা থেকে সরে যান। ১৯৪০ সনে সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের (পলাসা) পূর্বে সে বছরের জন্য সভার প্রাথমিক মেম্বরও হননি। সেজন্য তিনি আগের বছরে কেন্দ্রীয় কিসান কাউন্সিলের মেম্বর থাকলেও সেবার সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হতেও পারেননি। পরে এই ভুলের সংশোধন করে প্রাথমিক মেম্বর হবার ফলে প্রাদেশিক কৃষক

কমিটির মেম্বর নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাসত্ত্বেও তখন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষক সংগঠনের দিকে ঝুঁকলেন। তার পরিণতি হল এই যে তিনি কৃষক আন্দোলন থেকেই চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

মুসলিম লীগও মুসলমান কৃষকদের মধ্যে কৃষক সভা সম্বন্ধে বিভ্রান্তি প্রচার করে সভার কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাতে সভার বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি। কৃষক সভার কর্মীদের বোঝানো হয়েছিল এবং তাঁরা বিশেষ করে মুসলিম কৃষকদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে তাদের মুক্ত থাকার একমাত্র নিশ্চিত উপায় হচ্ছে কৃষকদের শ্রেণী স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং শ্রেণী সংগ্রামে যোগদান করা।

সোশ্যালিস্ট কর্মীদের বিচ্ছিন্নতা

এখানে আর একটা বিষয়ে কিছু বলা দরকার। ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ ঘোষণার পর বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে দেশের রাজনীতির মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছিল, তার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির (সি. এস. পি.) মধ্যে সুস্পষ্ট মতভেদ দেখা দেয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে অবান্তর। প্রাসংগিক বিষয় শুধু এই যে সি. এস. পি. অন্তত বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ করে ফেলে।

সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্মীরা এখানকার সক্রিয় কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ কোন দিনই রাখেননি; তাঁদের যোগাযোগ অনেকটা পোশাকী ব্যাপারের মতো ছিল। বিহার বা যুক্ত প্রদেশে বরং কৃষক সভার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ অনেক বেশি ছিল। কিন্তু সেখানেও সারা ভারত কৃষক সভার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে কৃষকদের শ্রেণী বিপ্লবের নজরে তাকে দেখেছিলেন কি না সন্দেহ। যাই হ'ক, যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে দেখা গেল তাঁরা বাংলার কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের মধ্যে থাকলেও অনেকটা আনুষ্ঠানিক-ভাবেই ছিলেন। কার্যত আন্দোলনের দায়িত্ব তখন ষোলআনাই এসে গেল কমিউনিস্ট পার্টির বা তার দ্বারা প্রভাবিত কর্মীদের উপর।

অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে যাঁদের কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে এক যোগে কাজ করতে বাধা বা আপত্তি ছিল না তাঁরা আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সৈয়দ নওশের আলী, মৌলবী আবুল হায়াত। নওশের আলী সাহেব পূর্বে যশোহর জেলায় এবং বিশেষ

করে নড়াইল মহকুমায় যে হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৯ সনে অনেকগুলি জেলায় কৃষক সম্মেলনগুলি ভালোভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং মুজফ্ফর আহ্মদ, বঙ্কিম মুখার্জি ও আবদুল্লাহ রসুলের মতো আবুল হায়াত সাহেবও কয়েকটি জেলা সম্মেলনে সাভপতিত্ব করেছিলেন এবং নেতৃত্বের কাজে সাহায্য করেছিলেন। তাছাড়া অনেক বছর বর্ধমান জেলার কৃষক সমিতির সভাপতি ছিলেন। এ জেলার আন্দোলনের সঙ্গে তিনি বার্ধক্যের কারণে সক্রিয়ভাবে যোগ না রাখলেও মৃত্যুকাল (মার্চ ১৯৬৮) পর্যন্ত তার প্রতি সমর্থন প্রকাশ করতেন।

জমিদারী উচ্ছেদ অভিযান

বাংলা সরকার ভূমি রাজস্ব কমিশন নিয়োগ করবার পর কৃষক সমিতিগুলি জেলায় জেলায় প্রচার করতে থাকে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত খতম করে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করতে হবে। সেই সঙ্গে মহাজনী ঋণ মকুবের ও খাজনার হার অর্ধেক কমাবার দাবিও প্রচার করে। দাবিগুলোর কোনটাই অবশ্য নতুন ছিল না। লাঙ্গল যার জমি তার—এই স্লোগানের দ্বারা কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করার দাবিও অবশ্য ছিল।

ভূমি রাজস্ব কমিশনের বিবেচ্য বিষয় ছিল বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথা। এই ব্যবস্থা প্রায় দেড় শ বছর ধরে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল বাংলাদেশের সামাজিক জীবন ও তার বিকাশকে। তাই সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা প্রায়োজন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাচীন ও প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করে কৃষকের হাত থেকে জমির মালিকানা কেড়ে নিয়ে নতুন এক জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করে তার হাতে তুলে দিয়েছিল।* জমিদাররা সমস্ত

*"তিনি [লর্ড কর্ণওয়ালিস] এক ঘায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসলেন। ফলে বাংলার প্রজা বাংলার জমির উপর তার চিরকেলে স্বত্বস্বামিত্ব সব হারালে, আর রাতারাতি বাংলার জমির নিব্যূঢ় স্বত্বাধিকারী জমিদার নামক এক শ্রেণীর লোক জন্মলাভ করলে।" (প্রমথ চৌধুরী, "রায়তের কথা," ১৩৫৪, পৃ ৩১।) "১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দশসালা বন্দোবস্ত করা হল। এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তন। অর্থাৎ যে বৎসর ফ্রান্সের প্রজার peasant proprietorship-এর সূত্রপাত হল, সেই বৎসরই বাংলার প্রজা জমির উপর তার সকল স্বত্ব হারাতে বসল।" (ঐ, পৃ ২৯) "জন কোম্পানী কিন্তু এদেশের জমিদার-রায়তের মিশ্র সম্বন্ধকে শুদ্ধ করলেন এই সম্বন্ধকে উল্টে ফেলে ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে জমিদার হলেন বাংলার মাটির স্বত্বাধিকারী, আর প্রজা হল তার উপস্বত্বে আংশিক অধিকারী।" (ঐ, পৃ ৩৮)

মাটি ও জলের, বহতা নদীরও মালিক হয়েছিল। তারা সরকারকে চির-কালের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব দিয়ে নিজেদের ভূসম্পত্তির আয় ও প্রজার জমির খাজনার হার ইচ্ছামতো বাড়াবার অধিকার লাভ করেছিল।† অনাবাদী পতিত জমি বন্দোবস্ত দেবার, কৃষকদের জমির ফসল ক্রোক করবার, এবং কৃষকদের উচ্ছেদ করে তাদের জমি খাস করে নেবার অধিকারও পেয়েছিল। এইভাবে রাইয়ত ও কৃষকদের এত বেশি করে জমিদারদের দয়ার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যে তাদের অবাধ শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাইয়তদের বিক্ষোভকে দমন করবার জন্য সরকারকে কঠোর আইন করে জমিদারদের রক্ষা করতে হয়েছিল। জমিদাররা নির্দিষ্ট তারিখে ও সময়ে রাজস্বের টাকা জমা দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত থাকত, নিজেদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে পারত।

অতি-শোষণের ফল কৃষক-নিধন

এই খাজনাখোর জমিদাররা একটা অলস ও নিষ্কর্মা এবং উদ্যমহীন ও উদ্যোগহীন অভিজাত পরগাছা শ্রেণীতে পরিণত হল। জমি থেকে আয় বৃদ্ধি করবার অবাধ সুযোগ থাকায় এই জমিদাররা তাদের অধস্তন জমিদার হিসাবে পত্তনিদার, তালুকদার প্রভৃতিকে মধ্যস্বত্বের বন্দোবস্ত দিয়ে নিজেদের মতো খাজনাখোর ও উদ্যমহীন নিষ্কর্মা শোষকের দল বাড়াতে লাগল। তারাও আবার একইভাবে আরো অধস্তন মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করতে লাগল। এইভাবে জমিদার ও খোদ-কৃষকের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে ১০, ১৫, ২০টি (বরিশাল জেলায় ৫২টি পর্যন্ত) মধ্যস্বত্বভোগী স্তর গড়ে উঠল।*

কৃষকরা নিজেদের মেহনতের দ্বারা জমি থেকে যে সম্পদ উৎপাদন করে, এই সমস্ত স্তরের মধ্যস্বত্বভোগীরা প্রত্যেকেই তাই থেকে কিছু-না-কিছু মুনাফা বার করে নেয়। আর সে সমস্ত মুনাফার মিলিত চাপ শেষ পর্যন্ত উৎপাদক কৃষকদের উপর পড়ে তাকে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে পঙ্গু করে ফেলে। তাকে ক্রমাগত তার প্রয়োজনীয় শ্রম কেটে উদ্বৃত্ত শ্রমের পরিমাণ বাড়াতে হয়।

---

† "রাজা টোডরমলের সময় বাংলার প্রজার আসল জমা স্থির হয়। এ জমাকে ল্যাণ্ড ট্যাক্স বলা যেতে পারে। এ জমা বৃদ্ধি কোন নবাব করেননি।" (ঐ, পৃ ২৭)।

* "আমি জানি, জমিদার জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোন যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "রায়তের কথার" ভূমিকা, পৃ ১০।)

খাজনাখোর মধ্যস্বত্বভোগীরা অনেকেই অধস্তন স্তরের সঙ্গে বন্দোবস্তের ফলে নিশ্চিন্ত আয়ের ব্যবস্থা করে শহরে বাস করতে চলে যায়। তাদের গ্রামের সম্পদ থেকে উৎপন্ন এই মুনাফার টাকা গ্রাম থেকে চলে যায় শহরে—গ্রামের অর্থ ব্যবস্থাকে বঞ্চিত করে, তার দারিদ্র্য বাড়িয়ে দিয়ে। শোষিত ও বঞ্চিত কৃষকরা কৃষিতে পুঁজি লগ্নী করতে পারে না, মধ্যস্বত্বভোগী-দের তো সে বিষয়ে কোন চিন্তাও থাকে না। ফলে কৃষির উৎপাদন হার কমতে থাকে।

জমিদারের দাবি ক্রমেই বাড়তে থাকে। জীবিকার মান উন্নয়ন ও বিলাস ব্যসন বৃদ্ধির সঙ্গে আয় বাড়াবার প্রয়োজন হয়, আর হলেই কৃষকের উপর চাপানো হয় আবোয়াবের বোঝা, নজরানা, সালামী, খারিজ ফি ইত্যাদি। জমির আয় থেকে এত দাবি রাইয়ত ও কৃষক মেটাতে না পেরে চড়া সুদে মহাজনের নিকট দেনা করে, খোরাকীর জন্য বাড়ি দিয়ে ধান কর্জ নেয়। তার জন্য জমি বন্ধক রাখে এবং সে জমি শেষ পর্যন্ত চলে যায় মহাজনের হাতে। জমিদার ও মহাজন অবাধ শোষণের সুযোগে মিলে যেতে থাকে, আর কৃষক জমিহীন হয়ে ভাগচাষী ও খেতমজুরে পরিণত হয়।

শোষণ শুধু জমিদারই করে না। শোষণের অলিখিত অধিকার দিয়ে জমিদার স্বল্প বেতনে নায়েব, গোমস্তা, পাইক, বরকন্দাজ, নগদি প্রভৃতি যেসব কর্মচারী নিযুক্ত করে তারাও করে শোষণ, অত্যন্ত নির্মমভাবেই করে। এমনি করে কৃষককে ধ্বংস করা হয়।

দায়িত্ব পালনে অবহেলা

রাইয়তী জমির পরিমাণ বেশি থাকলে রাইয়তরাও সমস্ত জমি নিজে বা মজুর দিয়ে চাষ করায় না, কোর্ফা প্রজা অথবা ঠিকা প্রজাকে বন্দোবস্ত দেয় কিংবা ভাগস্বত্বে বিলি করে। সেই সঙ্গে মহাজনী কারবারও করে। তাদের মধ্যেও কিছু লোক নিষ্কর্মা খাজনাখোরের দলে গিয়ে পড়তে থাকে। যথেষ্ট পুঁজি লগ্নী করে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে জমিদার শ্রেণীর মতো তারাও এগিয়ে আসে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অনুসারে কৃষি যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য সেচ বাঁধ প্রভৃতি বজায় রাখার যে দায়িত্ব পূর্বে রাষ্ট্রের উপর থাকত তা এখন ন্যস্ত হল জমিদারদের উপর। জমিদাররা সে দায়িত্ব বরাবরই অবহেলা ও অগ্রাহ্য করেছিল, বিশেষত শহরবাসী হয়ে পড়লে। কিন্তু সেজন্য সরকারও

তাদের বাধ্য করত না। * সকলেরই আয় যখন বাঁধা তখন সেজন্য গরজ কারোই ছিল না। মরে কৃষক মরবে, তাতে তাদের পাওনা কমে যাবে না। জমিদাররা গ্রামের বাস ত্যাগ করার ফলে গ্রামের লোকের রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যানবাহন ইত্যাদি কোন দিকেই তাদের নজর থাকে না। অনেক সময় গ্রামে বাস করেও তারা নিজেদের ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা বাইরে করেছে আর গ্রামের কৃষকদের শিক্ষার পথে বাধা দিয়েছে, যাতে "চাষার ছেলে" শিক্ষা পেয়ে তাদের শোষণ ও আভিজাত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে না শেখে। †

আভিজাত্যের মোহ

জমিদারী বা মধ্যস্বত্ব কিনতে টাকা লগ্নী করলে তার আয় অন্য লগ্নীর তুলনায় কম হত। তবু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দেশে লোকে জমিদারী কিনত আভিজাত্যের মোহে। কার্ল মার্কস বলেছেন যে যেহেতু সমস্ত প্রাচীন দেশে ভূসম্পত্তি বিশেষ অভিজাত ধরনের সম্পত্তি বলে এবং জমি কিনতে পুঁজি লগ্নী করলে সেটা খুব নিরাপদ লগ্নী বলেও বিবেচিত হয়, সেই কারণে যে সুদের হারে জমির খাজনা কেনা হয় তা দীর্ঘকালের জন্য পুঁজির অন্য লগ্নীর চেয়ে সাধারণত কম হয়। তাতে জমির ক্রেতা তার খরিদ দরের উপর ধরা যাক শতকরা ৪ (চার) ভাগ পাচ্ছে, অথচ অন্যান্যভাবে লগ্নী করা একই পুঁজির উপর শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ পেতে পারত। অর্থাৎ সে অন্যান্য লগ্নীতে একই পরিমাণ আয়ের জন্য যা দিত, জমির খাজনার জন্য তার চেয়ে বেশি পুঁজি দিচ্ছে। (Capital, Moscow, Vol. III, Ch. XXXVII.)

জমির খাজনাভোগীদের আয়ের ব্যবস্থা অনেকটা নিশ্চিত থাকার কারণে

---

* প্রমথ চৌধুরী দীর্ঘকাল পূর্বে যে কয়েকটা বিষয়ে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন সে সম্বন্ধে বলেন যে তার দ্বারা "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কানুনে সরকার প্রজাকে যে-কথা দিয়েছিলেন এবং যে-কথা আজ পর্যন্ত খেলাপই করা হয়েছে, শুধু সেই কথাই রাখা হবে—এর বেশি কিছুই নয়।" (রায়তের কথা, পৃ ২৩)

† কংগ্রেস ভূমি সংস্কার কমিটির (কুমারাপ্পা) রিপোর্টে (পৃ ১৩৪) মাদ্রাজের এলাস্তান-গুড়ি গ্রামের (তানজাউর জেলা, মায়াবরম তালুক) একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে সেখানকার মিরাসদাররা (জমিদার), তাদের পায়েয়ালরা (ভূমিদাস বা মজুরী দাস) মজুরী বৃদ্ধির দাবি করেছিল বলে, তাদের ইস্কুল ঘর ভেঙে দিয়েছিল। কারণ মিরাসদাররা বলে মজুরী বৃদ্ধির দাবির মূলে হল তাদের শিক্ষা, শিক্ষাই তাদের মাথা বিগড়ে দিয়েছে, অতএব ইস্কুল ঘর ভেঙে দিয়ে তাদের শিক্ষার পথ বন্ধ করা দরকার।

এবং মধ্যস্বত্বের সঙ্গে আভিজাত্যের মর্যাদা জড়িত থাকার কারণে যাদের নগদ টাকা থাকত তারা মধ্যস্বত্ব কিনতেই তা লগ্নী করত, শিল্প-বাণিজ্যের মধ্যে লগ্নী করার ঝামেলায় যেতে চাইত না। তাদের নিকট পরগাছা ও উদ্যোগহীন নিষ্কর্মা জীবনের আকর্ষণই ছিল প্রবল। তার ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দেশ এই বাংলাদেশে বাঙ্গালী পুঁজিদাররা শিল্প কারখানা স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী হয়নি।

অথচ বাংলাদেশে কারখানা শিল্পের পত্তন হয়েছে অন্য যেকোন প্রদেশের তুলনায় বেশি, আর তার উদ্যোগ নিয়েছে, মালিক থেকেছে অবাঙ্গালীরা এবং অভারতীয় বিদেশীরা।

শুধু শহরের শিল্প কারখানার কথাই নয়, গ্রামেও যে সমস্ত ধনী জমিদার, তালুকদার ও মহাজন বাস করেছে তারাও কৃষির উন্নয়নের কাজে লগ্নী করেনি, সে জন্য কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করতে চায়নি, অনায়াসলব্ধ নিশ্চিত আয়ের উপর বেঁচে থাকাকেই তারা কাম্য বলে ধরে নিয়েছে।

এই জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী বাঙ্গালী পরিবারের ছেলেরা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক আগে থেকেই কিছু আধুনিক শিক্ষা পেয়েছিল। সে শিক্ষা তারা এজন্য পায়নি যে তারা ছিল অভিজাত ঘরের সন্তান, এজন্য নয় যে জমিদারী আভিজাত্য তাদের শিক্ষার আলোকের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাদের আধুনিক শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করেছিল ইংরেজ শাসন। বাংলাদেশে কলকাতা ছিল ভারতের ইংরেজ রাজের কেন্দ্র ও প্রধান ঘাঁটি এবং তার শাসন ব্যবস্থার জন্য ও ইংরেজদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারীর প্রয়োজন হয়েছিল। ফলে এই শিক্ষা পেয়ে তারা চাকরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যেও গিয়েছিল।

আধুনিক বা ইংরেজী শিক্ষা তাদের আধুনিক জগতের অপেক্ষাকৃত প্রগতি-শীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়ে তাদের মধ্যে এনে দিয়েছিল তৎকালীন বিদেশী পুঁজিবাদী সমাজের রাজনীতিক ও সামাজিক উদার দৃষ্টি ও মনোভাব, এবং আরো পরে দেশের রাজনীতিক স্বাধীনতার চিন্তা ও চেতনা। সে চিন্তা ও চেতনা না পেলে সামন্তবাদী জমিদারীচিন্তাধারা তাদের মধ্যে সংকীর্ণ ও প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক চিন্তা বজায় রাখবারই চেষ্টা করত।

অগ্রগতির পথে অন্তরায়

কিন্তু সেই গৌরবের আসন যাদের দখলে ছিল, একটা বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত

অগ্রসর হবার পর তারা তা রাখতে পারলে না, ক্রমে তা বাঙ্গালী সমাজের হাতছাড়া হয়ে যেতে লাগল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-ভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন না হওয়ায়, শিক্ষিত বাঙ্গালীরা শিল্পকার্যের দিকে অগ্রসর না হওয়ায়, নিজেদের অর্থসামর্থ্য উন্নত ধরনের কৃষিতে ও শিল্পে লগ্নী না করায় আর উন্নত হতে পারলে না, তাদের অর্থনীতিক জীবন এবং সেই সঙ্গে রাজনীতিক চিন্তার অগ্রগতি ব্যাহত হল, ক্ষয়ের পথে চলতে লাগল। এক সময়ের প্রগতিশীল রাজনীতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা বাঙ্গালী সমাজকে যে গৌরব ও মর্যাদা দিয়েছিল, তাকে এগিয়ে না নিয়ে শুধু পুঁজি করে আর বেশি দিন ভাঙ্গিয়ে খাওয়া চলল না। ক্ষয় ও পতনের পথকে তারা এড়াতে পারলে না।

মোট কথা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথা বাংলার অর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে এসেছে, একটা খাজনাখোর পরগাছা শ্রেণী সৃষ্টি করে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিতে বাধা দিয়েছে, ধনী ও শিক্ষিত সমাজকে উদ্যোগহীন করে রেখেছে, সমাজের কৃষি ও কারিগরী শিল্পের উৎপাদক শ্রেণীকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে, পরগাছা শ্রেণীর স্বার্থে উৎপাদক কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর এক বৃহৎ অংশকে নিঃস্ব ও বেকারে পরিণত করে রেখেছে, এবং এই নিঃস্ব ও বেকারের জীবনকে ক্রমেই ব্যাপক ও কঠোর করে এসেছে। যে সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পত্তন হয়, তখন সে যুগের প্রগতিশীল পুঁজিবাদী ইংরেজদের সংস্পর্শে থেকে উৎপাদন শক্তির যেটুকু উন্নতি করবার সুযোগ ছিল, তাকে কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি নতুন প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিসম্পর্ক প্রবর্তন করার ফলে। এ ছিল বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দেবার পথ, তার স্বাভাবিক অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেবার ব্যবস্থা।

এই ভূমি ব্যবস্থাকে বজায় রাখবার জন্য যেসব আইন করা হয়েছিল তাও উৎপাদক কৃষকদের উৎপাদনের কাজে সাহায্য না করে বাধাই দিয়েছিল, উৎপাদক কৃষকদের ক্রমশ নির্জীব করতেই সাহায্য করেছিল। ১৯২৯ সনে যে বিশ্ব সংকট আরম্ভ হয় তার আঘাতে বাংলার কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল, কৃষক সমাজ ধ্বংসের মুখে এসে পড়েছিল। কৃষকদের পক্ষে জমিদারের পাওনা মেটাবার সম্ভাবনা খুব কমে গিয়েছিল। তখন কৃষকদের দীর্ঘকালের জমাট বিক্ষোভ সংগঠিত আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল।

জমিদারদের স্বার্থে কমিশন

জমিদারী ব্যবস্থাই তখন পড়েছিল সংকটে। খাজনা আদায় হয় না, সরকারী রাজস্ব দিয়ে জমিদারী বজায় রাখা কঠিন। সমগ্রভাবে জমিদারী প্রথাটাই ভেঙ্গে পড়ার-মুখে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অচল। ভূমি সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং জমিদার শ্রেণীর সামনেও তার সর্বনাশের প্রশস্ত রাজপথ খুলে গেছে।

এই সর্বনাশের গ্রাস থেকে বাঁচাতে হবে ইংরেজ সরকারের দীর্ঘকালের দোসর এবং রাজনীতিক-সামাজিক সমর্থনের ভিত্তি এই জমিদার শ্রেণীকে।* সেটা কী উপায়ে হবে তা আনুষ্ঠানিকভাবে স্থির করে দেবার জন্য প্রয়োজন একটা তদন্ত কমিশন। এই ছিল ১৯৩৮ সনের ভূমিরাজস্ব কমিশনের জন্ম বিবরণ ও উৎপত্তি প্রকরণ।

কমিশন তার রিপোর্টে বলেছিল তার মেজরিটির বা অধিকাংশের মতে জমিদারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে "রাষ্ট্রের দখলই একমাত্র সন্তোষজনক সমাধান।" অল্পস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকারের বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২ থেকে ৮ কোটি টাকা। গবরমেণ্টের সুবিধা হল কঠোর বিক্রয় আইনের সাহায্যে রাজস্বের নিরাপত্তা। নির্দিষ্ট তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে রাজস্ব জমা না দিলে জমিদারী নিলাম হবার আইন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কোড জারি হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে সরকার তার দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন এড়িয়ে যেত। প্রজাদের সঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ কোন যোগসূত্র না থাকায় তারা কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করত না, যতদিন না ভূমি সংক্রান্ত গোলযোগ ঘটার ফলে আইন ও শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনে সরকারকে বাধ্য হয়ে সেদিকে নজর দিতে হত, অর্থাৎ শ্রেণী সংঘর্ষের সময় শোষিত শ্রেণীকে দমন করতে যেতে হত। তারই পরিণতি ছিল ১৮৫৯ এর খাজনা আইন। এই আইন থাকলেও

---

* "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর কারণ রাজনৈতিক। ইংরেজ রাজ যখন বিদেশী রাজ, তখন দেশে এমন একটি দলের সৃষ্টি করা আবশ্যক যাদের স্বার্থ ইংরেজ রাজের স্বার্থের সহিত জড়িত। যেহেতু আপদে বিপদে এই দল ইংরেজ রাজের পক্ষ অবলম্বন করবে।" (রায়তের কথা, পৃ ৩৪০।) বড়লাট বেন্টিংকও ৮ নবেম্বর ১৮২৯ তারিখে তাঁর এক বক্তৃতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজনীতিক চরিত্র সম্বন্ধে এই রকম মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।

বিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত জরিপ মারফত প্রজাদের স্বত্বের কোন দলিল বা পরচা তৈরি হয়নি।

কমিশনের সুপারিশ

ভূমি রাজস্ব কমিশনের সুপারিশগুলি ছিল সংক্ষেপে এই: (১) খাজনা-ভোগীদের উচ্ছেদ করতে হবে, সেজন্য গবরমেণ্ট কর্তৃক সমস্ত জমিদারী ও মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বত্ব কিনে নিয়ে রাইয়তওয়ারী প্রথা প্রবর্তন করতে হবে। এই স্বত্বের মধ্যে নগদ খাজনায় বিলি করা রাইয়তী বা কোর্ফা স্বত্বও পড়বে। (২) সকল শ্রেণীর জমিদারকে এবং বর্গাদারী স্বত্বে বিলি-করা জমির রাইয়ত মালিককেও খাজনাভোগী শ্রেণীর মধ্যে গণ্য এবং বর্গাদারদের সরাসরি সরকারের প্রজা বলে গণ্য করতে হবে। বর্গাদাররা উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত খাজনা দেবে, তার বেশি নয়। (৩) খনির স্বত্ব এবং অনুৎ-পাদিত খনিজ সম্পদের স্বত্বও গবরমেণ্টকে নিতে হবে। (৪) ভবিষ্যতে জমি যাতে অকৃষকের হাতে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অকৃষকের নিকট জমি হস্তান্তর বা বিলি করা বন্ধ করতে হবে।

কমিশনের মেজরিটির মতে বর্তমান খজনাভোগীদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিপূরণ হবে নিট আয়ের ১০ (দশ) গুণ এবং ওয়াকফ, দেবোত্তর ইত্যাদি ট্রাস্ট সম্পত্তির বেলায় ২৫ (পঁচিশ) গুণ। এই সব সুপারিশ কাজে পরিণত হবার পূর্বে কৃষি আয়কর প্রবর্তন করতে হবে।

বকেয়া খাজনা সরকার আদায় করবে এবং তার অর্ধেক খাজনা-ভোগীদের ক্ষতিপূরণের সঙ্গে যোগ করে দেবে।

কমিশন সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করে ২১ মার্চ ১৯৪০।

বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে নীতি

ইয়োরোপে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কয়েকমাস পূর্বে আরম্ভ হয়েছিল তারপর সারা ভারত কৃষক সভার প্রথম সম্মেলন হয় পলাসায় (অন্ধ্র); সভার এই পঞ্চম অধিবেশন বসে মার্চ ১৯৪০এ। এই সম্মেলনই তখনকার যুদ্ধ সম্বন্ধে কৃষক সভার নীতি নির্ধারণ করে। পলাসা সম্মেলনের রাজনীতিক প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়: "……সভা আরো বিশ্বাস করে যে যেহেতু কৃষকদের শান্তির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তারা নিজেরাই শ্রমিকদের সঙ্গে মিলে বিদেশী সরকারের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে এবং দেশের সমস্ত সম্পদ বেরিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে মুক্তি সংগ্রামের পুরোধা হবে। সেই লক্ষ্য

নিয়ে কৃষকদের এখনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেই সঙ্গে দেশীয় রাজাদের, জমিদারদের ও সাহুকারদের (মহাজনদের)—যারা দেশে সেই শক্তির স্তম্ভ তাদের—বিরুদ্ধে তাদের সভার নেতৃত্বে দৈনন্দিন সংগ্রাম শুরু করতে ও তীব্র করতে হবে। এই সমস্ত সংগ্রামকে তীব্রতর করে এবং ব্যাপকতর এলাকায় ছড়িয়ে অতিসত্বর এমন এক দেশব্যাপী ট্যাক্স-বন্ধ ও খাজনা-বন্ধ আন্দোলনে সংহত করতে হবে যা সাম্রাজ্যবাদের এই সমস্ত পরগাছাগুলির অর্থনীতিক ক্ষমতাকে খতম করতে পারে এবং এদেশে ব্রিটিশ গবরমেণ্টের রাজনীতিক শক্তিকে কাঁপিয়ে দিতে পারে।"

এই সম্মেলনের পর এবং এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ঐ বছর প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের অধিবেশন ময়মনসিং জেলায় (বর্তমানে পাকিস্তানে) হবার সিদ্ধান্ত ছিল। সেজন্য জামালপুর মহকুমায় আয়োজন চলতে থাকে। কিন্তু সরকার তাতে বাধা দেওয়ায় নেত্রকোনা মহকুমায় আয়োজন আরম্ভ হয়। প্রস্তুতির কাজ অনেক দূর অগ্রসর হবার পর দেখা যায় গবরমেণ্ট সেখানেও সম্মেলন হতে দিতে চায় না। তখন যশোহর জেলার (বর্তমানে পাকিস্তানে) পাঁজিয়া গ্রামে (কেশবপুর থানা) অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে সম্মেলনের অনুষ্ঠান করতে হয়।

ঐ বছরের প্রথম দিকেই কৃষক সভার বহু কর্মী ও নেতার উপর সরকারী দমন পীড়ন আরম্ভ হয়ে যায়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, বঙ্কিম মুখার্জি, গোপাল হালদার প্রভৃতির উপর সরকারী পীড়ন এসে পড়ে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সমেত কয়েকজনকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়, অনেকে গ্রেপ্তার হন।

পাঁজিয়া সম্মেলন ও তার সিদ্ধান্ত

এই কঠোর অবস্থা ও দুর্যোগের মধ্যে আধা-বেআইনী অবস্থায় ৮-৯ জুন ১৯৪০ তারিখে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছিল প্রাদেশিক সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন। অধিবেশনে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় এক শ (১০০) প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। দমন ব্যবস্থার কারণে অনেক প্রতিনিধি আসতে পারেননি। সভাপতি পরিষদের পাঁচ জন সদস্যের মধ্যে হাজির ছিলেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, বঙ্কিম মুখার্জি ও সৈয়দ নওশের আলি এবং ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। জনাব আবু হোসেন সরকার (রংপুর) আসতে পারেননি।

সম্মেলনে যে নিবন্ধ পাঠ করা হয় তার বিষয়বস্তু ছিল ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট। নিবন্ধ প্রতিনিধি সম্মেলনে আলোচনার পর সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়। তারই ভিত্তিতে প্রধান প্রস্তাবটি লিখিত হয় এবং আলোচনার পর গৃহীত হয়।

প্রস্তাবে বলা হয় যে সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও কমিশন তাদের রিপোর্টে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে কৃষক সভার মূল দাবি মেনে নিয়েছে সেজন্য সম্মেলন সন্তোষ প্রকাশ করছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে সভার মত বিরোধের কথাও উল্লেখ করা হয়। তার মধ্যে একটা প্রধান বিষয় ক্ষতিপূরণের সুপারিশ।

প্রস্তাবে আরো বলা হয়; জমিদারদের মোট বার্ষিক আয় ১৩ কোটি টাকা থেকে ভূমি রাজস্ব বাবত ২ কোটি ৪১ লক্ষ, জেলা বোর্ডের সেস বাবত ৪৬ লক্ষ ও আদায় খরচ বাবত শতকরা ১৮ টাকা হিসাবে ২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বাদ দিলে সরকারের নিট আয় দাঁড়ায় ৭ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা, দশ বছরে ৭৭ কোটি ৯০ লক্ষ। জরিপ ও অন্যান্য খরচ যোগ দিলে মোট ক্ষতিপূরণ দিতে হয় ৯৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে রাইয়তী, মধ্যস্বত্ব ও বর্গা জমির ক্ষতিপূরণ ধরা হয়নি, ধরলে পরিমাণ অনেক বেশি হবে। "নীতির দিক হইতেই আমরা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী"। "ন্যায়-বিচার করিলে ক্ষতিপূরণের চাপ দেওয়া উচিত জমিদারদের উপর, যাঁহারা এতদিন অতিরিক্ত আদায় করিয়াছেন।" (পাঁজিয়া রিপোর্ট, ১৯৪০)

ওয়াকফ ও দেবোত্তর প্রভৃতি সম্পর্কে বলা হয়, "আমাদের মতে জনহিতকর সম্পত্তিগুলি ছাড়া অন্য সমস্ত সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপূরণে গবরমেন্টের নিজ হাতে লওয়া উচিত।" পরে, "অতএব দেখা যাইতেছে যে এই ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা নীতির দিক দিয়া যেমন অন্যায়, কার্যতও তেমনি অপব্যয়-জনক।" ..."এই সকল কারণে আমাদের দাবি বাকি খাজনা মকুব হ'ক।" (ঐ)

কৃষক সভার মেমোরেণ্ডামে বলা হয়েছিল; "আমরা চাই খাজনা আদায় প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং ইহার পরিবর্তে কৃষি আয়করের প্রবর্তন।" (পৃ ৮২)

আন্দোলনের নির্দেশ

কমিশনের রিপোর্ট দাখিলের পর এই রিপোর্টের উপর গবরমেন্টের

করণীয় সম্পর্কে গার্নার নামে একজন সরকারী কর্মচারীকে আর এক কমিশন হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। এই বিষয়ে পাঁজিয়া প্রস্তাবে মন্তব্য করা হয়: "রিপোর্টে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়াই যে উহা কার্যে পরিণত করা হইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বরং [গার্নার] কমিশন বসাইয়া জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের প্রশ্নকে কিছুদিন মুলতুবী রাখিবার চেষ্টাই করা হইয়াছে।" (বস্তুত কিছুদিন মুলতুবী রাখাই নয়, ইংরেজ আমলেই এই ভূমি ব্যবস্থার কোন সংস্কার হয়নি।) সেজন্য ফজলুল হক মন্ত্রীসভার সমালোচনাও করা হয়।

সম্মেলন এই প্রস্তাবের মধ্যে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে: "কমিশনের রিপোর্টে ত্রুটি যতই থাকুক, গবরমেণ্টের দ্বারা এই রিপোর্টের সুপারিশগুলিকে কাজে পরিণত করাইবার জন্য কৃষক সমিতিগুলি গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে প্রবল আন্দোলন চালাইয়া জনমত সৃষ্টি করুক। আমরা চাই— ১। অবিলম্বে আইন করিয়া জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করা হ'ক। ২। রাইয়তওয়ারী প্রথা আমরা চাই না। রাজস্ব বা রেভিনিউ-এর বদলে আমরা চাই ইনকাম ট্যাক্স বা আয়কর।… ৪। খাসমহল প্রথাও তুলিয়া দেওয়া হ'ক।… ৫। আইন করিয়া বর্গা প্রথা তুলিয়া দেওয়া হ'ক, কেহ যেন চাষের জমি বর্গা দিয়া ভাড়া খাটাইতে না পারে। হয় জমি ছাড়িয়া দিতে হইবে, নয় নিজে চষিতে হইবে। এখন যে জমিতে যে বর্গা চাষ করে সেই জমিতে সে যেন স্বত্ববান হয়। ৬। গ্রামের বেকারদের গবরমেণ্ট হয় উপযুক্ত পরিমাণ জমি, নয় উপযুক্ত কাজ, না হয় উপযুক্ত পরিমাণে বেকার ভাতা দিতে বাধ্য হ'ক। ৭। কৃষকের ঋণ মকুব করা হ'ক।"

প্রস্তাব শেষ করা হয়েছে এইভাবে: "এই দাবি অনুসারে আইন কতদিনে হইবে অথবা আদৌ হইবে কি না তার ঠিক নাই। অথচ বর্গা চাষীরা আজ মারা যাইতেছেন। কাজেই কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ পাইবার দাবি লইয়া চাষীরা আজই সংঘবদ্ধ হইয়া প্রবল সংগ্রাম শুরু করিয়া দিন।"

বর্গাদার ও খেতমজুরের দাবি

এই প্রস্তাবে তখনকার দিনের ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্নে কৃষকদের প্রধান প্রধান দাবিগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর মধ্যে মন্ত্রীসভার শ্রেণী চরিত্র ও সীমাবদ্ধতারও সমালোচনা করা হয়েছে।

আন্দোলন ও সংগ্রামের পথে ছাড়া কৃষক সমাজের স্বার্থে এই সমস্ত দাবিকে যে কাজে পরিণত করানো সম্ভব নয় তাও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। গবরমেণ্ট যুদ্ধের অবস্থার সুযোগ নিয়ে কমিশনের রিপোর্টকে শিকেয় তুলে রেখে দিলে। ইংরেজ শাসন কায়েম থাকতে তার উপর কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হল না।

প্রস্তাবের দাবিগুলির মধ্যে আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় হল বর্গাদার ও খেতমজুরদের কথা। ছ বছর পরে (১৯৪৬-৪৭) তেভাগার দাবিতে যে ব্যাপক আন্দোলন বাংলাদেশের শোষক শ্রেণীগুলিকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল তার জন্য ডাক দেওয়া হয়েছিল এই প্রথম। খেতমজুরদের দাবির প্রশ্নও তোলা হয়েছিল বটে কিন্তু তখনো পর্যন্ত সংগঠিত প্রচেষ্টা হয়নি। তার একটা প্রধান কারণ এই যে কৃষক সভার কর্মীদের মধ্যে এই দাবির সপক্ষে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়নি, এই দাবির রাজনীতিক গুরুত্ব কর্মীদের বোঝানো হয়নি।

সম্মেলনে নির্বাচিত সম্পাদক মণ্ডলীতে ছিলেন: সাধারণ সম্পাদক—আবদুল্লাহ রসুল, সংগঠন—আবদুল মোমিন ও নলিনীপ্রভা ঘোষ, প্রচার—গোপাল হালদার, গবেষণা—রেবতী বর্মণ (তাঁর অসুস্থতাজনিত সাময়িক অনুপস্থিতি কালে শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য), আইন-আদালত—ডাঃ চারু ব্যানার্জি, সমবায়—শিবনাথ ব্যানার্জি। আফিস সম্পাদক এবং পার্লামেণ্টারি ও স্বেচ্ছাসেবক বিভাগের সম্পাদকদের পদে তিন জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনয়ন করবার জন্য সাধারণ সম্পাদককে ভার দেওয়া হয়। কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থার কারণে সে ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তী সম্মেলন বরিশাল জেলায় হবে বলে সম্মেলন সিদ্ধান্ত করে।

পাঁচ

পাঁজিয়া সম্মেলনের পর অবস্থা আরো জটিল হতে থাকে। বিভিন্ন জেলা থেকে যত প্রতিনিধি আসেন তাঁদের পিছনে পুলিসের গুপ্তচরও আসে তেমনি সংখ্যায়। তাছাড়া সম্মেলনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত চর তো ছিলই। কোথাও নিশ্চিন্ত হয়ে আলাপ আলোচনা করার উপায় ছিল না। আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ছিল। ভারতরক্ষা আইনে ধরপাকড় আগেই আরম্ভ হয়েছিল, তখন থেকে আরো বাড়তে থাকল।

স্বভাবতই তখন কৃষক সভার অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মীকে গা ঢাকা দিয়ে কাজ করতে হয়। তারই মধ্যে যথাসম্ভব আন্দোলন ও সংগঠনের কাজ চলতে থাকে।

আর একটা অসুবিধার কারণে সাধারণ সম্পাদকের উপর চাপ এসে পড়ে বেশি। মার্চ মাসে পলাসায় (অন্ধ্র) যে সারা ভারত সম্মেলন হয় তার সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক স্বামী সহজানন্দ গ্রেপ্তার হবার সময় যুগ্ম সম্পাদক ইন্দুলাল যাজ্ঞিককে তাঁর পদে মনোনীত করেন। আরো পরে কমরেড যাজ্ঞিক গ্রেপ্তার হয়ে অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক আবদুল্লাহ রসুলকে সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত করেন। তখন তাঁকে অস্বাভাবিক অবস্থায় সারা ভারত সভার সাংগঠনিক কাজে তিন মাসের উপর বিভিন্ন প্রদেশে সফর করতে হয়। ফিরে এসেও তিনি প্রকাশ্যভাবে আফিসে গিয়ে কাজ করতে পারেন না। তবে কমরেড গোপাল হালদার, প্রমথ ভৌমিক প্রভৃতি প্রকাশ্যভাবে প্রাদেশিক আফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ চালাতে থাকেন।

সোবিয়েতের উপর আক্রমণ ও কৃষক সভা

সরকারী দমন ব্যবস্থার কারণে পাঁজিয়া সম্মেলনের প্রস্তাব অনুসারে ব্যাপকভাবে জনসভা ডেকে প্রচারের কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু কর্মীরা কৃষকদের ও অন্যান্য কর্মীদের বৈঠকী সভায় প্রচার করতে

থাকেন। সে সময় সংগঠনকে মজবুত করে গড়ে তোলার কাজ বিশেষ জোর দিয়ে করা হয়। কর্মীদের রাজনীতিক তালিম দেবার ব্যবস্থাও চলে। এই অবস্থা চলতে থাকায় পরের বছর (১৯৪১) কোন সম্মেলন হয় না।

১৯৪১এর ২২ জুন তারিখে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। ঐদিন হিটলারী ফাশিস্টরা পৃথিবীর একমাত্র সমাজবাদী রাষ্ট্র সোবিয়েত দেশকে আক্রমণ করে। এই ঘটনা সারা দুনিয়ার মতো ভারতের জনগণের মধ্যেও এবং বিশেষ ভাবে কৃষক সভার কর্মীদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে সোবিয়েতের প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখা যায়।

প্রাদেশিক কৃষক সমিতির তরফ থেকে ফাশিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সমর্থন ঘোষণার জন্য ২২ জুলাই কলকাতা টাউন হলে এক জনসভা আহ্বান করা হয়। কৃষক সভার একজন বিশিষ্ট সমর্থক ও আনন্দ-বাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সভাপতিত্ব করেন। এই সভাতেই বিভিন্ন শ্রেণীর ও ক্ষেত্রের ফাশীবিরোধী গণতান্ত্রিক নাগরিকরা মিলিত হয়ে "সোবিয়েত সুহৃদ সমিতি" (ফ্রেণ্ডস অব দি সোবিয়েত ইউনিয়ন —এফ. এস. ইউ.) গঠন করেন। এই যুদ্ধে এ দেশে ফাশিবাদের বিরুদ্ধে এবং সোবিয়েতের সমর্থনে গণতান্ত্রিক জনমত গঠনে এই সমিতির অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান ছিল।

সোবিয়েত সুহৃদ সমিতির সঙ্গে কৃষক সভা বরাবর সহযোগিতা ও সংযোগ রক্ষা করে এসেছিল। এই সমিতি ক্রমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে ও সংগঠিত হয়। সারা ভারত কৃষক সভা এবং অন্যান্য প্রাদেশিক কৃষক সভাগুলি এই সমিতির সহিত সহযোগিতা করে। এই সমিতিরই ওয়ারিস হিসাবে পরে গঠিত হয় "ইসকাস"—ইণ্ডো-সোবিয়েত কালচার্যাল সোসাইটি।

হাজং এলাকার আন্দোলন

১৯৩৮-৪০ সনের একটা উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ছিল ময়মনসিং জেলার সুসং পরগনার টংক-বিরোধী আন্দোলন। গারো পাহাড়ের নিচে এই অঞ্চলে হাজং উপজাতি বাস করে। তার সঙ্গে গারো উপজাতি এবং কিছু মুসলমান কৃষকও আছে। এই সব কৃষকরা অনেক পরিমাণে সামন্তবাদী

শোষণের শিকার ছিল। তার মধ্যে ছিল টংক, ভওয়ালী, নানকার, খামার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সামন্তবাদী শোষণ প্রথা।

হাজং কৃষকদের মধ্যে টংক প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এই প্রথায় সন পাট্টা মোতাবেক এক বছরের জন্য কৃষকদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত আর সেজন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির দরুন নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান কৃষকদের দিতে হত। তাতে হাজাশুখা মাফ ছিল না। কোন কারণে জমিতে ফসল না হলে কিনেও জমিদারের পাওনা শোধ করতে হত। এই ফসলে-খাজনার পরিমাণ অনেক সময় মোট উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকও হত। জমিতে কৃষকের কোন স্বত্ব থাকত না। এ এক ধরনের ঠিকা (সাঁজা বা শুলো) প্রথা।

ভাওয়ালি প্রথা চালু ছিল ঐ জেলার শেরপুর পরগনার রাজবংশী ও হাজং প্রজাদের মধ্যে। এই প্রথায় জমিতে কৃষকের কিছু স্বত্ব থাকত কিন্তু জমি হস্তান্তরের জন্য মালিকের অনুমতি লাগত। এই জমির খাজনা ছিল আংশিক নগদে আর আংশিক জিনিসে। শোষণের মাত্রা ছিল অতিরিক্ত।

নানকার প্রথাকে বেগার বা চাকরান প্রথাও বলা হত। নানকারী জমিতে প্রজার কোন স্বত্ব থাকত না। একর প্রতি মাসে পাঁচ থেকে সাত দিন পর্যন্ত জমিদারকে বেগার দিতে হত। তাছাড়াও বিশেষ বিশেষ কাজে বা উপলক্ষে জমিদার তলব করলে প্রজাকে তার হুকুম তামিল করতে হত। এই প্রথা ব্যাপকভাবে চলত শেরপুর পরগনার হদি ক্ষত্রিয়দের মধ্যে।

এই অত্যধিক শোষণের চাপে কৃষকদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। ১৯৩৭ সনে আটক বন্দী কমরেড মনি সিং এই অঞ্চলে অন্তরীণ থাকাকালে গোপনে দশাল গ্রামের মুসলমান চাষী এবং লেঙ্গুরা, ভরতপুর, জিগাতলা প্রভৃতি গ্রামের হাজং চাষীদের মধ্যে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন। (সেজন্য ধরা পড়ে তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।) তেমনি পশ্চিমে নালিতাবাড়ি থানায়ও কোন কোন অন্তরীণ রাজবন্দী কৃষকদের মধ্যে আন্দোলনের কথা প্রচার করেন।

ফলে সুসং ও শেরপুর পরগনার এই আদিবাসী অঞ্চলে টংক, নানকার ও ভাওয়ালী প্রথার সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা হয়। আন্দোলনের এই দাবির সঙ্গে কৃষকদের আরো দাবি ছিল দমন ব্যবস্থা প্রত্যাহার, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন এবং

ঋণভার লাঘব। এই সব দাবি নিয়ে ফজলুল হক মন্ত্রীসভার নিকট ডেপুটেশন পাঠানো হয় এবং হক সাহেব আশ্বাস দেন যে উত্তর ময়মনসিংএর আদিবাসী এলাকায় টংক জমির নিরিখ ও স্বত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন।

সরকারী দমন ব্যবস্থা ব্যর্থ

নানকার আন্দোলন ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত একটানা চলে। পরেও ১৯৪৭ পর্যন্ত চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত জমির মালিকানা থেকে জমিদারদের উচ্ছেদ করে কার্যত কৃষকরা নানকার প্রথার অবসান ঘটিয়েছিল। খাজনার হার কমানো ও ফসলের বদলে টাকায় খাজনা ধার্য করা ইত্যাদি দাবিতে আন্দোলন হয় ১৯৩৯-৪০ সনে। টংক আন্দোলনের ফলে খাজনার হার কিছু কমান হয়, টাকায় খাজনা দেবার অধিকার আদায় হয় এবং জমিতে কতকটা স্বত্ব পাওয়া যায়। (হাটগোবিন্দপুর রিপোর্ট, ১৯৪৫, পৃ ৩৭)

তখন থেকে এই অঞ্চলের আদিবাসী কৃষকরা এবং বিশেষ করে হাজংরা কৃষক সভার একটা মজবুত খুঁটিতে পরিণত হয়। হাজং কৃষকদের প্রধান ও পুরোন নেতা কমরেড ললিত সরকার ও অন্যান্য হাজং নেতাদের পরিচালনায় এই অঞ্চলে কয়েকবার বড় বড় আন্দোলন হয়ে গেছে ১৯৪৬, ১৯৪৭ এবং ১৯৪৯-৫০ সনে। তার বিবরণ পরে দেওয়া হবে।

এখানকার কৃষকরা শক্তিশালী কৃষক সংগঠন গড়ে তোলায় জমিদার ও সরকার মিলিতভাবে দমন ব্যবস্থা চালু করে, তাকে ভেঙ্গে দেবার জন্য সমস্ত রকম জুলুম অত্যাচার চালাতে থাকে। পারিবারিক প্রয়োজনে জমিদারের টিলার জংগলে কাঠ কাটার অধিকার কৃষকরা এ পর্যন্ত চিরকাল ভোগ করে এসেছিল। কিন্তু হঠাৎ ১৯৪১ সনে জমিদার কৃষকদের কাঠ কাটতে নিষেধ করে। নিষেধ সত্ত্বেও প্রাচীন অধিকার অনুসারে কৃষকরা কাটে। জমিদারের কর্মচারী বাধা দিলে কৃষকরা দল বেঁধে গিয়ে প্রয়োজন মতো কাঠ কেটে নিয়ে আসে।

মামলা আদালতে যায়। বাস্তবিক যারা কাঠ কেটেছিল তাদের বাদ দিয়ে ঘটনার একমাস পরে মিথ্যা অভিযোগে নিরপরাধ কিন্তু বাছাই করা ভলণ্টিয়ারদের গ্রেপ্তার করা হয়। মনি সিংকেও আসামী করা হয়। অন্যায় বিচারে পাঁচ জনের জরিমানা ও ১৯ জনের তিন মাস করে জেল হয়।

এ ছিল চাষের মরসুম। গরিব হাজং কৃষকরা এই সময়ে জেলে আটক থাকলে তাদের চাষ নষ্ট হবার কথা। কিন্তু স্থানীয় কৃষক সমিতির নেতৃত্বে ও ব্যবস্থায় এই বন্দীদের কোন জমি পতিত থাকেনি, কারো পরিবারকে

উপবাস করতে হয়নি, কারো ঘরে বর্ষায় এক ফোঁটা জল পড়তে দেওয়া হয়নি। সমিতির নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষকরা সকলে মিলে প্রয়োজন মতো সাহায্য দিয়ে নিজেদের কাজের মতো বন্দী কৃষকদের কাজও করে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে সমিতি এই চেতনা এনে দিয়েছিল যে বন্দীরা ব্যক্তিগত স্বার্থে জেলে যাননি, গেছেন সকলের স্বার্থে কাজ করার ফলে।

রাজনীতিক তালিমের সুফল

১৯৪২ সনে অন্য দুজন কমরেডের (ভূপেন ভট্টাচার্য ও সুকুমার ভাওয়াল) সঙ্গে এই অঞ্চলে আমি কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম। বর্ষাকাল। যুদ্ধের সময়। হাজং কৃষকদের এলাকার উপর জমিদারের কর্মচারী ও পুলিসের নজর ছিল প্রখর। সেই অবস্থায় পুলিসের ওয়ারেন্ট মাথায় করে বহু গ্রামে ঘুরেছিলাম। কাজ ছিল প্রধানত কৃষক সভার সংগঠন ও কৃষক কর্মীদের রাজনীতিক তালিম। প্রত্যেক জায়গায় দৈনিক দুটি বা তিনটি করে ক্লাস হত ; কোন কোন ক্ষেত্রে একদিনে চারটে ক্লাসও হত—পুরুষ কৃষকদের, কৃষক নারীদের এবং ভলণ্টিয়ারদের ক্লাস। এই শিক্ষার ফল পরবর্তী সময়ে পাওয়া গিয়েছিল আশাতীত পরিমাণে।

কৃষক নারীদের রাজনীতিক তালিম দেওয়া হয়েছিল এই প্রথম। চারটি মেয়ে যোগ দিতেন। তার মধ্যে পরবর্তী কালের আন্দোলন সম্পর্কে ললিত সরকারের স্ত্রী মানিক এবং কলাবতীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সেই সময়ে দেখেছি কৃষক দাবির ও জাতীয় মুক্তি দাবির জন্য হাজং কৃষকদের আগ্রহ, আন্দোলন ও সংগঠন সম্বন্ধে তাদের উৎসাহ, সমিতির প্রতি গভীর আনুগত্য, আর কাজের সম্বন্ধে ভলণ্টিয়ার ও অন্য কৃষকদের নিখুঁত শৃংখলাবোধ। অধিকাংশেরই কোন অক্ষরজ্ঞান ছিল না কিন্তু ছিল আনুগত্যের সঙ্গে শৃংখলাবোধের অদ্ভুত সংমিশ্রণ এবং অদম্য সংগ্রামী চেতনা। পরবর্তী কালে এই কৃষকরাই অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের বিভিন্ন সংগ্রামে অনেকে শহীদ হয়ে নিজেদের সুগভীর শ্রেণী চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই শহীদরা কৃষক সভাকে অমর করার সাথে সাথে নিজেদেরও অমর করে গিয়েছিলেন।

১৯৪০ থেকে ১৯৪২এর মাঝামাঝি পর্যন্ত দু বছর সরকারী দমন পীড়নের কারণে প্রকাশ্য আন্দোলনের কাজ বেশি করা যায়নি। কৃষক সভা তখন বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে প্রচার করত। সেই কারণে তার উপর

ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের আক্রোশ। পরে সোবিয়েত ইউনিয়নের উপর ফ্যাশিস্ট হামলা শুরু হলে কয়েক মাসের মধ্যে যুদ্ধের চরিত্র সম্বন্ধে নতুন সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৪২এর ফেব্রুয়ারি মাসে নাগপুরে কেন্দ্রীয় কৃষক কাউন্সিল এই যুদ্ধকে ফাশিস্ট-বিরোধী যুদ্ধ ও স্বাধীনতার যুদ্ধ আখ্যা দেয়। তখন থেকে কৃষক সভার কর্মীরা কৃষকদের মধ্যে ফাশিস্ট-বিরোধী প্রচারের উপর বিশেষ জোর দেন। (নালিতাবাড়ি রিপোর্ট, ১৯৪৩)

জাপানকে রুখতে হবে!

১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে জাপান যুদ্ধে যোগ দেয়—ব্রিটিশ ও মার্কিন নৌঘাঁটির উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। তারপর ইন্দোচীন, মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেসিয়া ও বর্মা দখল করে নেয়। জনগণকে অসহায় অবস্থায় ফেলে বর্মা থেকে ব্রিটিশ শাসকরা ও সৈন্যরা পালিয়ে যায়। সেই অরক্ষিত অবস্থায় সেদেশের অধিবাসী ছাড়া লক্ষ লক্ষ ভারতীয় অধিবাসী ভীষণ বিপদে পড়ে যায়। অসংখ্য ভারতীয় অত্যন্ত দুর্গম স্থলপথে মণিপুর রাজ্য হয়ে এদেশে ফিরে আসে। তখন ভারত হল জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের পরবর্তী লক্ষ্য।

এই অবস্থায় স্বভাবতই ভারতের ও বিশেষ করে বাংলার মানুষের মধ্যে আতংক দেখা দেয়। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করে। কমিউনিস্ট পার্টি আরো অগ্রসর হয়ে সিদ্ধান্ত করে যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের উপর নির্ভর না করে দেশের জনগণকে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠন করতে হবে, এবং সেজন্য জনমত সংগঠন করতে থাকে।

১৯৪২ সনে কৃষক সভাও ফাশিস্ট-বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে এবং আওয়াজ তোলে: জাপানকে রুখতে হবে। এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে চলতে থাকে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে। সর্বত্র কৃষকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে দেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত করার চেষ্টা চলতে থাকে। সেজন্য কৃষক ভলণ্টিয়ার সংগ্রহ করে জনরক্ষা বাহিনী গঠনের কাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সারা বাংলায় প্রায় ৩০০ জনরক্ষা কমিটি গঠন করা ও ৫০ হাজার কৃষক ভলণ্টিয়ার সংগ্রহ করা হয়। কৃষকদের মুখে নতুন রচিত দেশ রক্ষার গানও শুনতে পাওয়া যায়। (হাটগোবিন্দপুর রিপোর্ট, পৃ ৩৯)

জাপানী আক্রমণের আশংকায় গবরমেন্ট ১লা মে ১৯৪২ তারিখে "ডিনায়্যাল পলিসি" ঘোষণা করে। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর থেকে বরিশাল ও খুলনা জেলা এবং ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট ও ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা হয়ে মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর পর্যন্ত দক্ষিণে সমগ্র সমুদ্র উপকূল এলাকায় দশ জন ও বেশি যাত্রী বহনের উপযোগী সমস্ত নৌকা সরিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে সেগুলি আক্রমণকারী জাপানীদের হাতে না পড়ে। বহু নৌকা জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। তাতে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য মাল চালানের কাজ ও চর এলাকায় আবাদের কাজ এবং মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার কাজ বিশেষভাবে বাধা পায় ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নৌকাগুলির মালিক ও মাঝিদের যে ক্ষতি হয় সেজন্য ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে কৃষক সভা আন্দোলন করেছিল। এই নীতি প্রত্যাহার করা হয় ১৯৪৩এর জুন মাসে।

পঞ্চম সম্মেলন ঃ ডোমার

পাঁজিয়া সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রাদেশিক সম্মেলন হবার কথা ছিল বরিশাল জেলায়। ১৯৪১এ কোথাও প্রকাশ্যভাবে প্রাদেশিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা সম্ভব ছিল না। ১৯৪২ সনে যুদ্ধকে ফাশিস্ট-বিরোধী জনযুদ্ধ বলে গ্রহণ করে জাপানী আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য প্রচার ও সংগঠনের কাজ শুরু করার ফলে সরকার কৃষক সভার উপর থেকে দমন ব্যবস্থা অনেকটা শিথিল করে দেয়। ১৯৪০-৪১ সনে কৃষক সভার প্রায় দু হাজার কর্মী ও মেম্বর মামলায় জড়িত হয়েছিলেন এবং কয়েক শ দণ্ডিত হয়েছিলেন। এখন আর সে রকম কঠোরতা থাকল না। আটক বন্দীরা মুক্ত হতে লাগলেন। গ্রেপ্তারী পরোয়ানার কারণে যাঁরা গাঢাকা দিয়ে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, পরোয়ানা তুলে নেওয়ায় তাঁরাও বেরিয়ে আসতে লাগলেন।

এই সময় জুন মাসে (১৯৪২) রংপুর জেলার ডোমারে পঞ্চম প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বর্ষার সময় সম্মেলন। স্বাভাবিক অবস্থাও ফিরে আসেনি। তার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি করা সম্ভব হয়নি। তখনো অনেক নেতৃস্থানীয় কমরেড বাইরে ছিলেন না, জেলে বা গোপনে ছিলেন বলে তাঁরা যোগ দিতে পারেননি। কোন রকমে সম্মেলনের কাজ সারতে হয়েছিল। সে সময়ে প্রাদেশিক সভার প্রাথমিক মেম্বর ছিল ৩৫ হাজার।

এর কিছুদিন পরে সত্যিই জাপানী আক্রমণ আরম্ভ হল। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ইত্যাদি জেলায় বিভিন্ন শহরের উপর এবং যুদ্ধ ঘাঁটির উপর জাপানী ফাশিস্টরা বোমা বর্ষণ করতে লাগল। ২০শে ডিসেম্বর কলকাতার উপর প্রথম বোমা পড়ে। ঐ মাসে পরে আরো চার দিন এই আক্রমণ চলে। তখন লক্ষ লক্ষ আতংকিত মানুষ কলকাতা শহর ত্যাগ করে বাইরে গ্রামাঞ্চলে বা বাংলার বাইরে চলে যেতে থাকে। শহরে একটা বিপর্যয়ের অবস্থা এসে পড়ে।

বোমাবর্ষণের ফলে এই কদিনে শহরের ক্ষতি সামান্যই হয়েছিল। কিন্তু অনিষ্ট অনেক বেশি হয়েছিল মানুষের মনোবল নষ্ট হাওয়ার কারণে; বর্মার বিপর্যয় দেখে লোকে ইংরেজ সরকারের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আস্থাহীন হয়ে পড়েছিল। সরকার ও আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেনি। কমিউনিস্ট পার্টি, জনরক্ষা সমিতি প্রভৃতি যে চেষ্টা করেছিল তাতে শহর ত্যাগ বন্ধ করা যায়নি। ফলে যুদ্ধের কারণে নিয়ন্ত্রিত খাদ্যশস্যের দোকান বন্ধ করেও অনেক দোকানদার পালিয়ে যায়। তখন সরকারকে সে সকল দোকান দখল করে খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হয়।

সামুদ্রিক তুফান ও রিলিফের কাজ

এর কিছুদিন পূর্বে ১৬ই অক্টোবর এক ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসে পড়ে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনা জেলার সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী দক্ষিণ অঞ্চলে। প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি হতে থাকে এবং তার সঙ্গে আসে উত্তাল সামুদ্রিক তরঙ্গের বন্যা। সে বন্যা মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় সাগরতীরের বাঁধ ছাপিয়ে বহু দূর পর্যন্ত তার প্রলয়ংকর ধ্বংস লীলা বিস্তার করে। তার কবলে পড়ে মেদিনীপুর জেলায় ৩৬০০ বর্গ মাইল এলাকায় ২৩ লক্ষ অধিবাসী এবং ২৪ পরগনায় ৪০০ বর্গমাইল এলাকায় দু লক্ষ অধিবাসী।

অসংখ্য ঘরবাড়ি চুরমার হয়ে যায়, গাছপালা নির্জীব হয়ে পড়ে। লোনা জলে বিস্তীর্ণ এলাকায় কার্ত্তিকের ফসল ভরা ধান ক্ষেত বরবাদ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় ব্যাপক অঞ্চলে পানীয় জলের অভাব, আরম্ভ হয়ে যায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। এই তুফান ও তার আনুষঙ্গিক কারণে মারা যায় মোট ১৪,৫০০ মানুষ আর ১,৯০,০০০ পশু।

অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের মতো প্রাদেশিক কৃষক সভা রিলিফের আয়োজন

করে। সভা পীপ্‌ল্‌স সাইক্লোন রিলিফ কমিটি নাম দিয়ে একটি অদলীয় রিলিফ কমিটি গঠন করে সাহায্যের আবেদন জানায়। প্রাদেশিক কৃষক কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড রসুলকে এই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। (এই কমিটিই পরের বছর পুনর্গঠিত হয়ে সাধারণ ও স্থায়ী রিলিফের জন্য পীপলস রিলিফ কমিটি নাম গ্রহণ করে। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কৃষক সভার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বরাবর বজায় থেকেছে, আজও আছে।) তিনি রিলিফের কাজের জন্য ডক্টর নীরদ মুখার্জিকে সঙ্গে নিয়ে কাঁথি গিয়ে খেজুরি থানার ৩ নম্বর ইউনিয়নে রিলিফ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করে আসেন। নৃপেন সেনের পরিচালনায় এবং কনক কাঞ্জিলাল প্রভৃতির সহযোগিতায় এই কেন্দ্র স্থানীয় কৃষক ও গ্রামবাসীদের যথেষ্ট সাহায্য দেয়। ২৪ পরগনা জেলার উপর এই দুর্যোগের আঘাত অনেকটা কম ছিল। তাহলেও সেখানে বিভিন্নভাবে এই রিলিফ কমিটি সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেছিল। কমিটি ১০ হাজার টাকা, ২৬০০ খানা কাপড়, ওষুধপত্র ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ ও বিতরণ করে এবং চিকিৎসার ও রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে।

আগস্ট আন্দোলন

এই তুফান ও বন্যার পূর্বে সারা দেশে এক কঠিন রাজনীতিক সংকট দেখা দেয় ৯ই আগস্ট। ঐদিন ভোরে ভারত সরকার বোম্বাইয়ে হঠাৎ গান্ধীজি ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করে আটক রাখে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাঁরা সরকারী যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টির ব্যবস্থা করছিলেন, যদিও তাঁদের বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়নি। এই ঘটনার পরই তথাকথিত আগস্ট আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায়। অসংখ্য কংগ্রেস নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়। "করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে" (করব অথবা মরব) এই শ্লোগান তুলে কংগ্রেস কর্মীরা নানা জায়গায় থানা, ডাকঘর, সরকারী আফিস ইত্যাদি পোড়ানো বা ধ্বংস করার কাজে অগ্রসর হন, রেল তুলে ফেলেন, এমনি আরো অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কাজ করেন।

বাংলাদেশের মধ্যে এই আন্দোলনের জোর সবচেয়ে বেশি হয়েছিল মেদিনীপুর জেলায়, বিশেষত তমলুক মহকুমায়। এই আন্দোলন চলতে থাকা কালেই আসে তুফানের বিধ্বংসী হামলা। একদিকে আন্দোলন দমনের জন্য সরকারী আক্রমণ, অন্যদিকে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাত। কাঁথি ও তমলুকের কৃষক ও অন্যান্য মানুষের দুর্দশার সীমা ছিল না। বহু

লোক নিজেদের জেলা ছেড়ে বাইরে চলে যায় খাদ্যের সন্ধানে। কৃষক সভার কর্মীরা ও সমিতিগুলি সাধ্যমতো সাহায্যদানের চেষ্টা করেন।

পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হয় ফসল ওঠার মরসুমে। যেসব লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল তারা ঘরে ফিরে যায়।

ছয়

ফাশিস্ট-বিরোধী জনযুদ্ধ চলছে। বাংলা ও আসাম যুদ্ধের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। হাজারে হাজারে দেশী-বিদেশী সৈন্যদের চলাচল হচ্ছে। অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নতুন নতুন বিমান বন্দর ও রাস্তা তৈরীর কাজ চলছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে বহু অঞ্চলে কৃষকদের ঘরবাড়ি জমিজমা ছেড়ে সরে যেতে হচ্ছে ; তাদের উপযুক্ত ক্ষতি-পূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সরকারের তৎপরতা অপেক্ষা উদাসীনতাই দেখা যায় বেশি। যুদ্ধের কাজে অনেক বেকার লোকের সাময়িক কর্মসংস্থান হচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্য ও ঠিকাদারী কাজের সুযোগ বেড়ে যাচ্ছে।

এ রকম যুদ্ধের মধ্যে যে আনুষঙ্গিক আপদ-বিপদ থাকবার কথা তাও অবশ্যই আছে। অর্থনীতিক ও সামাজিক দিক থেকে কৃষকদের যখন এই বিপদের মোকাবিলা করতে হয় তখন কৃষক সভা তাদের সাহায্য করতে যায়।

ষষ্ঠ সম্মেলন ঃ নালিতাবাড়ি

এই অবস্থায় কৃষক সভা যখন সরকারী দমন পীড়ন থেকে কিছু পরিমাণে রেহাই পেয়ে মোটামুটি স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারছিল সেই সময়ে, ১০, ১১ ও ১২ই মে ১৯৪৩ তারিখে (২৬-২৮ বৈশাখ ১৩৫০) ময়মনসিং জেলার জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত নালিতাবাড়ি গ্রামে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন বসে।

সে পর্যন্ত যতগুলি প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছিল তার মধ্যে নালিতাবাড়ি সম্মেলন ছিল সবচেয়ে সংগঠিত ও বিভিন্ন দিক থেকে কর্মীদের জন্য সবচেয়ে উৎসাহজনক। জায়গাটা ছিল বাইরের জগৎ থেকে বেশ দূরে, শেরপুর টাউন থেকে হাঁটা পথে ১৩ মাইল। কাছাকাছি পাহাড় এলাকা ও আদিবাসী কৃষকদের বসতি। তখন ওদিকে বেশ বর্ষা।

সম্মেলন স্থানের নাম হয় কাইয়ুর নগর। দুটি তোরণের নাম পাঁচগাঁও ইউনিয়ন কৃষক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা মৃত কমরেড ত্রিলোচন সরকারের নামে ত্রিলোচন তোরণ এবং স্থানীয় মৃত কৃষক নেতা কমরেড নীলমণি বকসীর নামে নীলমণি তোরণ। একটি পোস্টার প্রদর্শনী খোলা হয়, তার নাম হয় সোমেন চন্দ প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন গোপাল হালদার। পোস্টারগুলির অধিকাংশ এঁকেছিলেন আর্টিস্ট মনি রায়। গানের বিষয়ে শিক্ষা দেন ও নেতৃত্ব করেন বিনয় রায়। ভলণ্টিয়ার সংগঠন ও শিক্ষার ভার ছিল কমল বসুর উপর। সম্মেলন উপলক্ষে রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন বঙ্কিম মুখার্জি।

কাইয়ুর নগর নাম হয়েছিল কাইয়ুর শহীদদের নামে। মালাবারের কাইয়ুর গ্রাম এলাকায় মালাবার স্পেশ্যাল ক্যাম্পের পুলিস গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করে ও তাদের সম্পত্তি লুট করে। তার প্রতিবাদে মিছিল হয়। একজন কনেস্টবল গ্রামের একটি কৃষক নারীকে বেইজ্জতও করে। ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীরা তাকে ইট পাথর ছুড়ে মেরে ফেলে। তখন কাইয়ুরের এই চারজন কৃষক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়: মাদাতিল আপ্পু, কুনজামবু নায়ার, আবু বকর ও চিরুকুন্দন। এ রকম অবস্থায় প্রকৃত আসামীকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব না হলেও এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত না হলেও এই খুনের মামলার বিচারে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দেবার জন্য বহু আবেদন সত্ত্বেও ২৯শে মার্চ ১৯৪৩ তারিখে কানানুর জেলে তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁদের লাস নেবার জন্য আত্মীয় স্বজন সমেত তিন হাজার লোক কানানুরে সমবেত হয় কিন্তু লাস দেওয়া হয় না। কাইয়ুর শহীদদের সম্বন্ধে বিনয় রায় গান রচনা করেন এবং তা নালিতাবাড়ি সম্মেলনে গাওয়া হয়। এই গান বাংলাদেশে ও ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়।

শহীদ সোমেন চন্দ ছিলেন ঢাকার তরুণ লেখক ও কৃষক দরদী রাজনীতিক কর্মী। তাঁকে এক রাজনীতিক মিছিলে রাজনীতিক প্রতিপক্ষের লোকে হত্যা করে।

সভার কাজের খতিয়ান

সম্মেলনে বিভিন্ন ধরনের কাজ ও প্রয়োজনের জন্য প্যাণ্ডাল ছাড়া অনেকগুলি ক্যাম্প ছিল। আর ছিল দুটি রান্নাশালা ও একটি হাসপাতাল।

সভাপতি পরিষদের মেম্বর মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, বঙ্কিম মুখার্জি, হাজি মোহম্মদ দানেশ (দিনাজপুর), ও প্রমথ ভৌমিক (খুলনা) উপস্থিত ছিলেন এবং সৈয়দ নওশের আলী আসতে পারেননি।

বাংলার মোট ২৫টি জেলা কৃষক কমিটির মধ্যে ২৩টি থেকে ১৬৯ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, নদীয়া ও বাঁকুড়া থেকে কেউ আসেননি। এর পূর্বে কোন সম্মেলনে এত বেশি প্রতিনিধি হাজির ছিলেন না। সম্মেলনের প্রস্তাবগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ছিল খাদ্য সমস্যা ও সংগঠন।

১০ই মে সম্মেলনে সভাপতি পরিষদের পক্ষ থেকে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নতুন নিবন্ধ পেশ করেন। প্রাদেশিক সভার সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড রসুল। রিপোর্টে দেশের সামগ্রিক অবস্থা এবং বিশেষ করে সাংগঠনিক অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয় এবং পরবর্তী কালের সংগঠন সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রস্তাব দেওয়া হয়। সাংগঠনিক প্রস্তাব তারই ভিত্তিতে রচিত হয়।

রিপোর্টে খেতমজুরদের মজুরী ও কাজের সমস্যা এবং অধিকারের সমস্যাকে "এই দুইটি অত্যন্ত বড় সমস্যা" বলে স্বীকার করা হয়। আরো বলা হয়: ১৯৪০ সনে পাট চাষ কমাবার জন্য একটি আইন পাস হয় কিন্তু যুদ্ধের সময় ইংরেজ কলওয়ালাদের স্বার্থে সেবছর তা জারি করা হয়নি। ফলে পাটের দর পড়ে যায়; পাঁচমণী গাঁটের দর ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ ছিল ১১৪৸০ (১১৪.৫০) টাকা, ২ অক্টোবর হয় ৩৩৸৴০ (৩৩.৮৭)। মফস্বলের দর ছিল আরো অনেক কম, কোথাও কোথাও ৩৷৪ টাকা মণ। পাট চাষী অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে। পাটের নিম্নতম দর ১০ টাকা ধার্য করার দাবি তোলা হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ তারিখে কৃষক সভা যে "পাট দিবস" পালন করে সেই দিন নেত্রকোনায় দশ হাজার কৃষকের সমাবেশ হয়। কোন কোন জেলায় এই ধরনের সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এই উপলক্ষে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় নওশের আলী সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সাংগঠনিক অবস্থা

১৯৪০ সনে খাদ্য সংকট দেখা দিলে কৃষক সভা বহু ভুখ মিছিল সংগঠন করে এবং জোতদার মহাজনদের নিকট গিয়ে ধান কর্জ আদায় করে।

১৯৪১ সনে ঢাকায় তথাকথিত সাম্প্রাদায়িক হাঙ্গামার ফলে হিন্দু ও

মুসলিম কৃষকদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল। কৃষক সভার চেষ্টায় সে অবস্থার উন্নতি হয়। ঢাকা, ময়মনসিং ও খুলনা জেলার কতকগুলি অঞ্চলে হাঙ্গামার উপক্রম হলে কৃষক সভার চেষ্টায় তা বন্ধ করা হয়।

ফাশিস্ট-বিরোধী যুদ্ধ উপলক্ষে কৃষক সভার নেতৃত্বে বিভিন্ন জেলায় যে সব জনরক্ষা সমিতি গঠিত হয় তার মধ্যে কয়েক মাসের ভিতর মোট ১৫,৭২০ জন কৃষক ভলন্টিয়ার তালিকাভুক্ত হয়েছিল।

কংগ্রেস নেতাদের আটক রাখার ফলে যে জাতীয় রাজনীতিক সংকট দেখা দেয় তার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪২ সনের নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহকে "ঐক্য সপ্তাহ" বলে ঘোষণা করে। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবিতে সকলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। কৃষক সভা তাতে যোগ দেয়। এই সপ্তাহের প্রচারের ফলে হিন্দু-মুসলিম মিলনের পথ কিছু প্রশস্ত হয় এবং মুসলিম লীগের বাধা কমে যাওয়ার ফলে মুসলমান কৃষকরা আগের চেয়ে কৃষক সভার দিকে বেশি ঝুঁকতে থাকে।

ঐক্য আন্দোলনের সময়ে দেখা যায় খাদ্য সংকট তীব্র হয়ে উঠছে। তখন খাদ্য আন্দোলনের কাজ আরম্ভ করা হয়।

সংগঠন সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয় কৃষক সভার কর্মীদের মধ্যে "রাজনীতিক চেতনা যতটা জাগিয়াছে, গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে সাংগঠনিক চেতনা তার চেয়ে অনেক কম।...কৃষক সভা যে আগের চেয়ে অনেক বেশি রাজনীতিক চেতনা লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই তাহার সাংগঠনিক শক্তির অভাব আজ এত স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িতেছে। এই অভাব যে পরিমাণে পূরণ করা হইবে সেই পরিমাণে কৃষক সভার রাজনীতিক শক্তি প্রকাশ পাইবে।" (রিপোর্ট, নালিতাবাড়ি পৃ ১৮)

খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য

এ বছর জেলা কৃষক কমিটিগুলির মধ্যে ১৯টি জেলা বার্ষিক রিপোর্ট পাঠিয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো রিপোর্ট ছিল খুলনার। এই রিপোর্টগুলি থেকে জানা যায় ২৩টি জেলায় মার্চ মাস পর্যন্ত সক্রিয় ইউনিয়ন কমিটি ছিল ৩৪৮, নিষ্ক্রিয় ১৬৯। ২২টি জেলায় সারাক্ষণের কর্মী ৩৭৪, আংশিক কর্মী ৮০৩ (১৭টি জেলায়)। সারা বাংলায় ইউনিয়ন ছিল পাঁচ হাজারের উপর।

জেলা সম্মেলনগুলি আগের তুলনায় সংগঠিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পূর্বের নির্দেশ অনুসারে সব সম্মেলনই শেষ করা হয়েছিল ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে, কেবল একটা হয়েছিল ১৮ই। ২৫টি জেলার মধ্যে ১৬টিতে প্রকাশ্য সম্মেলন হয়েছিল, ৯টিতে হয়েছিল কেবল প্রতিনিধি ও কর্মী সম্মেলন। সমস্ত জেলা সম্মেলনেই প্রধান স্লোগান ছিল : ১৯৪৩ সনে কৃষক সভাকে গড়ে তোল। পূর্বে জেলা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য নামকরা প্রাদেশিক নেতাদের নিয়ে যাওয়া হত, কিন্তু এবার প্রাদেশিক কমিটি ব্যবস্থা করে বিভিন্ন জেলা থেকে উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ জেলা নেতাদের অন্য জেলার সম্মেলনে সভাপতিত্বের জন্য নেওয়া হবে। সেজন্য জেলা কমিটিগুলির সঙ্গে আলোচনা করে ১২ জন নেতাকে বাছাই করা হয় এবং তাঁরা যোগ্যতার সহিতই তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। তাতে প্রাদেশিক নেতৃত্ব গঠনের কাজে যথেষ্ট সাহায্য হয়।

খাদ্য সমস্যা তীব্র হচ্ছে দেখে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ও পাট চাষ কমাবার জন্য কৃষক সভা ব্যাপকভাবে প্রচার করে। সেজন্য সেচ ও জলনিকাশের জন্য খাল কাটা ও বাঁধ বাঁধা, বীজ ধান সংগ্রহ ও সরবরাহ করা, পতিত জমি আবাদ করা ইত্যাদি কাজে সভা কৃষকদের সাহায্য করেছিল। মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ব্যাপারে এবং ঋণ সালিসীর ব্যাপারেও কৃষকদের সাহায্য করা হয়েছিল। কিন্তু খেতমজুরদের মজুরী বৃদ্ধির ও ভাগচাষীদের দাবি পূরণের জন্য বিশেষ কিছু করা হয়নি। কেবল খুলনার ঘাটভোগ ইউনিয়নে সমিতির চেষ্টায় কিছু মজুরী বৃদ্ধি হয় এবং ভাগচাষীদের তেভাগা দাবির আন্দোলনও কিছু পরিমাণে সফলতা লাভ করে। এই দুটি বিষয়ে আন্দোলনের জন্য এবং কৃষক কর্মীদের তালিম দেবার জন্য প্রস্তাব করা হয়।

সংগঠন তৈরির উপর গুরুত্ব

রিপোর্টে আরো বলা হয় : "কৃষক সভাকে প্রকৃত সংগঠন হিসাবে তৈরি করিতে হইলে তাহার পিছনে একটা রাজনীতিক চেতনা থাকা দরকার। সেই চেতনা তাহার আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বজায় রাখিয়া তাহাকে সকল সময় সক্রিয় থাকিতে সাহায্য করিবে। এই চেতনার অভাবে কৃষক সভা কেবলমাত্র অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিতে পারে।...... (পৃ ৫৪)

"সংগঠনকে এমন ভাবে তৈরি করিতে হইবে যেন প্রাদেশিক কমিটি হইতে ইউনিয়ন কমিটি পর্যন্ত প্রত্যেকে একই নিয়মের উপর চলিতে থাকে,

একটিকে টান দিলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলিরও সাড়া পাওয়া যায়, একটির উপর আঘাত আসিলে অন্যগুলির মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যখনি যে কাজের দরকার তখনি সকলে তাহা বুঝিতে পারে। সংগঠন যখন এই অবস্থায় আসিবে তখনি প্রতিষ্ঠানের ভিতরকার যোগসূত্র ঠিকভাবে তৈরি হইবে, সমস্ত কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা কায়েম হইবে। তখন সংগঠন হইবে কৃষক শ্রেণীর রাজনীতিক চেতনাশীল সজীব ও সক্রিয় যন্ত্র।…" (পৃ ৫৫)।

"কৃষক সমিতিগুলির প্রতিদিনকার কাজের জন্য কৃষক ভলান্টিয়ার বা কৃষক বাহিনী থাকা একান্ত দরকার।…কৃষক ভলন্টিয়ারদের একটা সাময়িক দল গড়িলেই চলিবে না। যাহাতে একটা স্থায়ী, নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল কৃষক বাহিনী তৈরি করা যায় সেদিকে নজর দিতে হইবে।" (পৃ ৬২)

এই সমস্ত কাজের জন্য কয়েকটি স্পষ্ট শ্লোগানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে মূল শ্লোগান ছিল: ১৯৪৩ সনে কৃষক সভাকে গড়ে তুলতে হবে।

মোটামুটি এই সকল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই সম্মেলনের সাংগঠনিক প্রস্তাব রচিত ও গৃহীত হয়। প্রস্তাবের মধ্যে বলা হয় এখন কৃষক সভার কেন্দ্রগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকায় "এই কেন্দ্রগুলি দেশের মধ্যে একটা সাংগঠনিক শক্তি হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। সুতরাং এখন কৃষক সভার প্রত্যেকটি সমিতির কর্তব্য হইবে উহার কেন্দ্রগুলিকে মজবুত করিয়া গড়িয়া তোলা ও চারিদিকে তাহার সীমানা বাড়াইয়া দেওয়া।" (পৃ ৮০)

ভাগচাষীর দাবি

অন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল "খাদ্য সঙ্কট ও কৃষকদের দায়িত্ব" সম্পর্কে। অন্যান্য কথার মধ্যে তাতে বলা হয়, "সরকারী উদাসীনতা ও ভ্রান্ত নীতির ফলে বাজার হইতে খাদ্য উধাও হইয়াছে।…কিন্তু আজ দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে দেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাব নাই। এই খাদ্য জমানো আছে সরকার, চোরাবাজার ও অতি লোভী মজুতকারীদের হাতে।……" (পৃ ৭৩)।

প্রস্তাবে লবণ, কেরোসিন ও বস্ত্র সমস্যার কথাও বলা হয়, কারণ এই জিনিসগুলিও তখন বাজারে দুষ্প্রাপ্য ছিল।

"খাবার ফসল বাড়াও" বলে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে

অবাস্তব কথাও ছিল ; এমন বিষয় ছিল যাকে কাজে পরিণত করা কৃষক সভার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করবার জন্য কিছু সিদ্ধান্ত ছিল। এবং তার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে কিছু সাহায্যও হয়েছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে এই প্রস্তাবে কৃষকদের শ্রেণী স্বার্থের দৃষ্টির মধ্যে বেশ গলদ ছিল। সম্ভবত সেটা ছিল তখনকার জনযুদ্ধে সর্বাত্মক ঐক্য গড়ার নীতি সম্পর্কে বিচ্যুতির পরিণতি।

"ভাগচাষীদের অবস্থা"র উপর যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তাতে অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিল : "উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের এক ভাগ জমির মালিককে দেওয়া হইবে এই ভিত্তিতে সমস্ত ভাগচাষীকে সংঘবদ্ধ করা।" (পৃ ৮১)

এই সম্মেলনে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে অনেকগুলি বিষয়ে পরিবর্তন করা হয়। সভাপতি পরিষদের পাঁচজন ছাড়া প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলের সভ্য ও পদাধিকারী নির্বাচিত হন : সাধারণ সম্পাদক—আবদুল্লাহ রসুল, সহযোগী সম্পাদক—গোপাল হালদার ও মনসুর হবিব, কোষাধ্যক্ষ—ভবানী সেন এবং সভ্যগণ—মনি সিংহ, কৃষ্ণবিনোদ রায়, দীনেশ লাহিড়ী (রংপুর), সত্যনারায়ণ চ্যাটার্জি (২৪ পরগণা), শাহেদুল্লাহ (বর্ধমান) ও রণধীর দাশগুপ্ত (চট্টগ্রাম)।

১২ মে বৈকালে ছিল প্রকাশ্য সম্মেলন ও কৃষক সমাবেশ। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। পাহাড়ী নদীগুলিতে প্রবল বন্যা আসে। দূরের কৃষকদের পক্ষে সমাবেশে যোগদান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও ১৫ হাজার কৃষকের জমায়েত হয়। সবচেয়ে বেশি উদ্দীপনা সৃষ্টি করে কয়েক শ কৃষক নারী সমেত সাড়ে চার হাজার লাল টুপী পরা ও লাঠিধারী কৃষক ভলন্টিয়ারের বিশেষ সমাবেশ। সে ছিল এক প্রাণ মাতানো দৃশ্য।

কৃষক সভার জীবনে আন্দোলন ও সংগঠন সম্বন্ধে নালিতাবাড়ি সম্মেলন এক নতুন পরিস্থিতির সূচনা করে, নতুন নতুন কাজের ইঙ্গিত দেয়, কর্মী ও ভলন্টিয়ারদের মধ্যে নতুন উৎসাহ সৃষ্টি করে। পরবর্তী কালের আন্দোলন ও সংগঠনে তার সুস্পষ্ট ছাপ থেকে যায়।

সাত

নালিতাবাড়ি সম্মেলনের কিছুদিন পরে বর্ধমান জেলায় দামোদরে প্রবল বন্যা হয়। বিস্তর জমির ফসল নষ্ট হয়, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়, গবাদি পশু মারা পড়ে, অনেক জমি বালি চাপা পড়ে চাষের অযোগ্য হয়ে যায়। এই বন্যা শক্তিগড়ে রেল লাইন ভেঙে দিয়ে যুদ্ধের পরিবহণ ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। জেলা কৃষক কমিটি বিপন্ন বহু লোককে উদ্ধার করে এবং বিধ্বস্ত অঞ্চলের বিপন্ন লোকদের যথেষ্ট সাহায্য দেবার কাজ করে।

তার সঙ্গে সঙ্গেই সারা বাংলাদেশের পক্ষে ভয়ংকর বিপদের আকারে দেখা দেয় "পঞ্চাশের মন্বন্তর"—১৩৫০ সালের বা ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষ। সমগ্র বাংলার সাম্প্রতিক ইতিহাসের এই বিপর্যয়কর ঘটনার গুরুত্ব এত বেশি, বিশেষ করে সারা বাংলার কৃষক সমাজের জীবন ও জীবিকার পক্ষে, যে এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রাসংগিক হবে না। কৃষক সভার কাজের দিক থেকে বিবেচনা করলেও তার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

এই মন্বন্তর ও অন্যান্য প্রদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য ১৯৪৪ সনের জুলাই মাসে ভারত সরকার স্যর জন উডহেডকে চেয়ারম্যান করে একটি দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে। কমিশন রিপোর্ট পেশ করে এপ্রিল ১৯৪৫এ। বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত ও পৃথক রিপোর্ট দেওয়া হয়। প্রধানত এই সরকারী রিপোর্টের তথ্যের ও বক্তব্যের উপর নির্ভর করেই এখানে আলোচনা করা হচ্ছে যাতে পরিস্থিতি সম্বন্ধে কেউ অতিরঞ্জনের প্রশ্ন তুলতে না পারে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি

১৯৪১-এর আদম-শুমারী অনুসারে বাংলার সম্পূর্ণ বা প্রধানত কৃষি-নির্ভর পরিবার ছিল মোট প্রায় ৭৫ লক্ষ। তার মধ্যে ২০ লক্ষের কম পরিবারের জমি ছিল ২ থেকে ৫ একর; মোট পরিবার সংখ্যার অর্ধেকের জমি ছিল ২ একরের কম অথবা তারা জমিহীন ছিল; প্রায় ১০ লক্ষ পরিবার ছিল প্রধানত বা সম্পূর্ণ বর্গাদার; আর প্রায় ২০ লক্ষ পরিবার ছিল যারা প্রধানত

বা সম্পূর্ণ নির্ভর করত ক্ষেত খামারের কাজে যে মজুরী পেত তার উপর। তাছাড়া ৫ একরের বেশি জমি ছিল ২০ লক্ষের চেয়ে কম পরিবারের, আর তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশের ছিল ১০ একরের বেশি জমি।

১৯৪২-৪৩এ ধানের ফসল ভালো হয়নি, প্রয়োজনের তুলনায় ঘাটতি ছিল। ঘাটতি অন্যান্য বছরেও হত। তার একটা হিসাবে দেখা যায় স্থানীয় উৎপন্ন চালের দ্বারা বছরের ৫২ সপ্তাহের মধ্যে কত সপ্তাহের প্রয়োজন মিটেছিল : ১৯২৮ সনে—৪৫ সপ্তাহ ; ১৯৬৩—৪৪ ; ১৯৪১—৩৯। আর ১৯৪৩ সনে যা উৎপন্ন হয়েছিল তাতে প্রয়োজন মিটতে পারত ৪৩ সপ্তাহের : তার মধ্যে আমন ফসলে প্রয়োজন মিটত ২৯ সপ্তাহের, বোরো এবং আউশে ১৩ এবং বাইরে থেকে আমদানীর দ্বারা ১ সপ্তাহের। (দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট, বাংলাদেশ, পৃ ১১০) তাছাড়া পূর্বেকার সঞ্চয় ছিল ৬ সপ্তাহের মতো। তাহলে ১৯৪৩ সনে মোট প্রয়োজনের মধ্যে ৪৯ সপ্তাহের সরবরাহ ছিল, নিশ্চিত ঘাটতি ছিল মাত্র ৩ সপ্তাহের। (পৃ ২১১)

১৯৪২ সনের কয়েকটা দিনের হিসাবে দেখা যায় বর্ধমান জেলায় মাঝারি চালের বাজার দর ছিল মণকরা ৭৷৷০ (১৮ই নবেম্বর), ১০৷৷০ (২৫শে নবেম্বর), ১১৷৷০ (২রা ডিসেম্বর) এবং ১৪ টাকা (৭ই ডিসেম্বর)। (পৃ ৩৩)

১৯৪৩ সনে কলকাতায় মোটা চালের দর ছিল মণকরা ১৫ টাকা (৩রা মার্চ), ২১৶০ (৫ই এপ্রিল), ২৫ টাকা (১০ই মে), ৩০৷৷৵০ (১৭ই মে)। (পৃ ৪০)

১৯৪৩ সনের মে মাসের শেষ সপ্তাহে চালের মণকরা নিম্নতম দর ছিল : খুলনা জেলায় ৩০ টাকা ; বর্ধমান ২৯৸০ ; রাজশাহী ২৬৷৴০ ; ফরিদপুর ৩১ টাকা ; ত্রিপুরা (ব্রাহ্মণ বাড়িয়া) ২৫ টাকা। আর মাত্র চার মাস পূর্বে সেই বছর জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে ছিল যথাক্রমে ১০৷৵০, ১১৸০, ১৩৷০, ১২৷০, এবং ৯৷৷০। (পৃ ৪০)

দরের এই অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি দেখে বোঝা যায় যে মোট প্রয়োজনের তুলনায় সারা বছরের মধ্যে মাত্র তিন সপ্তাহের ঘাটতি থাকলে বাজারের অবস্থা এ রকম হতে পারে না, যদি তার সঙ্গে অন্য কোন বিশেষ কারণ জড়িত না হয়। এক্ষেত্রে সে কারণটা কী ছিল ?

নালিতাবাড়ি সম্মেলনের খাদ্য প্রস্তাবে যে মাসের প্রথম ভাগেই স্পষ্ট

বলা হয়েছিল যে সরকারী উদাসীনতা ও ভ্রান্ত নীতির ফলে বাজার হতে চাল উধাও হয়েছে এবং এই খাদ্য মজুত করা আছে সরকারের, চোরা-কারবারীর এবং মজুতদারের হাতে। বাজারে খাদ্যশস্যের আমদানী স্বাভাবিক না থাকায় কৃত্রিম উপায়ে অস্বাভাবিক পরিমাণে দর চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

দুর্ভিক্ষের অগ্রগতি

এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে বিভাগীয় কমিশনারদের এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের রিপোর্ট থেকে এই তথ্যগুলি পাওয়া যায়: (পৃ ২২৫-২৭)

(ক) প্রেসিডেন্সী বিভাগ: কৃষক কর্মীরা ভুখমিছিল সংগঠন করছে (২৮. ১২. ১৯৪২); কুষ্টিয়া মহকুমায় (নদীয়া জেলা) ব্যাপক দুরবস্থা দেখা দিয়েছে, খয়রাতী সাহায্য দরকার (৫. ৫. ৪৩); ২৪ পরগণায় ভয়ংকর অবস্থা। মুর্শিদাবাদে লংগরখানা খোলা হচ্ছে (১০. ৭. ৪৩); নদীয়ায় চরম দুরবস্থা দেখা দিয়েছে (১০. ৮. ৪৩); নিয়ন্ত্রিত দর নামিয়ে দেবার পরই চাল উধাও হয়ে গেছে (৯. ১০. ৪৩)।

(খ) বর্ধমান বিভাগ: বীরভূম ও বাঁকুড়ায় আমন ধানের উৎপাদন টাকায় ৬ আনা, অন্যান্য জেলাতেও অল্প (২৮. ১২. ৪২); হাওড়ায় চালের অবস্থা সংকটজনক। বাঁকুড়া, বীরভূম ও হুগলিতে রিলিফ দরকার (২৬. ২. ৪৩); দর বিনিয়ন্ত্রণের ফলে বর্ধমানে পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। অর্থনীতিক অবস্থা সংকটজনক। ধান লুটের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। কতকগুলি জায়গায় ভুখ মিছিল হয়েছে (২৮. ৩. ৪৩); দাম কমানো আর সরবরাহ নিশ্চিত করা না হলে গুরুতর অর্থনীতিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। কাটোয়া ও উলুবেড়িয়া মহকুমায় টেস্ট রিলিফের চাল নাই (২৭. ৪. ৪৩.); আমন রোয়ার পরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। পুষ্টির অভাবে অনেকে মারা গেছে। শহরে দুঃস্থের দল আসছে (১৭. ৮. ৪৩); কাঁথিতে মৃতের সংকার করা সমস্যা হয়ে পড়েছে (২৭. ৯. ৪৩); বর্ধমানে চাল নাই। মেদিনীপুরে চালের অভাবে লংগরখানা মাঝে মাঝে বন্ধ থাকছে (২৮. ৯. ৪৩)।

(গ) রাজশাহী বিভাগ: ব্যবসাদাররা ফটকাবাজির জন্য কেনার দরুন চালের দর বেড়ে গেছে (১১. ১২. ৪২); রাজশাহী, মালদহ ও পাবনায় আমনের উৎপাদন খারাপ (১২. ১. ৪৩); এই বিভাগ থেকে

চাল বেআইনী ভাবে চালান করা হচ্ছে (২৫. ২. ৪৩); দিনাজপুর ও রংপুরে ধান লুটের ঘটনা ঘটেছে (২৬. ৩. ৪৩); পাবনায় ভিখারী আর জমিহীনের দল উপবাসের মুখে, সদর ও সিরাজগঞ্জে খয়রাতী সাহায্য চাই (৬. ৫. ৪৩); মালদহ ছাড়া অন্য সব জেলায় অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে। নিলফামারি মহকুমায় দারুণ দুরবস্থা (২৬. ৯. ৪৩); পাবনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও বগুড়ায় লংগরখানা খোলা হয়েছে (১৫. ১০. ৪৩)।

(ঘ) ঢাকা বিভাগ: চালের দর অত্যধিক বেড়েছে। প্রত্যেক জিনিসেই মুনাফাখোরী বাড়ছে। কালোবাজার ব্যাপক (২৮. ১২. ৪২); ধান হয়নি। ব্যাপক টেস্ট রিলিফ জরুরী এবং খয়রাতী সাহায্য জুলাই পর্যন্ত চালাতে হবে (১২. ১. ৪৩); বাকরগঞ্জ জেলায় ভোলা ও বরিশাল শহর খাদ্যহীন (১০. ২. ৪৩); ফরিদপুরের গোয়ালন্দ ও সদর মহকুমায় খাদ্যের অবস্থা অতিশয় কঠিন (২৪. ৩. ৪৩); ভোলা মহকুমায় জমিহীনরা কাজের অভাবে অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়েছে। "ডিনায়্যাল" নীতির কারণে নৌকা খোয়া যাওয়াতে মৎস্যজীবীদেরও সেই অবস্থা (২২. ৫. ৪৩); ভোলা শহরে হাজার হাজার ভিখারী অনাহারে আছে (১৭. ৭. ৪৩); টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ মহকুমায় লংগরখানা চাই (১৮. ৮. ৪৩); ফরিদপুর জেলায় বহু লংগরখানা খোলা হয়েছে কিন্তু চালের সরবরাহ অত্যন্ত অল্প (১৬. ৯. ৪৩); যারা অনাহারে আছে তাদের বাঁচাবার কোন আশা নাই (২৫. ১০. ৪৩)।

(ঙ) চট্টগ্রাম বিভাগ: চালের দর হঠাৎ দ্বিগুণ হয়ে গেছে। শহরে সবরবাহের অবস্থা খুবই খারাপ (১১. ১২. ৪২); চট্টগ্রাম জেলায় মৎস্য-জীবীরা বিশেষভাবে দুরবস্থায় পড়েছে। টেস্ট রিলিফ ও খয়রাতী সাহায্য এখনি চাই (২৭. ২. ৪৩); চট্টগ্রামে অনেকে অনাহারে আছে চড়া দরের কারণে। প্রথম লংগরখানা খোলা হল (২৯. ৫. ৪৩); শহরে দুঃস্থদের ভিড় বাড়ছে, শহরেরর রাস্তায় ১১ জন মরেছে (২৮. ৬. ৪৩); ত্রিপুরা জেলায় টেস্টরিলিফ ও খয়রাতী চাই। "ডিনায়্যালের" দরুন চাঁদপুরও দুরবস্থায় পড়েছে। (১১. ৭. ৪৩); চট্টগ্রাম শহরে বহু নিঃস্ব ব্যক্তি অসুস্থ ও অক্ষম হয়ে পড়েছে। দরিদ্র সদন, অনাথালয় ও হাসপাতাল খোলা হয়েছে (১০. ৮. ৪৩); চট্টগ্রাম শহরে আরো লোক মারা যাচ্ছে

(৯. ৯. ৪৩); কণ্ট্রোল দর চলছে না। মধ্যবিত্তরা কষ্টে পড়েছে (৯. ১০. ৪৩)।

সরকারের গাফিলতি

এই সমস্ত সরকারী রিপোর্ট থেকেই পরিষ্কার দেখা যায় যে ১৯৪২এর শেষ দিক থেকেই বিপদের ইংগিত ছিল। আমন ফসল ওঠার পরই, ১৯৪৩ সনের শুরুতেই অবস্থা শোচনীয় হতে থাকে। ব্যবসায়ীদের মজুতদারী, মুনাফাখোরী ও ফটকাবাজি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চট্টগ্রামে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি মে মাসেই প্রকট হয়ে পড়ে। জুন মাসে সারা জেলায় অনাহার মৃত্যু ঘটতে থাকে। শহরে নিঃস্বরা আসতে থাকে, মরতে থাকে। সেখানে লংগরখানাও খোলা হয়েছিল, নোয়াখালিতেও হয়েছিল, কিন্তু সংকট ঘোষণা করা হয়নি। জুনের শেষেই বাংলার কতকগুলি অংশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। (পৃ ৪১) কিন্তু সরকার সে অবস্থা বিবেচনা করে উপযুক্ত নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি।

খাদ্যসঙ্কট দূর করবার উপায় ছিল উৎপাদকদের থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে যাদের খাবার প্রয়োজন তাদের সরবরাহ করা এবং দর আর চড়তে না দেওয়া। কিন্তু সে ব্যবস্থা করা হয়নি। সরকারী ধার্য দর অচল হয়ে যায়। ১১ মার্চ ১৯৪৩ তারিখে কণ্ট্রোল দর বাতিল করা হয়। অমনি বাজারে সরবরাহ বেড়ে যায়। গমের সর্বোচ্চ দর ধার্য করা হয়েছিল ১৯৪১এর ডিসেম্বরে। তাও প্রত্যাহার করা হয় ১৯৪৩ এর জানুয়ারির শেষে। (পৃ ৩৯)

১৮ মে অবাধ বাণিজ্য আরম্ভ হয়। তখনি দর বেশ পড়ে যায় কিন্তু তার পরই আবার চড়ে। পরে আবার আগস্টে দর কণ্ট্রোল ও সর্বোচ্চ দর ধার্য করা হয়। (পৃ ১৪৮) দুর্ভিক্ষ কমিশনার নিযুক্ত করা হয় সেপ্টেম্বর মাসে। তখন কিন্তু অবস্থা মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

দুর্ভিক্ষের সঙ্গে মহামারী

এই দুর্ভিক্ষের আঘাত সকল জেলার উপরেই পড়েছিল কিন্তু সবচেয়ে বেশি পড়েছিল যুদ্ধ ফ্রন্টের নিকটবর্তী চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির উপর। গ্রামের গরিবরা খাদ্য কিনতে পারত না, অনাহারে থাকত। জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ বা ৬০ লাখ লোক গুরুতর ঘা খেয়েছিল। গ্রামের লোক খাদ্যের সন্ধানে দলে দলে শহরের দিকে চলেছিল। কলকাতায় নিঃস্বদের ভিড় সর্বাধিক হয়েছিল অক্টোবর মাসে, তখন এক লক্ষ নিঃস্ব ছিল। নবেম্বরের শেষ নাগাদ

এই সব ক্ষুধিতের দল প্রায় সবই কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল ফর্সল কাটার মরসুমে কাজ করবার জন্য। ১৯৪৪ সনে ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হয়েছিল।

কিন্তু তখন আবার মহামারীর আক্রমণ চলতে থাকে। ম্যালেরিয়া, আমাশয়, উদরাময় ও কলেরার প্রকোপ বেড়ে যায়। জীবনীশক্তিহীন রিক্ত ও নিঃস্ব মানুষগুলোই মরে বেশি। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় অন্য লোকে বাঁচত কিন্তু তারা সেরে উঠত না, সহজেই মারা পড়ত। ১৯০০-১৯০১ সনের দুর্ভিক্ষের পর এবং তারও আগে ১৮৭৬-৭৭ এর দুর্ভিক্ষের পরও দেখা গিয়েছিল ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় অন্য লোকে সেরে উঠত কিন্তু দীর্ঘ অনাহারের পর ম্যালেরিয়া ধরলে চিকিৎসায় কাজ হত না।

সারা বাংলাদেশে এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে পড়ে মারা গিয়েছিল ১৫ লক্ষ মানুষ। (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নরবিজ্ঞান বিভাগের সমীক্ষা রিপোর্টে ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল বলে ঘোষণা করা হয়।) (পৃ ১২২)

দুর্ভিক্ষের ফলাফল

পঞ্চাশের মন্বন্তরের মূল কারণ ছিল এই : ১৯৪২ সনে আমন ধানের উৎপাদন কম হয়েছিল, ধান চালের দর ছিল অত্যন্ত চড়া। মজুতদাররা দর চড়িয়ে প্রভূত মুনাফা অর্জন করেছিল। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের মধ্যে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। নৈতিক ও সামাজিক জীবন এবং শাসন ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়েছিল। (পৃ ১০৭)

দুর্ভিক্ষ কমিশন সুপারিশ করেছিল : আরো স্থায়ী মূল্য নীতি নির্ধারণ ও জারি করা। দুর্নীতি দমনের জন্য এই তিন দিকে আরো জোরালো ব্যবস্থা : দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তি ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গের জন্য শাস্তি ব্যবস্থা, এবং সকল রকম দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন।

আরো সুপারিশ ছিল : সরকারী ও বেসরকারী লোক নিয়ে প্রাদেশিক খাদ্য উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন এবং বৃহত্তর কলকাতার জন্য পৃথক সংগঠন। জেলাগুলিতেও উপদেষ্টা কমিটি কায়েম করা। (পৃ ১৬৪)

কমিশন একটা বিষয়ে বিশেষ কোন মন্তব্য করতে চায়নি। তখন যে যুদ্ধ চলছিল এবং যুদ্ধের কারণে দেশে যে পরিস্থিতি ছিল তার কারণে কর্তৃপক্ষ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য নিজেরাও নজর দেয়নি, অপরকেও সেজন্য অনেক সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় কাজ করতে দেয়নি। সরকার বরং কতকগুলি

অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর কাজ করে পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। সেদিক থেকে যুদ্ধ কর্তৃপক্ষের দায়িত্বও কম ছিল না।

কমিশন সুপারিশ যা করেছিল তাকে কাজে পরিণত করার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা হয়নি। চেষ্টা লীগ মন্ত্রীসভাও করেনি, দেশ বিভাগের পর পশ্চিম বাংলার স্বাধীন কংগ্রেস সরকারও করেনি। বরং কংগ্রেস সরকার দুর্নীতি দমন না করে তাকে কার্যত উৎসাহই দিয়ে এসেছিল, দুর্নীতি-বিরোধী জনমত সংগঠনের আন্দোলন যারা করতে চেয়েছিল তাদের বাধাও দিয়েছিল। স্বভাবতই তার পরিণতি হয়েছে সমগ্র সমাজ জীবনে ও শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে ঘুষের কারবার, মজুতদারী ও মুনাফাখোরীর সংগঠিত প্রভাব, দ্রব্যমূল্যের অবাধ ঊর্ধ্বগতি। এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক জীবনের নৈতিক অধোগতি।

এই কারণে খাদ্য সংকট ও মূল্য সংকটকে ক্রমাগত তীব্রতর করে তুলে সাধারণ মানুষের জীবনকে বিষময় ও অসহায় করে তোলা হয়েছে।

ফজলুল হকের বক্তব্য

এই দুর্ভিক্ষ ও বাংলা সরকারের নীতি প্রসঙ্গে এখানে ফজলুল হক সাহেবের কিছু বক্তব্য ও মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। এ. কে. ফজলুল হক মার্চ ১৯৩৭ থেকে ডিসেম্বর ১৯৪১ পর্যন্ত বাংলাদেশে কৃষক-প্রজা সরকারের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তারপর ১২ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। তখনকার গবর্নর সার জন হারবার্ট প্রায় জোর করে ২৮ মার্চ ১৯৪৩ তারিখে হক সাহেবকে পদত্যাগ করান এবং ২৪ এপ্রিল ১৯৪৩ তারিখে খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করান।

ফজলুল হক সাহেব ৫ জুলাই ১৯৪৩ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ তারিখে বিধান সভায় দুটি বিবৃতি দিয়ে বলেন যে কতকগুলি প্রশাসনিক ঘটনা সম্পর্কে গবর্নর প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তাঁকে উপেক্ষা করে স্থায়ী কর্মচারীদের দ্বারা যে সমস্ত কাজ করিয়েছিলেন এবং ফেনীর সানোয়া গ্রামে (নোয়াখালি জেলা) ও ১৯৪২ এর কংগ্রেস আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলায় নারীধর্ষণ সম্বন্ধে যেভাবে সরকারী তদন্তে আপত্তি করেছিলেন, তাই নিয়ে দু জনের মধ্যে দারুণ বিরোধ দেখা দেয়।

এই বিরোধের কারণে যুদ্ধের সময় গবর্নর কতকগুলি বিষয়ে সরকারী

নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে মন্ত্রীসভাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে কাজ করেন এবং শুধু মিলিটারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সলা পরামর্শ করতে থাকেন। তারই একটা ফল ছিল নৌকা সরাবার নীতি যা খাদ্য উৎপাদনের ও সরবরাহের কাজে বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল।

একই ভাবে ধান চাল ক্রয় ও সংগ্রহের জন্য সরকারের একচেটিয়া অধিকারের নীতি নির্ধারিত হয়, এবং সেই নীতিকে কার্যকরী করবার জন্য মাত্র কয়েকটি বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়। তারা ইচ্ছামতো দরে ধানচাল ক্রয় করে এবং এই সংগ্রহের যে পদ্ধতি ছিল তার মারফত প্রচুর সরকারী অর্থ চুরি ও লুট করার সুযোগ দেয়।

হক সাহেবের মতে "প্রধানত একচেটিয়া ব্যবসাদারদের মারফতে মফস্বলে এই বেপরোয়া ভাবে খাদ্য ক্রয় করার কারণে" দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল। তিনি বলেন ১৯৪৩ এর মে মাসে স্যার আজিজুল হক এবং লীগ মন্ত্রীসভার নাজিমুদ্দীন ও সুহরাওয়ার্দি সাহেব প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে তখন বাংলাদেশে খাদ্যের ঘাটতি ছিল না। তাসত্ত্বেও যে এমন মারাত্মক দুর্ভিক্ষ হল, তার জন্য স্বভাবতই গবর্নর, আমলাতন্ত্র ও মিলিটারি কর্তৃপক্ষই ছিল দায়ী। ("Bengal Today", Gupta Rahman & Gupta, Calcutta, 1944.)

আট

নালিতাবাড়ি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রাদেশিক কৃষক কমিটি কর্মী শিক্ষার আয়োজন করে। একটি শিক্ষা কোর্স প্রস্তুত করা হয়। কোর্সের মধ্যে প্রধান বিষয় ছিল ছটি : (১) বর্তমান জাতীয় রাজনীতি ও কৃষক সভার আন্দোলন, (২) বৃটিশ আমলে কৃষকের অবস্থা ও কৃষক আন্দোলন, (৩) কৃষক সভার গতি ও বিকাশ, (৪) খাবার ফসল বাড়াও আন্দোলন ও তার রাজনীতি, (৫) কৃষক সভার সংগঠন ও তার রাজনীতি, এবং (৬) কৃষক সংক্রান্ত আইন।

এই কোর্স অনুসারে প্রথম কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক কর্মী শিক্ষার ইস্কুল কলকাতায় ২৩ থেকে ২৯ জুলাই (১৯৩৩) পর্যন্ত এক সপ্তাহ চলে। এই ইস্কুলে ২৭ জন ছাত্র যোগ দেন বিভিন্ন জেলা থেকে। তাঁরা সকলেই ছিলেন বিভিন্ন জেলার নেতৃস্থানীয় কর্মী।

ক্লাসগুলি নিয়েছিলেন যথাক্রমে : ভবানী সেন, গোপাল হালদার, মনসুর হবিব, আবদুল্লাহ রসুল, তুষার চ্যাটার্জি, মারুফ হোসেন ও মনি রায়। মনি রায় পোস্টার লেখার কায়দা শেখান। মারুফ হোসেন শিক্ষা দেন গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে। ছটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি বাদে বাকি পাঁচটি এবং গোচিকিৎসার বিষয়টি কোর্সের মধ্যে ছাপানো হয় সংক্ষিপ্ত নোটের আকারে।

এর পর সারা প্রদেশকে চারটি অঞ্চলে বা "জোনে" ভাগ করে চারটি ইস্কুল পরিচালনা করা হয়। এইগুলি ছিল (১) পূর্ববঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ ও সুরমা উপত্যকার সিলেট জেলা)—ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার রশিদাবাদে; (২) উত্তরবঙ্গ (রাজশাহী বিভাগ)—দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়িতে; (৩) মধ্যবঙ্গ (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)—নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে; এবং (৪) পশ্চিমবঙ্গ (বর্ধমান বিভাগ)—হুগলী জেলার কমলাপুরে। কৃষ্ণনগরে ক্লাস নেন মনসুর হবিব। বাকি তিনটি নেন আবদুল্লাহ রসুল।

এই শিক্ষা ব্যবস্থা সারা প্রদেশে কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের অগ্রগতিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই সময় থেকে আন্দোলন ছাড়া সংগঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হতে থাকে।

সপ্তম সম্মেলন ঃ ফুলবাড়ি

প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২৯শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২রা মার্চ ১৯৪৪ তারিখে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি বন্দরে (বর্তমানে পাকিস্তানে)। এবার সভাপতি মণ্ডলী গঠিত হয় পাঁচজনের পরিবর্তে এই তিনজনকে নিয়ে: আবদুল্লাহ রসুল, গোপাল হালদার ও মনি সিংহ। এখন থেকে কমরেড রসুল আর প্রাদেশিক কৃষক কমিটির সম্পাদক থাকলেন না। তাঁর পরিবর্তে সম্মেলনে সম্পাদক নির্বাচিত হলেন মনসুর হবিব।

সম্মেলন রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। ২৪টি জেলা থেকে মোট চার শ'র অধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে প্রাদেশিক কৃষক কমিটির মেম্বার ছিলেন ৬৫ জন। সম্মেলন উপলক্ষে ২রা মার্চ যে কৃষক সমাবেশ হয় তাতে দু হাজার নারী সমেত প্রায় ৩০ হাজার কৃষক সমবেত হয়। তাদের মধ্যে বহু কৃষক দূর দূর থেকে পায়ে হেঁটে মিছিল করে আসে। বিশেষ করে ৪৫০ জন কৃষকের একটি মিছিল আসে প্রায় ৮০ মাইল হেঁটে। সমবেত সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি ব্যাখ্যা করার পর গণ সঙ্গীতের ও গণ নাট্য অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

বিদায়ী সম্পাদক কমরেড রসুল প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রাদেশিক কমিটির বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন এবং সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষ থেকে তৎকালীন নীতি ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করে একটি নিবন্ধও পেশ করেন। এই নিবন্ধে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রভাব থেকে গ্রাম বাংলাকে রক্ষা করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বিস্তৃত আলোচনার পর সংশোধিত আকারে নিবন্ধটি গৃহীত হয়।

সম্মেলনে আসাম প্রাদেশিক কৃষক সভা, কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও সোবিয়েত সুহৃদ সমিতির তরফ থেকে অনেক মিত্র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের দাবি

ফুলবাড়ি সম্মেলন হয় দুর্ভিক্ষের পর। মহামারীর অবস্থা তখনো চলছে। খাদ্য ও ওষুধের, বিশেষ করে কুইনিনের বণ্টনের ব্যাপারে অনেক বিশৃংখলা

ও দুর্নীতি চলছে। এই সম্মেলন সিদ্ধান্ত করে, সরকারকে পাঁচ কোটি মণ চাল কিনতে হবে, সমস্ত শহরে রেশনিং চালু করতে হবে, কুইনিনের চোরা কারবার বন্ধ করতে হবে এবং পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড কুইনিন বণ্টন করতে হবে। দুঃস্থদের জন্য কর্মকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির রেশনিং ব্যবস্থা করে ফুড কমিটি মারফত বণ্টন করতে হবে, দুর্ভিক্ষের বছরে কৃষকদের যেসব জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল তা ফেরত দেওয়াতে হবে। তাছাড়া পূর্ববঙ্গে যে কচুরি পানার উপদ্রবে বিস্তর জমির ফসল নষ্ট হচ্ছিল অথচ বাঁশ ও নৌকার অভাবে তা রক্ষা করা যাচ্ছিল না, সেই উপদ্রব থেকে ফসল রক্ষার আবেদন জানান হয়।

এই বছর লবণের ঘাটতি এত বেশি হয় যে তার চোরা কারবার শুরু হয়ে যায় এবং ২—২॥ টাকা সের বিক্রী হতে থাকে। কৃষক ভলন্টিয়ারদের একটা দৈনন্দিন কাজ হয় হাটে হাটে ও অন্যত্র চোরা লবণ ধরা। চিনি ও কেরোসিন সম্বন্ধেও সংকট দেখা দেয়।

জমি ফেরত সম্বন্ধে সরকার একটা অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল, তাতে ব্যবস্থা ছিল এই যে উর্ধ্ব পক্ষে ২৫০ টাকা পর্যন্ত দরে যে সব জমি বিক্রী হয়েছে তা দাম ফেরত দিলে ফেরত পাওয়া যাবে। কিন্তু টাকা ফেরত দেবার ক্ষমতা তখন খুব কম কৃষকের ছিল। ফলে সামান্যমাত্র হস্তান্তরিত জমি ফেরত পাওয়া গিয়েছিল।

সম্মেলনে প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলের মেম্বর ও কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছিলেন সভাপতি পরিষদের তিনজন মেম্বর ছাড়া মনসুর হবিব (সাধারণ সম্পাদক), বগলা গুহ ও শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (সহযোগী সম্পাদক), মুজফ্ফর আহ্মদ, বঙ্কিম মুখার্জি, আবদুর রাজ্জাক খাঁ, কৃষ্ণবিনোদ রায়, রণধীর দাশগুপ্ত, বিভূতি গুহ, শচীন্দ্র ঘোষ, ও সুধীর মুখার্জি। (প্রাদেশিক কৃষক সভার সাংগঠনিক পত্র, ২২ এপ্রিল ১৯৪৪।) কমরেড রসুলকে সারা ভারত কৃষক সভার কাজে বাংলার বাইরে থাকতে হবে বলে স্থির হওয়ায় তাঁকে কাউন্সিলে রাখা হয়নি।

সাংগঠনিক কাজের উন্নতি

সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিকে কাজে পরিণত করবার জন্য পরে উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রায় প্রত্যেক জেলায় জেলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে জেলার কাজের প্রোগ্রাম

স্থির করা হয়। জেলা সম্মেলনগুলিতে পূর্বের তুলনায় বেশি বেশি প্রতিনিধি যোগদান করেন; নোয়াখালি জেলা সম্মেলনে ৩১টি ইউনিয়ন থেকে ৫৩৫ জন প্রতিনিধি হাজির হন।

সংগঠনের উন্নতির ফলে রিলিফ ও অন্যান্য কাজ ভালোভাবে করা যায়। যশোহর জেলায় দুটো খাল বেঁধে প্রায় ২৭ হাজার বিঘা জমি চাষের উপযোগী করে তোলা হয়। সাংগঠনিক অবস্থার উন্নতির জন্য জেলা থেকে নিয়মিত কাজের রিপোর্ট পাঠানোর উপর জোর দেওয়া হয়, সেজন্য ফরম ছাপানো হয় এবং বিভিন্ন জেলার কাজ সম্বন্ধে সাংগঠনিক পত্রে আলোচনা করা ও ভুলত্রুটি সংশোধন করা হয়।

১৩, ১৪ ও ১৫ মে ১৯৪৪ তারিখে প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলের সভায় সাংগঠনিক, আন্দোলনগত ও অন্যান্য বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। সাংগঠনিক পত্রে (১ জুন ১৯৪৪) বলা হয়েছে: "মেডিকেল ও অন্যান্য রিলিফ, গ্রাম্য জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ফসল বাড়ানো, মজুত বিরোধী ও খাদ্য বরাদ্দের জন্য আন্দোলন, সম্মেলন, সভ্য সংগ্রহ এবং কৃষক সমিতির সংগঠনকে শক্তিশালী করিবার প্রচেষ্টা—এই সবের ভিতর দিয়াই বর্তমানে জেলায় জেলায় কৃষক আন্দোলনের কাজ চলিতেছে। ...জেলাগুলিতে বিশেষ করিয়া এই [রিলিফ] কাজের ভিত্তিতে কৃষক সমিতি প্রসার লাভ করিতেছে।"

উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে গরিব কৃষকদের সাহায্য করবার জন্য গাঁতা প্রথায় চাষ অনেক অঞ্চলে বেশ কার্যকর হয়েছিল। ১৯৪৩এর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পর বলদ, বীজ ও মজুর সমস্যা বিভিন্ন জেলায় প্রকট হয়ে ওঠে। বলদের অভাবে অনেকে চাষ করতে পারেনি। গাঁতা প্রথায় তারা সে অসুবিধা কতক পরিমাণে দূর করতে পেরেছিল।

নদীয়া জেলার একটি এলাকায় তিনটি গ্রামে সাতটি গাঁতা দল তৈরি হয়। প্রত্যেক দলের সঙ্গে ৭০।৭৫ পরিবার জড়িত থাকে এবং চার থেকে ন'খানা পর্যন্ত লাঙ্গল থাকে। এদের মধ্যে ১৫টি পরিবারের হাল বলদ কিছুই ছিল না। কিন্তু গাঁতা দলে যোগ দেওয়ার ফলে তারা চাষের সুযোগ পেয়েছিল।

এই সময়ে বিভিন্ন জেলায় চালের দর খুব বেড়ে যায়—১৮ থেকে ২৮।৩০ টাকা মণ পর্যন্ত ওঠে। তাই কাউন্সিল জনগণকে আহ্বান দেয় খাদ্য অভিযান

করতে, মজুত উদ্ধার ও সামগ্রিক বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি করে এবং দেশবাসীর একতা গড়ে তুলে দেশকে বাঁচাতে। সেই সঙ্গে ভলণ্টিয়ার দল বা কৃষক বাহিনী গঠন করার উপরও জোর দেওয়া হয়।

কৃষক বাহিনী গঠন

কৃষক বাহিনী গঠন সম্বন্ধে এই নীতি স্থির করা হয়: কমপক্ষে ১৮ বছর বয়স্ক ও সপ্তাহে অন্তত একদিন কাজ করতে ইচ্ছুক যেকোন ব্যক্তি কৃষক বাহিনীর অঙ্গীকার পত্র মেনে নিলে বাহিনীতে যোগদান করতে পারবে। প্রত্যেক গ্রামে অন্তত ১০ জন ভলণ্টিয়ার নিয়ে একটি স্কোয়াড গঠিত হবে, প্রত্যেক ইউনিয়নে অন্তত ৩০, মহকুমায় অন্তত ২১০ ও জেলায় অন্তত ৫০০ ভলণ্টিয়ার নিয়ে বাহিনী গঠিত হবে। প্রত্যেক ভলণ্টিয়ারকে প্রাদেশিক আফিস থেকে কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত ও "কৃষক বাহিনী" লিখিত ব্যাজ দেওয়া হবে। প্রত্যেক পরিবার থেকে অন্তত একজন কৃষককে কৃষক বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

কাউন্সিল পাট সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাতে পাটের নিম্নতম দর দাবি করা হয় ১৮ টাকা মণ ; সরকার সে সময়ে কলকাতার বাজারের দর ১৫ টাকা ধার্য করেছিল, কিন্তু গ্রামে কৃষকরা ১০।১১ টাকার বেশি পেত না। বাংলা সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য এক আদেশ জারি করে বলেছিল ১৯৪০ সনে যত জমিতে পাট বোনা হয়েছিল তার অর্ধেক জমিতে পাট বোনা হবে এবং সেই ভাবে কৃষকদের লাইসেন্স দেওয়া হবে। সেই মোতাবেক ২৭ লাখ একরে পাট বুনে ৭২ লাখ গাঁট উৎপাদন করা হলে চটকলগুলি ২৫ লাখ গাঁট উদ্বৃত্ত পাট পেতে পারত এবং সেই উদ্বৃত্ত পাটের সুযোগ নিয়ে বাজার দর নামিয়ে দিতে পারত। এই আশংকার কথা বিবেচনা করে কৃষক কাউন্সিল প্রস্তাব করে যে চটকলগুলির প্রয়োজন যখন ৮০ লাখ গাঁট এবং আগের বছরের উদ্বৃত্ত আছে ৩৩ লাখ গাঁট তখন আর মাত্র ৪৭ লক্ষ গাঁট উৎপাদন করলেই যথেষ্ট হবে এবং সেজন্য পাট বোনা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে ১৭ লক্ষ একরে। পরে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ তারিখের সাংগঠনিক পত্রে ২০ টাকা নিম্নতম দর দাবি করা হয়েছিল।

কৃষ্টি বাহিনী গঠন

এই সময়ে "বাংলার অনেক জেলাতেই কৃষক আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে সংগীত, জননাট্য, নাচ, গান প্রভৃতি কৃষ্টিমূলক কাজ গড়িয়া

উঠিতেছে। …এই কাজে কৃষক সমিতিগুলিকে অগ্রণী হইতে হইবে এবং কৃষক সমিতির নিজস্ব তদারকে এই কৃষ্টি বাহিনীর সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। কৃষকদের মধ্যে ও গ্রামে প্রচলিত নাচ গান পরিবর্ধিত ও সংশোধিত করিয়া বা নূতনভাবে রচনা করিয়া প্রধানত কৃষকদের বা গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে শিল্পী সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দ্বারা কৃষ্টি বাহিনী সংগঠিত করিতে পারিলেই প্রকৃতভাবে উহা কৃষক আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার পক্ষে উপযোগী হইবে। "(সাংগঠনিক পত্র, ১ জুন ১৯৪৪)

কৃষক সভার সভ্যদের তালিকা যাতে এক ধরনের হয় এবং সভ্যদের পরিচয় সহজে জানা যায় সেজন্য কাউন্সিল একটি ফরম তৈরি করে তার নমুনা জেলাগুলিতে পাঠায়। ইউনিয়ন সমিতির নাম থানা ও মহকুমা সমেত পূর্ণ ঠিকানার সঙ্গে ফরমে এই বিষয়গুলির পৃথক পৃথক ঘর ছিল : সভ্যের নাম, ইউনিয়নের ক্রমিক নম্বর, রসিদ নম্বর, গ্রামের নাম, স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান, জমিহীন ভাগ চাষী, জমিহীন কৃষি মজুর, গরীব চাষী, মধ্যম চাষী, ধনী চাষী, অকৃষক (হস্তশিল্পী/অন্যান্য শ্রেণী), বয়স, নূতন, পুরাতন, তারিখ। (সাংগঠনিক পত্র, ১৭ অক্টোবর ১৯৪৪) তখন থেকে প্রাদেশিক অফিসের জন্য এই ফরমে সভ্যতালিকা পাঠাবার নিয়ম চালু করা হয় এবং তা কয়েক বছর চলে।

৪ ডিসেম্বর ১৯৪৪ তারিখের সাংগঠনিক পত্রে পূর্বেকার অন্যান্য পত্রের মতো জেলা কমিটিগুলির কাজের রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। উৎকৃষ্ট রিপোর্ট হিসাবে ময়মনসিং জেলার রিপোর্ট থেকে কিছু উদ্ধৃতি এই পত্রে দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায় এই জেলার বিভিন্ন মহকুমায় নবেম্বর সপ্তাহ (১৯৪৪) সমেত এক মাসের কাজের হিসাবের মধ্যে বলা হয়েছে : জামালপুর মহকুমায় মোট ২৪২ জন কর্মী কাজ করেছেন; বৈঠক হয়েছে ২৩৫, তাতে যোগদান করেছে ৯,৪৯৪ জন; জনসভা হয়েছে ২২, তাতে উপস্থিত ছিল ১০,৩৫০ জন। নালিতাবাড়ি থানায় ৭টি ইউনিয়নে প্রতি ঘরে প্রচার হয়েছে। বাড়ি বাড়ি প্রচার হয়েছে সারা মহকুমার ১,৮৬২ বাড়িতে। প্রচারের এই কায়দা এবং বৈঠকী সভা ও জনসভার আপেক্ষিক সংখ্যা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংগঠন গড়ে তুলতে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল।

এই ধরনের প্রচার হয়েছিল অন্যান্য মহকুমাতেও। টংক এলাকায়

১৭৪ কর্মী, ৬৮২ বৈঠকে হাজির ১৫,৮৭৭, ৯টি জনসভায় ২০০০ লোকের জমায়েত, বাড়ি বাড়ি প্রচার ২৬০ বাড়িতে, ইত্যাদি।

জামালপুরে রিলিফ হিসাবে ধর্মগোলা থেকে ১৬৬০ মণ ধান ২২টি গ্রামের দুঃস্থ পরিবারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল এবং জোতদারদের কাছ থেকে আদায় করে দেওয়া হয়েছিল ৩২৩ মণ ধান। এমনি আরো বিভিন্ন জায়গায় রিলিফ বণ্টনের হিসাব আছে। এই রিপোর্ট থেকে কৃষক ভলন্টিয়ারদের দ্বারা প্রচুর লবণ, চিনি, কেরোসিন চোরাকারবারীদের থেকে ধরার হিসাব, কর্মীদের শিক্ষার জন্য ক্লাসের বিবরণ ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সারা ভারত সভার আফিস

১৯৪৪ সনে সারা ভারত কৃষক সম্মেলন হয় অন্ধ্রের বেজওয়াড়া শহরে (এপ্রিল ১৯৪৪)। স্বামী সহজানন্দকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। কিন্তু সম্মেলনের অনেক পূর্বে থেকেই লক্ষ্য করা যায় যে তিনি কৃষক সভার রাজনীতিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে তখন পর্যন্ত গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি থেকে সরে যাচ্ছেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারে পর্যন্ত কেমন একটা নতুন অগণতান্ত্রিক্ ও বিরূপ ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। বেজওয়াড়া সম্মেলনের সময়েও তাঁকে নিয়ে কাজ করতে সকলেই বেগ পেতে থাকেন। কোন রকমে তাঁকে মানিয়ে নিয়ে সম্মেলনের কাজ করতে হয়।

স্বামীজি সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তাঁর স্থলে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন বঙ্কিম মুখার্জি। সিদ্ধান্ত হয় সারা ভারত সভার আফিস নিয়ে যাওয়া হবে বোম্বাইয়ে। কিন্তু সাধারণ সম্পাদক আফিসের দায়িত্ব নিয়ে সেখানে থাকতে রাজি হননি। তাই অন্যতম সহযোগী সম্পাদক আবদুল্লাহ রসুলকে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে বোম্বাইয়ে থাকতে হয়। তিনি দু বছর এই দায়িত্ব নিয়ে সেখানে থাকেন এবং ১৯৪৬এর আগস্ট মাসে সেই আফিস নিয়ে কলকাতা ফিরে আসেন। তখন থেকে এবং বিশেষ করে ১৯৪৭ সনে সিকান্দ্রারাউ সম্মেলনে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর থেকে ১৯৫৩ সনে কানানুর সম্মেলন পর্যন্ত সারা ভারত আফিস কলকাতায় প্রধানত তাঁর ও তাঁর সহকারী হিসাবে সুমতি মোহন মজুমদারের দায়িত্বে থাকে। কানানুর সম্মেলনের পর আফিস প্রথমে মাদ্রাজে ও পরে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

অবস্থার উন্নতি

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আক্রমণ থেকে বেঁচে উঠে বাংলার কৃষক ও গ্রামবাসী

জনগণ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে। পর বছর বাংলাদেশে ফসল ভালো হয়। তাতে অনেকটা সাহায্য হয়। কিন্তু মজুতদারী, মুনাফাখোরী ও ঘুষখোরীর যে বন্যা শুরু হয়েছিল তাকে বন্ধ করা হল না। যুদ্ধের সময় যে দুর্নীতি ঢুকেছিল বাংলার সমাজ জীবনে তার পথ রোধ করা সহজ ছিল না, তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় হয়তো সম্ভবই ছিল না। যারা দুর্নীতির কারবার করত তারা চাইত না এই পথ বন্ধ হ'ক, বরং কেউ বন্ধ করতে চাইলে বাধাই দিত। রাষ্ট্র ব্যবস্থাও ছিল তার অনুকূল।

কৃষক সভা তার প্রোগ্রাম অনুসারে সাধ্যমতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দিক থেকে সভা চেষ্টা করছিল।

অষ্টম সম্মেলন ঃ হাটগোবিন্দপুর

তখনো বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়নি। ১৯৪৫ সনের ১৩-১৪ মার্চ বর্ধমান জেলার হাটগোবিন্দপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশন হয়। পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় কৃষক কাউন্সিলের মেম্বর জালালুদ্দীন বোখারী। সভাপতি পরিষদ গঠিত হয়েছিল এই তিন জন নির্বাচিত মেম্বরকে নিয়ে : আবুল হায়াত, গোপাল হালদার ও কৃষ্ণবিনোদ রায়।

সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন সমস্ত জেলা থেকে মোট ৩২৫ জন প্রতিনিধি। তাছাড়া দর্শক হিসাবে বহু কৃষকও প্রতিনিধি সম্মেলনের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, এমন কি বিভিন্ন জেলা থেকেও বহু কৃষক হাঁটা পথে মিছিল করে এসেছিলেন। নদীয়া, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলা থেকে ৭০।৮০ মাইল হেঁটেও অনেকে এসেছিলেন। অন্তত সাত হাজার মহিলা সহ ৩০ হাজার কৃষকের সমাবেশ হয় ১৪ই বিকালে।

পোস্টার প্রদর্শনীর মধ্যে বাংলার কৃষকদের অবস্থা ও সংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। সম্মেলনকে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন দেওয়া হয়েছিল; ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, এমন কি মুসলিম লীগও সেজন্য প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গণনাট্য সংঘ এবং বিশেষ করে বিখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীলও যোগ দিয়েছিলেন।

এই সম্মেলনে বিস্তৃত আলোচনা হয় ধানের দর সম্বন্ধে। সরকার

নিম্নতম দরের পরিবর্তে উচ্চতম দর ধার্য করে দেয় মণ করা ৫৫০ থেকে ৬৫০। সম্মেলন দাবি করে বাড়তি এলাকায় ৬ থেকে ৭ টাকা আর ঘাটতি এলাকায় ৭ থেকে ৮ টাকা।। তখন বস্ত্র সংকট এমন পর্যায়ে গিয়ে পড়েছিল যে একটি প্রস্তাবে তামাম বাংলায় "বস্ত্র দিবস" (১৮ মার্চ) পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। খাদ্যের ব্যাপারে ঘুষ. চোরাকারবার ইত্যাদির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য দাবি করা হয় যে জেলা ফুড কমিটিগুলির পরিচালনার জন্য প্রাদেশিক স্তরে ফুড কমিটি গঠন করা হ'ক এবং তাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মেজরিটি চাই। সেই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে সরবরাহ বৃদ্ধি ও রেশনিং চালু করার দাবি তোলা হয়।

১০০০ ইউনিয়নে সমিতি

বর্গাদার ও খেতমজুরদের সম্বন্ধে একটা প্রস্তাবে দাবি করা হয়: বর্গা জমির মালিক চাষের খরচ অর্ধেক বহন করলে অর্ধেক ফসল ভাগ পাবে, নইলে তিনভাগের একভাগ; জমি বিলির সময় নজর নেওয়া চলবে না; কর্জা ধানের সুদ দেড়া বাড়ি থেকে কমাতে হবে এবং সরকারী গুদাম থেকে নামমাত্র সুদে তাদের কর্জ দিতে হবে। প্রস্তাবে খেতমজুর সম্বন্ধে বলা হয় প্রত্যেক ইউনিয়নে তাদের তালিকা তৈরি করতে হবে এবং ফসল বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের মজুরী সংকটের ন্যায্য মীমাংসার ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষক সমিতির অন্তর্ভুক্ত খেতমজুরদের পৃথক সংগঠন গড়তে হবে এবং তাদের জন্য বিশেষ আন্দোলন চালাতে হবে। উঠবন্দী প্রজাদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধেও দাবি তোলা হয়।

যুদ্ধের সময় গ্রামাঞ্চলের কোথাও কোথাও নারী ব্যবসা চলে। তার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করে দুর্গত ও "পতিত" নারীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারী ওয়ার্ক হাউস স্থাপন করার দাবি তোলা হয়।

সেচ, বীজ, ও সার সরবরাহের জন্য দাবির উপর এবং সুপারি ও তামাকের উপর ট্যাক্স তুলে নেবার দাবির উপর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়।

মাছের চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্যজীবীদের সরকারী সাহায্য দেওয়া এবং মৎস্যজীবীদের সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেজন্য নির্দেশ দিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলনের সময় কৃষক সভার প্রাথমিক মেম্বরের সংখ্যা ছিল ২,৫৫,১০৪। মোট ২৬টি জেলায় প্রায় ১০০০ ইউনিয়নে সভার সংগঠন ছিল। তিন হাজারের বেশি কর্মী কাজ করতেন, তার মধ্যে সারাক্ষণের কর্মী ছিলেন প্রায় এক হাজার। ১৯৪২ থেকে সংগঠনের অবস্থা উন্নতির দিকে চলছিল।

প্রাদেশিক কাউন্সিলের ১৫ জন মেম্বরের মধ্যে সভাপতি পরিষদের তিন জন বাদে নির্বাচিত হয়েছিলেন: মনসুর হবিব—সাধারণ সম্পাদক, বগলা গুহ ও অবনী লাহিড়ী—সহযোগী সম্পাদক, ভবানী সেন—কোষাধ্যক্ষ এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, বঙ্কিম মুখার্জি, বিভূতি গুহ (দিনাজপুর), রণধীর দাশগুপ্ত (চট্টগ্রাম), শচীন ঘোষ ও সুধীর মুখার্জি (রংপুর), মনি সিং (ময়মনসিং) ও আব্দুর রাজ্জাক খাঁ।

কৃষক সভা ও স্বামী সহজানন্দ

এই সম্মেলনে গৃহীত আর একটা প্রস্তাব বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি স্বামী সহজানন্দ ২৭ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি মারফত ঘোষণা করেন যে তিনি কেন্দ্রীয় কিসান কাউন্সিল, তার সাধারণ সম্পাদক (বঙ্কিম মুখার্জি), বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল ও বাংলার কয়েকটা জেলা কৃষক কমিটিকে দু মাসের জন্য সাসপেণ্ড বা বরখাস্ত করছেন। আগের বছরও তিনি অন্ধ্র কিসান কমিটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন।

পরে ৭-৮ মার্চ কলকাতায় কেন্দ্রীয় কিসান কাউন্সিলের সভা ডেকে স্বামীজির ২৭ ফেব্রুয়ারির বিবৃতি আলোচনা করা হয়। স্বামীজি সে সভায় উপস্থিত হননি। কাউন্সিল এক প্রস্তাব গ্রহণ করে বলে স্বামীজির এই শাস্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোন ক্ষমতা নাই, একমাত্র কাউন্সিলই তা করতে পারে। কাউন্সিল তাঁর বিবৃতিকে ভ্রান্ত বলে বাতিল করে দেয়।

এই প্রসংগে কয়েকটি তথ্য সহ ব্যক্তিগত ভাবে আমার কিছু বলা প্রয়োজন। স্বামীজি পলাসা সম্মেলনের পর ১৯৪০ সনে গ্রেপ্তার হয়ে হাজারিবাগ জেলে আটক থাকেন। তার পূর্বেই কৃষক সভায়, বিশেষ করে বিহারে, যে সব রাজনীতিক দল কাজ করত তাদের সম্বন্ধে তাঁর মনে কিছু বিরূপ ধারণা জন্মে। জেলে থাকতে ১৯৪১ সনে এ বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে এক চিঠি লিখে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করেন।

তখন কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী হলেও তিনি জানতেন আমি এই পার্টিতে আছি। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল।

চিঠিতে তিনি যা লেখেন তা সংক্ষেপে হল এই যে কিসান সভার কাজ ও সংগঠন সম্পর্কে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির আচরণে তিনি কঠিন আঘাত পেয়েছেন এবং ফরওয়ার্ড ব্লক তাঁকে অত্যন্ত হতাশ করেছে। এইবার "ন্যাশন্যাল ফ্রন্টারদের" (তখনো-বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের তিনি পার্টির তখনকার সাপ্তাহিক মুখপত্র ন্যাশন্যাল ফ্রন্টের নামে এই ভাবে উল্লেখ করেন) পালা, দেখি তারা কী করে। সেই চিঠির উত্তরে আমি বিস্তৃতভাবে কৃষক সভার কমিউনিস্ট কর্মীদের পক্ষ থেকে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে লিখি যে তাঁদের সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কৃষক সভার কাজে তাঁরা কোন দিন তাঁকে আঘাতও দেবেন না, হতাশও করবেন না। এই আশ্বাসের সপক্ষে আমি যে সমস্ত তথ্য ও যুক্তির অবতারণা করে-ছিলাম এবং যে আন্তরিকতার সহিত চিঠিখানা লিখেছিলাম তাতে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও প্রীত হয়েছিলেন। (এ খবর জেনেছিলাম পরে।)

পরে যখন আমরা সকলে জেল বা অজ্ঞাত বাস থেকে বাইরে বেরিয়ে আসি তখন তাঁর জেলের কোন কোন সহ-বন্দীর নিকট শুনেছিলাম যে আমার চিঠি পড়ে তিনি এত খুশী হয়েছিলেন যে তিনি নিজে আগ্রহ করে ঐ সকল বন্দীকে সে চিঠি পড়তে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, দেখ রসুল আমাকে কী চমৎকার চিঠি লিখেছে।

শেষ পর্যন্ত কৃষক সভা ত্যাগ

পরবর্তী তিন বছর যে স্বামীজি কমিউনিস্টদের সঙ্গে হৃদ্যতার সহিত মিলে কাজ করেছিলেন তার মূলে সম্ভবত এই চিঠির কিছু অবদান ছিল। ১৯৪২ এর সেপ্টেম্বর মাসে (আগস্ট আন্দোলন শুরু হবার পর) বোম্বাইয়ে কেন্দ্রীয় কিসান কাউন্সিলের সভায় অধ্যাপক রঙ্গের কিসান সভা ত্যাগ করে যাওয়ার সময়ে এবং পর বছর আগস্ট মাসে আবার যখন বোম্বাইয়ে কাউন্সিলের সভা হয় তখন কমরেড ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের কিসান সভা ত্যাগ করার সময়ে স্বামীজি তাঁর এই দুই বিশিষ্ট সহকর্মীর সরে যাওয়ার জন্য আমাদেরই মতো দুঃখিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তিনি নিজেও বেরিয়ে না গিয়ে কমিউনিস্টদের নিয়ে কাজ করাকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন।

আরো কয়েকমাস পরে ১৯৪৪ এর প্রথম দিকে কিন্তু দেখা যায় তিনিও

আর কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারছেন না। এ সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিক মত ও নীতির প্রভাব কৃষক সভার উপর যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। স্বামীজি কোন পার্টিতে ছিলেন না। সে কারণে এবং হয়তো অন্য কারণেও তাঁর মধ্যে ব্যক্তিবাদী চিন্তা ও ঝোঁক থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। এখন বিভিন্ন প্রদেশে কৃষক সভার বিস্তৃতির এবং তার সংগঠনের উপর কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবার ফলে পূর্বে তাঁর যে ব্যক্তিগত প্রভাব কৃষক সভার উপর ছিল তা স্বভাবতই আপেক্ষিক ভাবে ক্ষীণ হতে থাকল। কিন্তু কৃষক সভার বিস্তৃতিটা যে কমিউনিস্ট কর্মীদের কৃষক সভাকে সর্বত্র গড়ে তোলবার জন্য আন্তরিক ও সংগঠিত প্রচেষ্টার ফল, সে কথা চিন্তা না করে তিনি হয়তো ভাবলেন যে কমিউনিস্টরা তাঁকে সরিয়ে দিতে চায়। তার জন্য তিনি অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠনতন্ত্র বিরোধী কাজ করে কৃষক সভাকেই আঘাত দিয়ে বসলেন।

পালটা কৃষক সভা গঠন

বিষয়টা ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক, কারণ এখন তিনি খোলাখুলি সারা ভারত কৃষক সভা থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগলেন। যে ১৯৪৫ সনে নেত্রকোনায় (ময়মনসিং জেলা) সারা ভারত কৃষক সভার নবম অধিবেশনে যোগ দিলেন না। তারপরেও তাঁকে কৃষক সভায় রাখার জন্য চেষ্টা যথাসাধ্য করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত বেরিয়েই গেলেন এবং আরো পরে (১৯৪৮) "সারা ভারত সংযুক্ত কিসান সভা" গঠন করলেন।

সারা দেশে এবং বিশেষভাবে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসী সরকার যখন কৃষক আন্দোলনের ও কৃষক সভার উপর দমন পীড়নের তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে, সরকারী আমলা ও দালাল দিয়ে পালটা কৃষক সভা গঠনের চেষ্টা করছে, সেই সময়ে, ১৯৪৮ এর এপ্রিল মাসে স্বামীজি সংযুক্ত কৃষক সভা গঠনের উদ্দেশ্যে মাত্র একদিনের নোটিসে এক সভা ডাকেন। সেই সভায় সারা ভারত কৃষক সভাকে ভেঙ্গে দিয়ে একটি সর্বদলীয় কৃষক সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেন। অথচ কৃষক সভার উপর সরকারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সেখানে একটি প্রতিবাদের কথাও তোলা হয় না।

তার পূর্বে পাটনায় এক বামপন্থী সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আলাপ আলোচনা মারফত সকল দলের সম্মিলিত কর্মপদ্ধতি স্থির করা হবে, এবং

এই প্রদেশের বিভিন্ন বামপন্থী দলও মিলিত হয়ে সম্মিলিত কর্মপন্থা গ্রহণ করবে। অথচ এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সারা ভারত কৃষক সভা ও পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সভাকে মত স্থির করবার সুযোগ ও সময় না দিয়েই স্বামীজি ও তাঁর সহযোগীরা পাটনায় বামপন্থী বৈঠকের দোহাই দিয়ে হঠাৎ কৃষক সভার কোঅর্ডিনেশন (সমন্বয়) কমিটি গঠনের চেষ্টা করলেন। সেখানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক কমিটির কোন মুখপাত্র বা প্রতিনিধি ছিলেন না। কেবল কৃষক সভার পক্ষে একজনমাত্র দর্শক ছিলেন; তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকার ছিল না। তথাপি সংবাদপত্রে ("পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায়") মিথ্যা প্রচার করা হল যে প্রাদেশিক সভার "প্রতিনিধি" এই সভাকে গুটিয়ে নেবার পক্ষে মত দিয়েছেন। এই পদ্ধতি অবশ্যই কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনকে শক্তিশালী না করে দুর্বল করতে সাহায্য করে।

খাদ্য ও রিলিফের জন্য সংগঠন

হাটগোবিন্দপুর সম্মেলনের পূর্বে ১৯৪৪-৪৫ সনে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করবার জন্য কৃষক সভা বিভিন্ন জেলায় নানা উপায়ে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তার ফলে—খাল কাটা, বাঁধ-বাঁধা, পতিত জমি উদ্ধার করা ইত্যাদির ফলে—প্রায় এক লক্ষ একর বেশি জমি আবাদ করা হয়েছিল। এই কাজে কিছু সরকারী সাহায্য আদায় করা গিয়েছিল। আর পিপলস রিলিফ কমিটি ১৪ হাজার টাকা সাহায্য করেছিল।

মহামারী থেকে রক্ষার জন্য পিপলস রিলিফ কমিটি অনেক জেলায় কৃষক সমিতির সহযোগিতায় অসংখ্য লোকের চিকিৎসা করেছিল। পি আর সি-র ডাক্তার ও কর্মীদের অনাড়ম্বর চিকিৎসা ব্যবস্থা ও সহৃদয় ব্যবহার লক্ষ লক্ষ কৃষককে আকৃষ্ট করেছিল। অন্যান্য রিলিফ কমিটির সঙ্গেও কৃষক সভা সহযোগিতা করেছিল। চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্যের জন্য বেরাড় (বিদর্ভ) কৃষক সভার পক্ষ থেকে সেখানকার কৃষক নেতা ত্র্যম্বকগুরু জোশীর নেতৃত্বে একদল আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক রংপুর, ঢাকা ও ২৪ পরগনা জেলায় মোট ছ মাস কাজ করেছিলেন।

বলদ ও মজুরের অভাবে বহু ক্ষেত্রে চাষ আবাদের ক্ষতি হচ্ছিল দেখে কৃষক সভা গাঁতা প্রথায়—পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ছোট ছোট দল গড়ে—চাষের কাজ করার জন্য কৃষকদের আহ্বান জানায়, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সংকটের সময় বেশ কিছুকাল অনেক জেলায়, বিশেষত

মধ্যবঙ্গের জেলাগুলিতে কৃষকরা ভালো সাড়া দিয়েছিল এবং তার দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। তাতে তাদের মধ্যে স্বাবলম্বনের মনোভাবও জেগেছিল।

বর্ধমান জেলায় বন্যা প্রতিরোধের জন্য অজয় বাঁধের সংস্কার এবং বাঁকুড়া জেলায় শুভঙ্করী দাঁড়া সংস্কারের কাজে কৃষক সভা বিশেষভাবে চেষ্টা করে। মেদিনীপুর জেলায় সাত শ কৃষক কাঁসাই নদীর বন্যার মধ্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দু দিন দু রাত্রি অবিরাম পরিশ্রম করে বাঁধ বেঁধে ফেলে এবং প্রায় এক লক্ষ লোকের ঘরবাড়ি ও ১০ হাজার বিঘার ফসল রক্ষা করে।

খুলনা জেলায় কৃষক সভার নেতৃত্বে কৃষকরা নিজেদের চেষ্টায় বাঁধ বেঁধে ১৬ হাজার বিঘা জমি আবাদ করে। তখন জমিদাররা সেই জমিকে খাস জমি বলে দাবি করে তার ফসল কাটার জন্য লাঠিয়াল নিযুক্ত করে এবং মোল্লারহাটে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধায়। কিন্তু কৃষক সভা শান্তি ও রিলিফ কমিটি গঠন করে শান্তি স্থাপন করে, এবং দাঙ্গাবিধ্বস্তদের সাহায্যের ব্যবস্থা করে। পি. আর. সি.ও এই কাজে এক হাজার টাকা সাহায্য দেয়।

ফসল ওঠার সময় জমিদার পক্ষে লাঠিয়াল ও পুলিস থাকা সত্ত্বেও শত শত কৃষক এক মাঠে জমায়েত হয়ে ধান কাটতে থাকে। তাই দেখে জমিদার পক্ষ আর এগোতে সাহস পায় না।

বর্ধমান জেলার মংগলকোট ও আউশগ্রাম থানার ১০টি ইউনিয়নের ১৬৭ খানা গ্রামকে অজয়ের বাঁধভাঙ্গা বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করবার জন্য জেলা কৃষক কমিটির উদ্যোগে ও নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলে ১৯৪৫ সনে বিরাট জনসভা ডেকে একটি বাঁধ কমিটি গঠন করা হয়। বর্ষার মুখে জুন মাসে যখন বাঁধ মেরামতের জন্য গবর্নরের নির্দেশ পাওয়া গেল তখন মজুর পাওয়া হল কঠিন। কিন্তু কৃষক কর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে প্রায় আট শ শ্রমিককে কাজে লাগিয়ে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বাঁধ মেরামত করা হল। (হাটগোবিন্দপুর রিপোর্ট।)

ঐ বছরে প্রায় ১০০০ ইউনিয়নে কৃষক সভার সভ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। আগের বছরের ৭০০ ইউনিয়নের স্থলে ৯০০তে সমিতি ছিল। এতদিন দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে কৃষক সমিতি গঠিত হয়নি। ১৯৩৯

সনে সাধারণ সম্পাদক স্বামী সচ্চিদানন্দের সহযোগিতায় এই জেলায় সফর করে স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন কালিম্পং মহকুমায় কৃষক সভা গঠনের সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তারপরই বিশ্ব যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় গোর্খা সৈন্য সংগ্রহের ক্ষেত্র এই নেপালী অঞ্চলে সে কাজ সম্ভব হয়নি, হল যুদ্ধ শেষ হবার পর ১৯৪৫-এ, এবং তাও আপাতত শিলিগুড়ি মহকুমায়।

নয়

এই বছর (১৯৪৫) মে মাসে সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের নবম অধিবেশন বসে নেত্রকোনায়। কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনের আয়োজন ও সফলতার জন্য সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয় প্রাদেশিক কৃষক সভাকে এবং তার মধ্যে বিশেষ করে ময়মনসিং জেলা কৃষক কমিটিকে। প্রায় এক লক্ষ করে কৃষকের সমাবেশ হয় দু'দিন।

এই সম্মেলনে আদিবাসী হাজং কৃষকদের, বিশেষত হাজং মেয়েদের, এবং পার্শ্ববর্তী বৃহৎ গ্রাম বালির মুসলিম কৃষকদের যে বিপুল ও অকুণ্ঠ সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল তা ছিল সাংগঠনিক দিক থেকে সম্মেলনের সফলতার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান। তিন বছর পূর্বে কিন্তু এই হাজং মেয়েদের অধিকাংশই জীবনে কখনো রেল গাড়ি দেখেনি এবং বালির মুসলিম কৃষকদের উপর কৃষক সভার কোন প্রভাব পড়েনি। তিন বছরের মধ্যেই অবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। এই সম্মেলনও কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল।

বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি : ফাশিবাদের পরাজয়

১৯৪৫-এর মে মাসে ইয়োরোপে যুদ্ধের সমাপ্তি হল ফাশিবাদের পরাজয়ের এবং সোবিয়েত ও মিত্র শক্তিদের বিজয়ের মধ্যে। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের অবসান হল আরো চার মাস পরে, সেপ্টেম্বর মাসে। সারা পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও এক নতুন সম্ভাবনাময় যুগের উদ্ভব হল।

সারা ভারত কৃষক সভা ও তার শাখাগুলি এই যুদ্ধে বরাবরই ফাশিস্ট বর্বরদের বিরোধিতা করেছিল এবং সোবিয়েত পক্ষের জয় কামনা করেছিল, বারে বারে সোবিয়েত জনগণের ও তাদের লালফৌজের বীরত্ব ও আত্ম-ত্যাগের জন্য সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিল।

যুদ্ধের এই শুভ পরিণতি বাংলার কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছিল।

ইয়োরোপে যুদ্ধ সমাপ্তির পর আর একটি ঘটনা ঘটে। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাঁদের সঙ্গে আর মুসলিম লীগের নেতাদের সঙ্গেও বড়লাট ওয়েভেল দেশের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাদা আলোচনা আরম্ভ করেন। কংগ্রেস্ নেতাদের মুক্তির জন্য কৃষক সভা বরাবর নিয়মিত প্রচার ও আন্দোলন করেছিল এবং কংগ্রেস ও লীগের মিলিতভাবে দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্যও জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। সভা ১৯৪৩ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মারফত এই প্রচারকে বিশেষভাবে কৃষকদের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধ শেষে জনগণের অন্যান্য অংশের মতো কৃষকদের মধ্যেও একটা ধারণা জন্মেছিল যে সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী তাদের জাতীয় দাবির সহিত শ্রেণী দাবিগুলি পূরণের জন্য কিছু বৃহৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যদি তা না করে তাহলে আন্দোলন করার জন্য তাদের মধ্যে যথেষ্ট সংগ্রামী মনোভাবও ছিল, সংগ্রামের আহ্বান দিলে ভালো সাড়া পাবার সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু সম্ভবত কৃষক সভার নেতৃত্বের মধ্যে শ্রেণী চেতনা দুর্বল থাকায় অথবা পরিস্থিতির মূল্যায়ন সম্বন্ধে বিভ্রান্তি থাকায় তেমন কোন ব্যাপক সংগ্রামী ডাক দেওয়া হল না।

নতুন সরকারী আক্রমণ ও প্রতিরোধ

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণী যথেষ্ট সচেতন ছিল। যুদ্ধের সময় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে কৃষকরা নিজেদের দাবি সাব্যস্ত করবার জন্য অগ্রসর হয়েছিল সেখানে তাদের দমন করবার ব্যবস্থা করলে। যুদ্ধের পর ময়মনসিং জেলায় নতুন ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পাঠানো হল হাজং কৃষকদের দমন করতে। চার বছর পূর্বে কৃষকরা টংক প্রথা রদ করেছিল এবং মহাজনের ঋণ পরিশোধ বন্ধ করেছিল। সরকার এই সমস্ত বকেয়া এবং চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় করার জন্য নোটিস ও সার্টিফিকেট জারি করলে। কৃষকরা বকেয়া শোধ করতে অস্বীকার করলে।

সেই সঙ্গে হাজং এলাকার উত্তরে ও দক্ষিণে আসাম রাইফেল বাহিনীকে আর ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস বাহিনীকে নিযুক্ত করলে, থানাগুলিকে বহু-সংখ্যক সেপাই এনে ভর্তি করে দিলে। ক্যাথলিক খ্রিস্টান মিশনারীরা সরকারের সাহায্যে দাঁড়াল। মিশনারীদের দ্বারা বিভ্রান্ত কতকগুলি আদিবাসী গ্রাম ম্যাজিস্ট্রেট ব্যাস্টিনের পক্ষে চলে গেল। সেই সুযোগে প্রায়

১০০ খানা সংগঠিত হাজং গ্রামকে সৈন্যবাহিনী ভেঙে তছনছ করলে অথবা জ্বালিয়ে দিলে। তারা লুট ও নারীধর্ষণ করলে, ধ্বংসের তাণ্ডব চালিয়ে দিলে।

কৃষকদের প্রতিরোধ আরম্ভ হল। মিলিটারির রাইফেল, স্টেনগান, ব্রেনগান ও মেশিনগানের বিরুদ্ধে কৃষকরা তাদের আদিম ধরনের অস্ত্র নিয়ে গেরিলা যুদ্ধের কায়দা নিলে। ১৯৪৬-এর ৩১ জানুয়ারি একদল সৈন্য বাহেরাতলী গ্রামে ঢুকে পুরুষদের অনুপস্থিতির সুযোগে দুটি হাজং নারীর ইজ্জত নষ্ট করলে। দু'জন সৈন্য কৃষকবধূ সরস্বতীকে টেনে জংগলের মধ্যে নিয়ে যাবার সময় সে চীৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করে। বৃদ্ধা কৃষক নারী রাসমণির নেতৃত্বে তখন গেরিলারা তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়।

রাসমণির দায়ের আঘাতে একজন সৈন্যের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অন্য সৈন্যের গুলিতে রাসমণি শহীদ হলেন। রাসমণির হত্যাকারীকে সুরেন্দ্র সরকার বর্শার আঘাতে নিপাত করলেন। তখনি মিলিটারির বুলেটে শহীদ সুরেন্দ্রের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এই দুই বীর শহীদের আত্মদানের পর সামরিক শক্তির জোরে আপাতত কৃষকদের এই সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদী শাসক দল দমন করে দিলে। (প্রমথ গুপ্ত, মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী, পৃ ৬১-৬৪)

নবম সম্মেলন ঃ মৌভোগ

দেশের মধ্যে সংগ্রামমুখী পরিস্থিতির পরিচয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনেক পাওয়া গিয়েছিল। আগস্ট আন্দোলন সফলতা লাভ না করলেও যুদ্ধের পর জনগণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা এবং দেশের মুক্তির আকাংক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে লাল ফৌজের শক্তি ও প্রভাবের মধ্যে পূর্ব ইয়োরোপের কতকগুলি দেশ ফাশিস্ট কর্তৃত্ব বা প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিল। এসিয়ার মধ্যে জাপানের পরাজয়ের পর উত্তর কোরিয়া মুক্ত হয়েছিল এবং চীনের জনগণ তাদের মুক্তি সংগ্রামে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল।

এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় আই. এন. এ (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি) দিবস (নবেম্বর ১৯৪৫) ও রশীদআলী দিবস (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬) উপলক্ষে বিপুল কেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক শক্তি উত্তাল অভিযানের মধ্যে

দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তারপরই বোম্বাইয়ে নৌবিদ্রোহ ও তার পিছনের ব্যাপক জনসমর্থন এদেশের ব্রিটিশ শক্তিকে মূল ধরে টান দিয়েছিল। এমন কি কংগ্রেস ও লীগের নেতৃত্বকে পর্যন্ত হতভম্ব ও আতংকিত করে তুলেছিল।

কিন্তু পরিস্থিতির এই বিস্ফোরণের অবস্থা তখন প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্ব বুঝতে ভুল করেছিলেন। তাঁরা সঠিকভাবে ধরতে পারেননি এর সংগ্রামী গুরুত্ব কতখানি। এই ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছিল ২১ থেকে ২৪মে ১৯৪৬ তারিখে খুলনা জেলায় মৌভোগে তার নবম সম্মেলনের অধিবেশনে। এই সম্মেলন কৃষকদের নিকট কোন রকম সংগ্রামের আহ্বান ঘোষণা করেনি।

সম্মেলনের প্রধান প্রস্তাবের বিষয় ছিল "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ"। ভূমিরাজস্ব কমিশনের রিপোর্টের উপর পাঁজিয়া সম্মেলন (১৯৪০) যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তার তুলনায় এই প্রস্তাব ছিল নিতান্ত জোলো। এর মধ্যে সঠিক ও বাস্তববাদী দৃষ্টি ও নেতৃত্বের চেয়ে বাক্যের ছটা ছিল বেশি। প্রস্তাবটির শেষ কথা এই: "এই সম্মেলন কৃষক সমাজের নিকট এই রণ সংকেত দিতেছে, বাংলার প্রতিটি গ্রামে সমিতির মধ্যে সব কৃষকের জোট বাঁধিয়া জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও। "(মৌভোগ রিপোর্ট, পৃ ২১)

সম্মেলনের দুর্বলতা

পরবর্তী দু মাসের মধ্যে বাংলার বহু জেলায় যে ব্যাপক ও প্রবল তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়ে যায় তার সম্ভাবনা সম্বন্ধে মৌভোগ সম্মেলন চিন্তাও করতে পারেনি। অথচ ছ বছর পূর্বে, ইয়োরোপের যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর এবং এদেশে যুদ্ধের হাওয়া বইতে শুরু করার অনেক আগেই পাঁজিয়া সম্মেলন তার ডাক দিয়েছিল। পাঁজিয়া সম্মেলন ঘোষণা করেছিল: "এই দাবি অনুসারে আইন কতদিনে হইবে অথবা আদৌ হইবে কিনা তার ঠিক নাই। অথচ বর্গা চাষীরা আজ মারা যাইতেছেন। কাজেই [ভূমি রাজস্ব] কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ পাইবার দাবি লইয়া চাষীরা আজই সংঘবদ্ধ হইয়া প্রবল সংগ্রাম শুরু করিয়া দিন।" (পাঁজিয়া রিপোর্ট)

নালিতাবাড়ি সম্মেলনও (১৯৪৩) ভাগচাষী আন্দোলনের প্রোগ্রামের

মধ্যে বলেছিল : "উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ মালিককে দেওয়া হইবে, এই ভিত্তিতে সমস্ত ভাগচাষীকে সংঘবদ্ধ করা।" (নালিতাবাড়ি রিপোর্ট, পৃ ৮১)

কিন্তু মৌভোগ সম্মেলনে ভাগচাষীর স্বার্থে কোন আন্দোলনের কথা না বলে কেবল এই মন্তব্য প্রকাশ করা হল—"যত শীঘ্র সম্ভব ভাগচাষীদের ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগের অধিকার দিয়া অথবা সমস্ত রকম খরচ অর্ধেক বহন করিলেই মালিক অর্ধেক ফসলের ভাগ পাইবে এই মর্মে আইন হওয়া প্রয়োজন" (মৌভোগ রিপোর্ট, পৃ ৩৮)।

সম্মেলনের জন্য পূর্বেকার নিয়ম অনুসারে সভাপতি পরিষদ গঠনের পরিবর্তে নতুন নিয়ম অনুসারে একজন মাত্র সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি পরিষদের পক্ষ থেকে নিবন্ধ পেশ করার নিয়মও এখন উঠে যায়। সম্মেলনে সভাপতি তাঁর অভিভাষণে কেবল একটা সদিচ্ছা প্রকাশ করার মতো এই ইংগিতটুকু দিলেন : "স্বাধীনতা, খাদ্য ও জমি চাই, তাহার জন্য এখনি স্বাধীনতার ঘোষণা চাই, ব্রিটিশ সৈন্যের অপসারণের তারিখ চাই, বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই, দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা চাই—এই আওয়াজ নিয়ে সমস্ত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।" এ ছিল কেবল প্রচারের বক্তব্য, সংগ্রামের আহ্বান নয়।

কৃষক সভার আন্দোলন ও সংগঠন যে ধরনের শ্রেণী চেতনা নিয়ে আরম্ভ করা হয়েছিল তা যে ১৯৪৩ সনেই ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল নালিতাবাড়ি সম্মেলনের ও পরবর্তী সময়ের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রস্তাবাদির দৃষ্টিভংগীর মধ্যে। তার সপক্ষে একটা অজুহাত ছিল এই যে তখন ফাশিস্ট যুদ্ধের পরিপেক্ষিতে সামগ্রিক জাতীয় ঐক্য গঠনের প্রশ্নকে সামনে তুলে ধরা দরকার ছিল, যদিও এই যুক্তিটা খুব জোরালো নয়। কৃষক সভা তখন জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে কংগ্রেস ও লীগের মিলনের দাবি তুলত। এই দুর্বলতা ১৯৪৪ সনেও দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু যুদ্ধের পরে বহু সংগ্রামের, কৃষক সংগ্রামেরও, অভিজ্ঞতা হবার পরে যখন দেখা যায় যে কৃষক সম্মেলনের সিদ্ধান্তে শ্রেণী চেতনার ও সংগ্রামী আহ্বানের মধ্যে তেজ নাই, প্রাণ নাই, এমন কি তার অভাব রয়েছে, তখন

স্বভাবতই তা অস্বাভাবিক মনে হয়। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও ভাগচাষী সম্বন্ধে এই সম্মেলনের বক্তব্যের মধ্যে বরং দেখা যায় কৃষক স্বার্থের চেয়ে অকৃষক মালিকরা কী চায় সেদিকে নজর রাখা হয়েছে বেশি। কারণ জমিদারী উচ্ছেদ প্রস্তাবে সম্মেলন তার দাবিগুলি তোলবার পরই, সে সব দাবি আইনে পরিণত হলে কৃষক ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সম্পর্ক নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিতে পারে (আইনের সম্ভাবনার প্রশ্ন বিবেচনা না করেই), তার আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে ফেলে।

পুনর্গঠনের কাজ

১৯৪৫-এর আগস্টে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের দুটি জেলা বন্যা বিধ্বস্ত হবার পর কৃষক সভা পীপলস রিলিফ কমিটির সহযোগিতায় রিলিফের কাজ করে এবং সেই উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে "বন্যা সাহায্য সপ্তাহ" পালন করে।

দুর্ভিক্ষের সময় থেকে বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে যে সব কৃষক, মৎস্যজীবী, তন্তুবায় প্রভৃতি দুর্গত অবস্থায় ছিল তাদের অবস্থার পুনর্গঠনের জন্য কৃষক সভা চেষ্টা করে। সেজন্য আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ৭ই অক্টোবর (১৯৪৫) কলকাতায় এক কৃষক সমাবেশ আহ্বান করা হয় এবং তাতে সভাপতিত্ব করেন কলকাতার মেয়র। অক্টোবরের শেষে ডাঃ মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে কলকাতায় বঙ্গীয় খাদ্য, বস্ত্র ও পুনর্গঠন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যে পুনর্গঠনের দাবি নিয়ে ১লা নবেম্বর কলকাতায় ১৫ হাজার কৃষকের আর একটি জমায়েত করা হয়। তার পূর্বে জেলায় জেলায় এই বিষয় নিয়ে আন্দোলন চলতে থাকে।

কৃষক সভার এই সফল প্রচেষ্টার ফলে দুর্গত মৎস্যজীবীদের মধ্যে একটা চেতনা জাগে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে (১৯৪৫) কতকগুলি জেলায় মৎস্যজীবী সমিতি গড়ে ওঠে। কলকাতায় পুনর্গঠন সম্মেলনের সময় বঙ্কিম মুখার্জির সভাপতিত্বে বিভিন্ন জেলার মৎস্যজীবী কর্মীদেরও একটি সম্মেলন হয় এবং একটি প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। (মৌভোগ সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট।)

মৌভোগ সম্মেলনের সময় বাংলাদেশে কৃষক সভার মেম্বর ছিল ২, ১৭,-৩০৪। প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি ও সমসংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন কৃষ্ণবিনোদ রায়; গঠনতন্ত্রের সংশো-

ধনের ফলে এবার আর সভাপতি পরিষদ ছিল না। সম্মেলনের পূর্বে সভার সাংগঠনিক শৃংখলা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। জেলা ও ইউনিয়ন সমিতিগুলি ঠিক-মতো কাজ করছিল না। সম্পাদকের রিপোর্টে বলা হয়েছে এর কারণ "যুদ্ধ-কালীন উদারনীতিক সংস্কারবাদী মনোভাব"। আসল কথা এ ছিল কৃষক সভার শ্রেণী সংগ্রামের নীতি ও চেতনা সম্বন্ধে নেতৃত্বের দুর্বলতা ও দোমনাভাব এবং সমগ্র সংগঠনের মধ্যে শ্রেণী রাজনীতির অভাব।

ইতিমধ্যে "সারা বাংলায় নিলাম করিয়া বা অন্য ভাবে জমি হইতে কৃষকদের উচ্ছেদ করার ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলিতেছে। জমিদার ও জোতদারদের এইরূপ জুলুমের বিরুদ্ধে মেদিনীপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, খুলনা প্রভৃতি জেলায় সংগ্রাম চলিতেছে।" (ঐ, পৃ ৩২-৩৩) উত্তর বঙ্গে তখন আধিয়ার উচ্ছেদও চলছে। (ঐ, পৃ ৬৭)

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

মৌভোগ সম্মেলনের পর তিন মাস পূর্ণ হবার আগেই ১৬ই আগস্ট কলকাতায় ভয়ংকর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেধে যায়। দাঙ্গা ব্যাপক আকারে অন্তত পাঁচ দিন ধরে চলে এবং প্রায় সাড়ে চার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই কৃষক সভা বুঝতে পারে কৃষকদের সংগ্রামী চেতনার কথা। বর্গাদার বা আধিয়াররা তেভাগার দাবি নিয়ে লড়বার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। তাই সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪৬) প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরবর্তী ফসলের মরসুমে এই আন্দোলন শুরু করতে হবে।

কলকাতার হাঙ্গামার পরে অক্টোবর মাসে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেধে যায়, নোয়াখালি জেলায়। কিছু লোক নিহত হয়, লক্ষ্মীপুর ও রামনগর থানার অনেক বাড়ি লুট ও গৃহদাহ হয়। এলাকাটি মুসলিম-প্রধান, সেজন্য হাজার হাজার দুঃস্থ ও আতংকিত হিন্দু নিজেদের ঘরবাড়ি ও এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ব্যাপকভাবে রিলিফের প্রয়োজন দেখা দেয়। সরকারী ব্যবস্থা ছাড়া অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই কাজে অগ্রসর হয়। এ বিষয়ে কৃষক সভার কর্মীরা রেড ক্রস ও পীপলস রিলিফ কমি সহিত সহযোগিতা করেন।

এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা যখন হিন্দু ও মুসলিম কৃষক ও গ্রামবাসীদের মধ্যে ঘটেছে তখন স্বভাবতই সম্প্রদায়গতভাবে তাদের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে ওঠার কথা, শত্রুতার সম্পর্ক কায়েম হবার কথা। কাজেই এই

অবস্থায় সামনের তেভাগা আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলিম কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করা কি সম্ভব? তাদের মধ্যে একতা না থাকলে আন্দোলন আরম্ভ করা কি উচিত হবে?—এই সব প্রশ্ন অনেকেরই মনে ওঠে, অনেককে বিচলিতও করে তোলে।

হাসনাবাদ—একটা ঐতিহ্য

কিন্তু নোয়াখালি হাঙ্গামার শোচনীয় ঘটনার মধ্যে থেকে একটা আশার আলোও ভেসে আসে। বিভেদ-বিচ্ছেদ ও তিক্ততার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে মিলনের আহ্বান।

রামগঞ্জ থানার হাঙ্গামা এলাকার পাশে ত্রিপুরা জেলার সীমানা পার হয়েই হাসনাবাদ গ্রাম ও এলাকা পড়ে। কৃষক সভার নেতৃত্বে এই এলাকার অন্তত এগারখানা গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান কৃষকরা মিলিতভাবে উদ্ধার করেন ও নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দেন প্রায় তিন হাজার দুর্গত ও পলাতক নারী-পুরুষ হিন্দুকে। এই এলাকায় তখন মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা অন্তত শতকরা ৮০ জন। হিন্দু ও মুসলিম সকল অধিবাসীই নিজেদের বাড়ির এক অংশ ছেড়ে দিয়ে এই উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেয়। সেখানে তাঁরা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকেন। রাত্রেও অবাধে চলাফেরা করেন। তাঁদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী রিলিফের ব্যবস্থা করা হয়। পি. আর. সি.র মেডিক্যাল ও রিলিফ স্কোয়াড চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং পরে একটা অস্থায়ী সরকারী হাসপাতালও খোলান হয়। অবস্থা শান্ত হলে এই পলাতক উদ্বাস্তুরা নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যান।

এই অবস্থা ঘটল কেমন করে? অশান্তি ও হাঙ্গামার এলাকা থেকে মাইল দেড়েকের মধ্যেই এমন শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ কে সৃষ্টি করে দিলে? সৃষ্টি করেছিল স্থানীয় কৃষকদের শ্রেণী চেতনা ও তার ঐতিহ্য এবং সেই চেতনাকে দীর্ঘকাল লালন করে এসেছিল কৃষক শহীদের রক্ত।

সারা ভারত কৃষক সভার জন্মের অনেক পূর্বে ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলার কৃষক সমিতি গঠিত হয়েছিল এবং আন্দোলনও করেছিল। আন্দোলন ছিল জমিদার-মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক ও খাতকদের স্বার্থে। সমিতি কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত লাল পতাকাও ব্যবহার করত। প্রথম দিকে হাসনাবাদ এলাকায় মোখলেসুর রহমান, কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক, এরাদতুল্লাহ ইত্যাদি আন্দোলনের নেতৃত্ব করতেন। হাঙ্গামার পরে উদ্বাস্তুদের উদ্ধার

করা ও আশ্রয় দেওয়া সম্বন্ধেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কমরেড ভৌমিক, এরাদ-তুল্লাহ প্রভৃতি।

কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে এই অঞ্চলের কৃষক সমিতি জমিদারী-মহাজনী শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে কৃষক দাবির আন্দোলনের উপর বিশেষ জোর দেয়। কৃষকরা সমিতির ডাকে এমনভাবে সাড়া দেয় যে ইংরেজ গবরমেণ্ট তাকে দমন করবার জন্য সশস্ত্র পুলিস পাঠায়। সমিতির জেলাব্যাপী "কৃষক দিবস" পালনের ঘোষণা অনুসারে হাসনাবাদ গ্রামের হাটখোলার পাশের মাঠে ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ (৩০ মাঘ ১৩৩৮) তারিখে এক সভা ডাকা হয় এবং প্রায় পনর হাজার কৃষকের জমায়েত হয়। সশস্ত্র পুলিস এই জমায়েতের উপর গুলি চালিয়ে পাঁচজন কৃষককে হত্যা করে, অন্য অনেকে আহত হন। শহীদদের নাম: জনাব আলী (৪৫, গ্রাম কাদরা), সলিমুদ্দীন (৫০, হাসনাবাদ), চাঁদ মিয়া (৫০, বাতুয়াপাড়া), সমিরুদ্দীন (৬৫, নরপাহিয়া) এবং মকরম আলী (৫৫, নাউতলা)।

কৃষক শহীদদের রক্তধারা এবং কৃষক সমিতির এই গৌরবময় ঐতিহ্যই হাসনাবাদকে হিন্দু-মুসলিম মিলনের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। তাই ১৯৪৭ সনে প্রাদেশিক কৃষক কমিটি মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিনে (২৯ মাঘ ১৩৫৩, ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭) সারা বাংলা দেশের জেলায় জেলায় "হাসনাবাদ দিবস" পালনের নির্দেশ দেয়। তখন তেভাগা আন্দোলন চলছে।

হাসনাবাদের এই ঐক্য ও মিলনের কাহিনী কৃষক সভার নেতা ও কর্মীদের মধ্যে তেভাগা আন্দোলন সম্বন্ধে উৎসাহ ও প্রত্যয় সৃষ্টি করতে এবং কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। সেই ঐক্য ও সংগ্রামের পক্ষে অবশ্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয়েছিল যুদ্ধোত্তরকালে কৃষকদের শ্রেণী স্বার্থ-বোধ ও সংগ্রামী চেতনা। শ্রেণী শত্রুদের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক প্রচার হওয়া সত্ত্বেও সেই চেতনা সংগ্রামী কৃষক ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেনি।

তেভাগার লড়াই

কৃষক সমিতির নেতৃত্বে তেভাগার দাবিতে যথাসময়ে কৃষকদের আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ল ভাগীদার বা ভাগচাষীদের (পূর্ববঙ্গে বর্গাদার এবং উত্তরবঙ্গে আধিদার বা আধিয়ার নামে পরিচিত) মধ্যে। তাদের প্রধান সহযোদ্ধা হল খেতমজুররা। আন্দোলন হল অল্পবিত্তর

পরিমাণে ১৯টি জেলায়। সমিতির হিসাবে প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক জড়িত হল এই আন্দোলনে। আন্দোলনের প্রধান এলাকা ছিল উত্তরবঙ্গ—রংপুর, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলা—আর ২৪ পরগনা জেলার আবাদ এলাকা, যেখানে জোতদারী শোষণ ছিল সবচেয়ে তীব্র এবং বর্গাদারের সংখ্যা ছিল খুব বেশি।

ডিসেম্বরের মধ্যে ব্যাপক ভাবে আধিয়াররা ধান কাটা ও তোলার কাজ সেরে ফেলে। আন্দোলনের এই প্রথম পর্যায়ে বাধা বেশি এল না। জোতদাররা প্রথমে ধারণা করতে পারেনি যে এতকালের লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত কৃষকরা এতখানি উৎসাহী ও একতাবদ্ধ হয়ে লড়তে পারবে। কিন্তু অবস্থা দেখে তারা সরকারী সাহায্য চাইলে। বহু জায়গায় পুলিশ ক্যাম্প বসল। পুলিসী হামলা শুরু হল এবং বাড়তে লাগল। কৃষকদের সঙ্গে সংঘর্ষও বাধতে লাগল। বড় বড় জোতদারদের দালাল ও গুণ্ডারাও সক্রিয় হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে প্রকাশ পেলে আন্দোলনের দুর্বলতা। কৃষকদের সংগ্রামী চেতনার অবস্থা না বোঝার ফলে মৌভোগ সম্মেলনে তেভাগা দাবির আন্দোলনের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। কৃষক কাউন্সিল যখন আন্দোলনের সিদ্ধান্ত করলে তখনো সেজন্য উপযুক্ত প্রস্তুতির দিকে নজর দিলে না, কৃষক বাহিনী গঠনের এবং তালিম দেবার ব্যবস্থা হল না। এ রকম একটা সুস্পষ্ট শ্রেণী সংগ্রামের বিরুদ্ধে শত্রু শ্রেণীর ও সরকারের হামলা যে আসবেই তা কাউন্সিল ধারণা করতে পারলে না। শ্রেণী চেতনার অভাব না হলে তা ঘটতে পারত না।

কৃষক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত

শুধু যে কৃষক বাহিনী গড়া হয়নি তাই নয়, ১৯৪৩-৪৪ সনে যে হাজার হাজার কৃষক ভলন্টিয়ার জেলায় জেলায় সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং যারা রিলিফের ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে সাহায্য করেছিল, তাদের সংগঠনও ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে ভেঙ্গে গেল। আন্দোলনের উপর যখন পুলিসের ব্যাপক আক্রমণ চলছে, জেলায় জেলায় গুলী চলা ও হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে, লুট-তরাজ, গৃহদাহ, ঘর ভাঙ্গা ও নারী ধর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে, হাজারখানেক কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তিন হাজারের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে, তখন (১০-১৪ জানুয়ারী ১৯৪৭) প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল স্বীকার করছে যে আন্দোলন শুরু হবার সময় আক্রমণের কথা চিন্তা করা

হয়নি, লড়াইয়ের কায়দার "সমস্যা আমরা ততটা বুঝিতে পারি নাই। বুঝি নাই বলিয়াই সংগঠন ও স্বেচ্ছাবাহিনী শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করি নাই। আমলাতন্ত্র এই দুর্বলতার সুযোগে আমাদের সংগঠনের দুর্বল এলাকায় প্রথম আঘাত হানিয়াছে। গোটা আন্দোলনকেই ধ্বংস করিবার জন্য আক্রমণ শুরু করিয়াছে।" (ফসল ও জমির লড়াই, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, পৃ ৫।)

কাউন্সিল তখন সিদ্ধান্ত করে কৃষক ফৌজ গঠন করতে ও তাকে শিক্ষা দিতে হবে আর আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগ্রাম পরিষদ তৈরি করতে হবে। আরো সিদ্ধান্ত হয় যে ২৫—৩১ জানুয়ারি (১৯৪৭) দমন নীতি বিরোধী সপ্তাহ পালন করা হবে।

এই দমন ব্যবস্থা ও আন্দোলন ভাঙবার চেষ্টার জন্য কৃষক কাউন্সিল সাম্রাজ্যবাদকে অথবা লীগ (সুহরাওয়ার্দি) মন্ত্রীসভাকে বা তার শ্রেণী স্বার্থকে দায়ী করছে না, দায়ী করছে পুলিস ও আমলাতন্ত্রকে—"আমলাতন্ত্র মন্ত্রীসভারই নামকরণে উপরোক্ত জঘন্য দমন নীতি চালাইতেছে আর কোটি কোটি কৃষকের মনে, বিশেষত মুসলমান কৃষকের মনে লীগ মন্ত্রীসভার প্রতি শ্রদ্ধার আসন চুরমার করিয়া সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি হাসিল করিতেছে।"

লীগ মন্ত্রীসভার ধাপ্পাবাজি

ইতিমধ্যে মন্ত্রীসভা প্রেসনোট মারফত তেভাগা দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করে। তাই কৃষক কাউন্সিল তার প্রস্তাবে দাবি করে: "এই বছরের ফসল সম্পর্কেই যাহাতে আধির বদলে তেভাগা ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য অবিলম্বে তেভাগা অর্ডিন্যান্স জারি করা হউক।" (ঐ, পৃ ৮)

তার অল্প দিন পরেই গবরমেণ্ট জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য একটি বিল গেজটে প্রকাশ করে এবং তা বিধান সভার বাজেট অধিবেশনে পেশ করা হবে স্থির হয়। এই বিলের ভূমিকায় বলা হয়েছিল কৃষককে জমি দিতে হবে। প্রজা বলতে প্রকৃত চাষীকে বোঝাবে, রাইয়ত জমির দখলীস্বত্ব পাবে এবং সরাসরি সরকারের সহিত সম্পর্কে আসবে, মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা বন্ধ হবে, পরিবার পিছু খাস জমি ১০০ বিঘা বা মাথাপিছু পাঁচ বিঘা (যেটার পরিমাণ বেশি) রেখে বাকি খাস জমি সরকার দখল করতে পারবে এবং সেই জমি ভূমিহীন মজুর, বর্গাদার ও গরিব চাষীদের মধ্যে বিলি করা হবে। আরো বলা হয় বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা চলবে না, কমপক্ষে ফসলের তিনভাগের

দু ভাগ তার প্রাপ্য হবে এবং ভবিষ্যতে নতুন জমি বর্গা বিলি করা নিষিদ্ধ হবে।

কৃষক সভা এই বিলকে প্রগতিশীল বলে অভিনন্দন জানায়, তবে তার দোষ ত্রুটির সমালোচনাও করে। সভা এক রকম নিশ্চিত হয়েছিল যে বিলটা আইন সভায় আসবে এবং পাসও হয়ে যাবে। তার ফলে তেভাগা আন্দোলন সম্বন্ধেও কিছু শৈথিল্য এসে পড়ে। দমন পীড়ন সত্ত্বেও আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের কাজ, আধিয়ারের নিজ খামারে ধান তোলার কাজ শেষ হয়েছিল। এই বিল দেখে মনে হয়েছিল আন্দোলনের বাকি কাজও সমাধা করা যাবে, বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

কিন্তু কাজে তা ঘটল না। বিলটি গেজেটে প্রকাশ করা হলেও আইন সভায় পেশ করা হল না। আন্দোলন দমন করবার উদ্দেশ্যে ধাপ্পা দেবার জন্যই এই বিল প্রচার করা হয়ে থাকুক, অথবা লীগের ও তার সরকারের আভ্যন্তরীণ মত-বিরোধের কারণেই হ'ক, বিল পাস করা দূরের কথা, আইন সভাতে পেশ করাও হল না। পক্ষান্তরে প্রচণ্ডভাবে দমনের ব্যবস্থা করে বহু ক্ষেত্রেই আন্দোলন ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা হল। কৃষকরা ফসল ধরে রাখবার ও তেভাগা আদায় করবার জন্য সর্বত্র বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করলে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা সফল হল না।

পুলিসী হত্যাকাণ্ড ও বীরত্বপুর্ণ প্রতিরোধ

আন্দোলন যেমন ব্যাপক ও তীব্র হয়েছিল, দমন ব্যবস্থাও তেমনি ভয়ঙ্কর হল। বহু জায়গায় গুলি চলল, অনেক কৃষক শহীদ হলেন। গুলি চলল জলপাইগুড়িতে, দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর, ঠুমনিয়া, ঠাকুরগাঁও ও খাঁপুরে, ২৪ পরগনায়। আরো চলল রংপুর, ময়মনসিং ও খুলনা জেলায়। মোট ৭০ জনের বেশি কৃষক—হিন্দু, মুসলমান ও আদিবাসী পুরুষ ও নারী—প্রধানত পুলিসের গুলিতে এবং জোতদারের গুলিতেও নিহত হলেন এই আন্দোলনে। একমাত্র দিনাজপুর জেলাতেই শহীদ হলেন ৪০ জন কৃষক, গ্রেপ্তার হলেন ১২০০ এবং আহত হলেন প্রায় দশ হাজার।

এই তেভাগা আন্দোলন চলা কালে মুসলিম লীগ সরকারের পুলিস গুলি চালিয়েছিল ২২ বার, নারী ধর্ষণ করেছিল ২৪ পরগনা, রংপুর, দিনাজপুর, মেদিনীপুর ও ময়মনসিং জেলায়। বিভিন্ন জেলায় বিস্তর পুলিস ক্যাম্প বসানো হয়েছিল, তার মধ্যে দিনাজপুরেই ৩৫টি। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৩১১৯

জনকে এবং দীর্ঘকাল ধরে তাদের মামলা চলেছিল। আইন ও শৃঙ্খলার অজুহাতে সরকারের এই সমস্ত দমন ব্যবস্থার সাফাই দিতে গিয়ে লীগের মুখ্যমন্ত্রী সুহরাওয়ার্দি ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ বিধান সভায় তাঁর বিবৃতিতে স্বীকার করেছিলেন যে কেবলমাত্র খাঁপুর গ্রামেই তাঁর সশস্ত্র পুলিস ১২১ রাউণ্ড গুলি চালিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি ঐ গ্রামের ২০ জনকে হত্যা করেছিল।

এই সব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দুটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিরির বন্দর থানার বাজিতপুর গ্রামে ৪ জানুয়ারি ১৯৪৭ ভোরে নিরীহ গরিব খেতমজুর সমিরুদ্দীনের বাড়ি পুলিস এসে ঢোকে। পুলিস তাঁকে ডেকে নিয়ে যেতে চাইলে তাঁর বোন প্রতিবাদ করেন এবং পুলিস তাঁর পায়ে সংগিনের খোঁচা মেরে আহত করে। পরে জোর করে সমিরুদ্দীনকে নিকটের মাঠে নিয়ে যায়। হৈহল্লার মধ্যে অনেক লোক জুটে গেছে সেই গ্রাম ও আশপাশের গ্রাম থেকে। সাঁওতাল কৃষক জোয়ান শিবরাম তার একজন। হঠাৎ পুলিস সমিরুদ্দীনকে গুলি করে মারে, কেন কেউ জানে না। তিনি তখনি নিহত হন।

সঙ্গে সঙ্গে শিবরাম হাতের তীরধনুক চালান হত্যাকারী পুলিসকে লক্ষ্য করে। শীতের ভোরে তার মোটা ওভারকোট ভেদ করে তীর তার হৃৎপিণ্ডে গেঁথে যায় এবং সে তখনি মারা পড়ে। তারপরই অবশ্য অন্য একজন পুলিসের গুলিতে এই বীর জোয়ানও শহীদ হন।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে খাঁপুরে, এখন পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট মহকুমায়। ২১ ফেব্রুয়ারি শীতের ভোরে সশস্ত্র পুলিসের গাড়ি আসছে গ্রামে কৃষক কর্মীদের ধরপাকড়ের উদ্দেশ্যে। খবর পেয়ে খেতমজুর চিয়ারসাই শেখের নেতৃত্বে কৃষকরা গ্রামে ঢোকবার কাঁচা রাস্তা কেটে দেন। গাড়ি আর এগোতে পারে না। পুলিস গাড়ির মধ্যে থেকেই গুলি চালাতে থাকে। কৃষকরা টায়ার কেটে গাড়ি অচল করেন। প্রচণ্ড লড়াইয়ের মধ্যে খাঁপুরের অনেক কৃষক নরনারী হতাহত হন। অন্তত ১৪ জন সেখানেই মারা যান, পরে আরো আটজন হাসপাতালে মারা যান। এই একটি মাত্র ঘটনায় একখানি গ্রামের মোট ২২ জন শহীদ হন।

খাঁপুরের কৃষকদের এই বীরত্বের তুলনা নাই। লীগ সরকারের পুলিস এক সঙ্গে এতগুলি কৃষকের জীবন নিয়ে খাঁপুরকে এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছে। প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি কৃষক সভা এখানে তার বার্ষিকী পালন

করে। কৃষক সভার উদ্যোগে একটি পাকা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভও তৈরি করা হয়েছে এখানে।

এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে প্রাদেশিক কৃষক সভা থেকে আমি সেখানে যাবার জন্য ২৩শে ফেব্রুয়ারি রওনা হই। সঙ্গে ছিলেন পি. আর. সিংহ ডাক্তার বিজয় বসু বেশ কিছু পরিমাণ ওষুধ পথ্য নিয়ে এবং "জনযুদ্ধের" একজন রিপোর্টারও ছিলেন। বালুরঘাট শহর থেকে পরদিন সকালে ঘোষের গাড়িতে খাঁপুর যাবার সময় পথে জিপে করে পুলিস গিয়ে আমাদের আটকায় ও শহরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং দুমাসের জন্য বহিষ্কার আদেশ দেয়। আমরা আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পাই না।

তেভাগা চাই!

তেভাগার দাবি এমনভাবে এই কৃষকদের মাতিয়েছিল যে এটাই যেন তাদের জীবনের একমাত্র কাম্য হয়ে পড়েছিল। এ সম্বন্ধে একটি করুণ কাহিনী শুনেছিলাম। খাঁপুরের আহতদের বালুরঘাট হাসপাতালে থাকা কালে একজন যখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিলেন তখন শেষ অবস্থা বুঝে ডাক্তার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন তাঁর কী চাই। মৃত্যুপথের যাত্রী সেই আধিয়ার কৃষক ক্ষীণ কণ্ঠে তাঁর জীবনের শেষ কথা উচ্চারণ করেন, তেভাগা চাই।

তেভাগা আন্দোলনের মধ্যে ভুলত্রুটি যাই থাকুক, তার ফলাফল যাই হ'ক, বাংলাদেশের কৃষক সভার ইতিহাসে এটাই ছিল তখন পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যাপক ও শক্তিশালী আন্দোলন। তার নাম ও ছাপ আজও ব্যাপক ভাবে কৃষকদের মধ্যে রয়ে গেছে। এই আন্দোলনের দাবিকে ভিত্তি করে পরে আইন রচনাও করা হয়েছে। এই দাবিতে সংগঠিত এলাকায় ভাগ আদায়ও হয়েছে।

এই আন্দোলন কেবল বর্গাদাররা চালায়নি, ব্যাপকভাবে খেতমজুররাও তাতে যোগদান করেছিল; সমিরুদ্দীন ও চিয়ারসাই ছিলেন খেতমজুর। কিন্তু বর্গাদাররা তাদের সাহায্যে তেভাগা আদায় করলেও তারা কিছুই পায়নি; বর্গাদাররা ফসলের অর্ধেকের চেয়ে যতটা বেশি পেয়েছিল তার থেকে কিছু অংশ আদায় করে খেতমজুরদের দেবার জন্য কোন সাংগঠনিক ব্যবস্থা করা হয়নি। কৃষক সভার নেতৃত্বের দিক থেকে এই ত্রুটির জন্য অনেক খেতমজুরের একটা ন্যায়সংগত অভিযোগ থেকে গিয়েছিল। তেভাগা আন্দোলন সম্বন্ধে যে যাই বলুক, তেভাগা দাবির বিরুদ্ধে কারো কোন বক্তব্য

শোনা যায়নি। বাংলার মন্ত্রীসভা দাবি স্বীকার করে বিল পর্যন্ত প্রকাশ করেছিল। এই আন্দোলন চলা কালে গান্ধীজি যখন নোয়াখালি ভ্রমণ করছিলেন তার মধ্যে আমিশাপুরের নিকট নবগ্রামে তেভাগার দাবি ও লড়াই সমর্থন করেছিলেন (৩০ জানুয়ারি ১৯৪৭)। পরে (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭) তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন তিনি জোতদারদের পরামর্শ দেবেন স্বেচ্ছায় তেভাগা দাবি মেনে নিতে এবং তখন প্রকাশিত তেভাগা বিলকে তিনি সাম্প্রদায়িক বিষয় বলে স্বীকার করেন না। এই আন্দোলন যে যথেষ্ট সফলতা লাভ করতে পারেনি তার প্রধান কারণ তার নেতৃত্বের মধ্যে কৃষকদের শ্রেণী স্বার্থ সম্বন্ধে সংস্কারবাদী ধারণা এবং তার ফলে আন্দোলন পরিচালনা সম্বন্ধে উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও ব্যবস্থার অভাব। কিন্তু আন্দোলনের মূলে যে কৃষকদের মধ্যে তাদের শ্রেণী দাবি সম্পর্কে গভীর ও তীব্র বিক্ষোভ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ১৯৪৬ সনে কলকাতায়, বাংলা দেশে এবং সারা উত্তর ভারতে যে সমস্ত ব্যাপক ও রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছিল তাতে সরকারী হিসাবে ১২৪০৬ মানুষের মৃত্যু হয়। (Henderson , Under-Secretary of State for India, in the House of Commons on 4. 3. 1947.) শুধু বাংলাদেশেও অক্টোবর ১৯৪৬এ নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার হাঙ্গামায় ২১৬ জন হিন্দু ও একজন মুসলিম মারা যায় এবং পুলিস ও মিলিটারির গুলিতে একজন হিন্দু ও ৭৫ জন মুসলিম মারা যায়। (Parliamentary Secretary to the Chief Minister, the Bengal Assembly on 21. 4. 1947) এই অবস্থায় গভীর শ্রেণী চেতনা ছাড়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর মাত্র দু মাসের মধ্যে এমন ব্যাপক ও শক্তিশালী শ্রেণী সংগ্রাম সম্ভব হত না।

দশম সম্মেলন ঃ পাঁচথুরি

১৯৪৭ এর ২৭-২৮শে ফেব্রুয়ারি ও ১লা মার্চ তারিখে মেদিনীপুর জেলার পাঁচথুরি গ্রামে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের দশম অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণবিনোদ রায়। এই সময়ে কৃষক সভার প্রাথমিক মেম্বার ছিল সারা বাংলায় ২,০৩,৩৮২ এবং পশ্চিম বাংলায় ১,০২,০০০। (সাংগঠনিক পত্র, ৮ জুন ১৯৪৮।)

দশ

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট দেশ বিভাগ হয়ে যাবার পর সমগ্র দেশের পরিস্থিতি বদলে যায়। বঙ্গ বিভাগও হয়। পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত উত্তর বঙ্গের বহু কৃষককে তখনো তেভাগা আন্দোলন সংক্রান্ত মামলায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। তাঁদের সম্বন্ধে প্রাদেশিক কৃষক কমিটির একটা দায়িত্ব ছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে কৃষক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি আগস্ট মাসেই ঢাকা গিয়ে পূর্বপাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে আলোচনা করি। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন সরকারী কাগজপত্র সেখানে তখনো পৌঁছয়নি, পৌঁছলে তিনি বিষয়টা বিবেচনা করে একটা ব্যবস্থা করবেন।

আরো পরে, সেপ্টেম্বরের শেষে আমাকে সিলেট জেলার লাউতাবাহাদুরপুর যেতে হয়। পূর্বেকার আসামের অন্তর্ভুক্ত জেলা ও সুরমা উপত্যকার অংশ সিলেট তখন পাকিস্তানের মধ্যে। প্রভাবশালী স্থানীয় জমিদারদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে এখানকার কৃষকরা দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়েছিল। এখন পাকিস্তান হবার পর জমিদারদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করবার ও প্রতিহিংসা নেবার উদ্দেশ্যে তাদের উপর পুলিসের জুলুম চালাবার জন্য ঐ গ্রামে পুলিস ক্যাম্প বসানো হয়। পুলিস কৃষক ও গ্রামবাসীদের হয়রান ও সন্ত্রস্ত করতে থাকে। তার প্রতিকারের ব্যবস্থা তখনি কিছু করা যায়নি ঢাকায় আমলাদের কঠোর ও দাম্ভিক কৃষক সভা-বিরোধী মনোভাবের কারণে। আমি নিজেও তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে হতাশ হয়েছিলাম।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা

বঙ্গবিভাগের পর প্রাদেশিক কৃষক সভার কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা তখন থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভায় পরিণত হয়।

১৯৪৮-৪৯-এর ফসল কাটার মরসুমে বর্গাদারী সম্বন্ধে কৃষকদের অনুকূলে সামান্য একটু ব্যবস্থা করা হয় অর্ডিন্যান্স জারি করে। পরে সেই অর্ডিন্যান্স

আইনে পরিণত হয়। ১৯৫০-এর বর্গাদার আইন গেজেটে প্রচার করা হয় ১৫ মার্চ। পরে ১৯৫২ সনের ১০ অক্টোবর আর এক অর্ডিন্যান্স মারফত তার সংশোধন হয়।

বর্গাদার আইনে (১৯৫০) ব্যবস্থা থাকে এই: প্রথমে মোট উৎপন্ন ফসল থেকে বীজ ধান কেটে নিয়ে যে-পক্ষ সেই বীজ ধান দিয়েছিল সেই পক্ষকে ফেরত দেওয়া হবে। তারপর বাকি অংশের তৃতীয়াংশ করে দেওয়া হবে বর্গাদারকে ও মালিককে। পরে হালবলদ, যন্ত্র, সার, সেচ ইত্যাদির খরচ যে পক্ষ বহন করেছে তাকে, অথবা যে পক্ষ যতটা বহন করেছে সেই অনুপাতে তাকে ফসলের বাকি অংশ দেওয়া হবে। সমস্ত খরচ বহনের অগ্রাধিকার বর্গাদারের।

আরো থাকে: ভাগচাষ সালিসী বোর্ড গঠন করা হবে পাঁচ জনকে নিয়ে —দুই পক্ষের দুজন করে প্রতিনিধি এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান একজন সরকারী কর্মচারী। এই বোর্ড করবে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা।

মালিক প্রকৃতই নিজে চাষ করতে চাইলে অথবা বর্গাদার ইচ্ছাকৃত ভাবে চাষে গাফলতি করলে কিংবা মালিককে তার প্রাপ্য ভাগ না দিলে বোর্ডের অর্ডার নিয়ে তাকে উচ্ছেদ করা চলবে। কিন্তু মালিক সে জমি এক বছরের মধ্যে চাষ না করলে অথবা পাঁচ বছরের মধ্যে অন্য বর্গাদারকে বিলি করলে তা পুরোন বর্গাদারকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

নতুন পরিস্থিতি: জনগণের আশা

দেশের স্বাধীনতা লাভ করবার এবং দেশ বিভাগ হবার পর বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে। আন্দোলনের মধ্যে এক নতুন পর্যায় আরম্ভ হয়ে যায়।

পূর্বপাকিস্তান থেকে কৃষক সভার বহু হিন্দু কর্মী ও নেতা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে এখানকার আন্দোলনে যোগ দেন, অনেকে এই নতুন পরিস্থিতির মধ্যে এসে নানা কারণে আর সক্রিয় থাকতে পারেন না। ইংরেজ শাসনের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে; স্বাধীন দেশে কংগ্রেসের শাসন কায়েম হওয়ায় স্বভাবতই কৃষকদের মধ্যে নতুন আশা-আকাংক্ষা জাগে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করবার জন্য মুসলিম লীগ সরকার ১৯৪৭ এর গোড়ার দিকে যে বিল সরকারী গেজেটে প্রচার করার পরও আইন সভায় পেশ করেনি, লোকে আশা করেছিল কংগ্রেস সরকার

অবিলম্বে অন্তত সেই ধরনের একটা বিল পাস করবে। কিন্তু তা করেনি।

কৃষকদের দাবি ছিল পরিষ্কার। তারা চেয়েছিল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে বিনামূল্যে কৃষকদের জমি দেওয়া হ'ক, চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা দেওয়া হ'ক, বর্গাদারদের তেভাগা এবং জমি চাষের স্থায়ী স্বত্ব দেওয়া হ'ক, খেতমজুরদের জন্য জমি ও কাজের ব্যবস্থা করা এবং বাঁচার মতো মজুরী দেওয়া হ'ক। পাটের ও অন্যান্য ফসলের ন্যায্য দর ধার্য করা, মহাজনী ঋণ মকুব করা, দ্রব্যমূল্য কমাবার ব্যবস্থা করা, কালোবাজারী ও মুনাফাখোরী বন্ধ করা, খাদ্যসমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে ন্যায্য দরে প্রয়োজনীয় সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি দাবিও তোলা হয়েছিল।

তাছাড়া দাবি ছিল : গ্রাম্য কারিগর ও কুটীর শিল্পীদের শিল্পকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'ক. এবং মাছের চাষ বাড়াবার ও ন্যায্য দরে মাছ সরবরাহ করবার জন্য মৎস্যজীবীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া ও সেজন্য আইন করা হ'ক।

কৃষক সভা এই সকল দাবি এবং আরো অনেক দাবি সরকারের ও জনগণের সামনে তুলে ধরে এবং তার জন্য আন্দোলন করে। কংগ্রেস সরকার তাতে বিশেষ সাড়া দেয় না। ক্রমে এটা পরিষ্কার হতে থাকে যে এই সকল দাবির ভিত্তিতে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার করা, খাদ্য সমস্যার ও দর সমস্যার সমাধান করা, কৃষকদের ও কারিগরদের জীবন ও জীবিকার অবস্থার উন্নতি সাধন করা—এ সকল বিষয়ে কংগ্রেস সরকারের বা কংগ্রেস নেতাদের কোন রকম আগ্রহ নাই।

বরং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতিগতি দেখে ক্রমশ লোকের মনে একটা ধারণা জন্মে যে জমিদারী-জোতদারী শোষণকে বন্ধ করা তার অভিপ্রায় নয়; কৃষকদের শোষণের মাত্রা কমাবার জন্যও তার কোন গরজ নাই। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি কংগ্রেস ইংরেজ আমলের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূল অর্থব্যবস্থাকেই বজায় রাখতে চায়, না জনগণের স্বার্থের অনুকূল নতুন ধরনের কোন অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন মনে করে?

কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত ও প্রভাব

কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সেই সময়ে বিশেষভাবে এই চিন্তা প্রাধান্য

লাভ করে : "সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আপস করে দেশের শাসন ভার তাঁদের হাতে দিয়ে চলে গেছে। তাঁরা ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর সহযোগী হয়ে এদেশে তার পুঁজিবাদী শোষণের সঙ্গে দেশীয় পুঁজিবাদীদের শোষণের এবং জমিদার-মহাজনদের সামন্তবাদী শোষণের স্বার্থে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে চান। এই অবস্থায় দেশের লোকের কর্তব্য হচ্ছে একসঙ্গে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের এবং অন্য দিকে পুঁজিবাদী শোষণের অবসানের জন্য বিপ্লবী সংগ্রাম চালানো, যাতে সেই সংগ্রামে জয় লাভ করে দেশে সমাজবাদী রাষ্ট্র ও শোষণহীন অর্থব্যবস্থা গঠন করা যায়।

এই সিদ্ধান্ত ছিল ১৯৪৮এর ফেব্রুয়ারি-মার্চে কলকাতায় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত। এই সময়ের অনেক পূর্বেই দেশের অন্যান্য রাজনীতিক পার্টিগুলি প্রায় সকলেই সারা ভারত কৃষক সভার কাজ ছেড়ে, ধরতে গেলে কৃষক আন্দোলন ছেড়েই চলে গিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি'র কর্মীরাই তার মধ্যে কাজ করছিলেন। পশ্চিমবাংলার কৃষক সভার নেতৃত্বে ছিলেন প্রধানত তাঁরাই। ফলে তাঁদের পার্টি'র এই সিদ্ধান্ত কৃষক সভার কাজকেই প্রভাবিত করেছিল।

কিন্তু পার্টি'র এই নীতি ছিল ভ্রান্ত, সংকীর্ণতাবাদী ও হঠকারী নীতি। সেই নীতি যখন কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হল এবং জমিদার-জোতদারদের সঙ্গে ধনী কৃষককেও শত্রু বলে ঘোষণা করা হল, তখন জমিদারী-জোতদারী-মহাজনী শোষণের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বড় কৃষকরা, এমনি কি মাঝারি কৃষকরা পর্যন্ত সভার আন্দোলন থেকে ব্যাপক ভাবে সরে দাঁড়াল। থাকল কেবল ছোট ছোট রাইয়ত চাষী, ভাগচাষী ও খেতমজুররা, এবং তাদের উপরও ব্যাপক প্রভাব ছিল জোতদার-মহাজন ও ধনী কৃষকদের। বড় চাষীরা, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে মাঝারি চাষীরা পর্যন্ত আন্দোলনের বিরোধী হয়ে উঠল এবং ছোট কৃষককেও তারা নিজেদের প্রভাবের মধ্যে রাখতে সমর্থ হল।

সে সময়ে কৃষক সভা যেসব দাবি তুলেছিল তার মধ্যে ছিল তেভাগা, মজুরী বৃদ্ধি, কাজ অথবা বেকার ভাতা, দুঃস্থদের জন্য উপযুক্ত রিলিফ ইত্যাদি। তখন কৃষক সভার ব্যাপকতা কমে গেল, কৃষক সমাজের বড় একটা অংশ থেকে সভা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সভার কর্মীরা অনেকে তখনকার যৌক্তিক

"শত্রু শ্রেণীদের" বিরুদ্ধে রীতিমতো শত্রুতামূলক আচরণ করতে লাগলেন। অনেক ক্ষেত্রে জোর জবরদস্তিও শুরু হল। ১৯৪৯ সনে এবং তার পরেও কিছুদিন সভার কাজকর্ম এই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে সভা অত্যন্ত দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তার এই ভ্রান্ত নীতিরও বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়ে সরকারও কর্মীদের উপর প্রচণ্ড দমন পীড়ন চালাতে লাগল। ধরপাকড় আটক, মামলার হয়রানী সবই চলল। পুলিসের গুলিতে বহু কৃষক কর্মী ও কৃষক শহীদ হলেন। কৃষক সভার সংগঠন নিজের ভ্রান্ত নীতির ভারে প্রায় ভেঙে পড়ল।

১৯৪৯ সনে কৃষক আন্দোলনের মধ্যে পুলিসের গুলিতে বিভিন্ন জেলায় ৭২ জন কৃষক ও কর্মী নিহত হন। তার মধ্যে ছিলেন অনেক কৃষক নারী। হাওড়া, হুগলি ও ২৪পরগণা জেলায় তাঁদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। নীতির দিক থেকে গলদ যাই থাক, সংগ্রামী কৃষকেরা আন্দোলনের মধ্যে যেমন বীরত্ব প্রকাশ করেছিলেন, কৃষক সভার কর্মীরাও তেমনি তাঁদের ফেলে পালিয়ে না গিয়ে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের সুখদুঃখের ভাগী হয়েছিলেন। তার ফলে আন্দোলন আশু সাফল্য লাভ না করলেও কৃষকরা সভা ছেড়ে বেরিয়ে যায় নি, কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এসেছিল, যথাসম্ভব সাহায্য দিয়েছিল।

খেতমজুর সম্মেলন

এই নীতি নিয়ে যখন আন্দোলন ও তাকে দমন করবার জন্য সরকারী ব্যবস্থা চলছিল সেই সময়ে, ১৯৪৯এর শেষার্ধে কলকাতায় "পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক খেতমজুর সম্মেলন" আহ্বান করা হয়। সেখানে সভাপতির অভিভাষণে বলা হয়: "এ বছর তেভাগা' সংগ্রামের বিরুদ্ধে গ্রামের ধনী-কৃষক-জমিদার-জোতদার এবং তাদের কংগ্রেসী সরকার বেপরোয়া আক্রমণ চালায়। ইহাতে মাঝারি কৃষক ভীত হইয়া পড়ে।...... অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংগ্রাম কমিটির রায় ছাড়াই মাঝারি কৃষকরা জোতদার-ধনীকৃষকের সহিত আপস করিয়া লইতে চেষ্টা করে।" অর্থাৎ জোতদারদের মতো ধনী কৃষকরাও গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের দুশমন (সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ ৫)।

সম্মেলনের দাবি কত অবাস্তব তা দেখা যাবে তার প্রস্তাবের মধ্যে। "বাঁচার মতো মজুরী ও মূল দাবির প্রস্তাবে" আছে: সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রস্তাব করিয়াছে যে জীবন ধারণের উপযুক্ত মজুরীর নিম্নতম হার

প্রতি মাসে ৮০ টাকা মজুরী, ৫০ টাকা মাগগি ভাতা এবং ২০ টাকা বাড়ি ভাড়া আদায় করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুরদের এই সম্মেলন ঘোষণা করিতেছে যে যতক্ষণ না ন্যায্য মজুরীর এই নিম্নতম হার আদায় হয় ততক্ষণ পর্যন্ত খেতমজুররা অনমনীয় সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।" (ঐ, পৃ ৪৪)।"পরে··· সংবৎসরের কাজের গ্যারান্টি চাই, পুরা মজুরীতে সাত ঘণ্টার বেশি কাজ নাই। অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরী চাই ···।···সম্মেলন ঘোষণা করিতেছে যে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অংশ হিসাবে পশ্চিম বাঙলা খেতমজুর ইউনিয়ন গড়িয়া তোলা হউক।" (ঐ, পৃ ৪৬)

কৃষক সভার উপর সরকারী হামলা

১৯৪৮ সনের ২৬ মার্চ যখন কমিউনিস্ট পার্টিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেআইনী ঘোষণা করে, তারপরই প্রাদেশিক কৃষক সভার উপর সরকারী আক্রমণ শুরু করা হয়। সারাভারত কৃষক সভার আফিস তখন কলকাতায় (২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, তেতলা)। তার উপরও একই আক্রমণ চলে। সভা কার্যত বেআইনী হয়ে পড়ে, পুলিস আফিস ঘর তল্লাশী করে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে যায়। আফিসের কাজ প্রায় অচল হয়ে পড়ে। এই তল্লাশীর পর কৃষক সভার অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র ফেরত পাওয়া যায়নি।

প্রায় সাড়ে তিন বছর কাল কৃষক সভা এমনি বেআইনী অবস্থায় কাজকর্ম করতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে তার সম্মেলন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। পরবর্তী প্রাদেশিক সম্মেলন হয় ৩১ মে ও ১ জুন ১৯৫২ তারিখে ২৪ পরগণা জেলার কুমারশা গ্রামে (ক্যানিং)। এর মধ্যে তার পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয় ও ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। কর্মী ও নেতারা জেল থেকে বা গোপন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে থাকেন।

২৬ জানুয়ারী ১৯৫০ তারিখে ভারতীয় সংবিধান জারি হয়। তখন কংগ্রেস নেতারা কোন্ নীতি ও পদ্ধতি অনুসারে দেশের শাসন ব্যবস্থা চালাতে চান তার কিছু ইংগিত পাওয়া যায়, যদিও শুধু আইনের কথার মধ্যে তাঁদের মনোভাবের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয় না।

কংগ্রেস ও ভূমি সংস্কার

ভূমি রাজস্ব কমিশন বাংলার ভূমি সম্পর্কের পরিবর্তন সম্বন্ধে যে সুপারিশ করেছিল তার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনও জমিদারী প্রথা তুলে দিয়ে ভূমি সংস্কারের কথা বলে। এই কমিশনের অন্যতম

মেম্বর মনিলাল নানাবাতি তাঁর বিরোধী মন্তব্যে বলেন যে ভারতের ভূমি সংক্রান্ত সংকটের মূল কারণ হল প্রচলিত সামন্তবাদী ভূমি সম্পর্ক। এতে কোন চাষীকে জমিতে স্বত্ব দেওয়া হয়নি। ভারতে শতকরা ৭০ ভাগ জমি আছে জমিদার-জোতদারদের হাতে।

ভূমি ব্যবস্থা নিয়ে কংগ্রেস মহলে আলাপ আলোচনায় দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে এ বিষয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে। দিল্লীতে রাজস্ব মন্ত্রীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ভূমি সংস্কার সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ডিসেম্বর ১৯৪৭এ ডক্টর জে.সি. কুমারাপ্পার সভাপতিত্বে কংগ্রেস ভূমি সংস্কার কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি ৯ জুলাই ১৯৪৯এ তার রিপোর্ট দাখিল করে। রিপোর্টের সুপারিশে বলা হয় এক হাল জমিকে সচ্ছল জোত (ইকনমিক হোলডিং) ধরা হ'ক এবং জোতের সর্বোচ্চ পরিমাণ হ'ক তিন হাল জমি। (Kumarappa Report, p 8) সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন (এপ্রিল ১৯৪৮) এবং কংগ্রেসের জয়পুর অধিবেশন (ডিসেম্বর ১৯৪৮) জোতের সর্বোচ্চ সীমা (সীলিং) নির্ধারণের অনুকূলে রায় দেয়। ১৯৪৭-৪৮ সনের শীতকালীন অধিবেশনে নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম কমিটি কৃষির ক্ষেত্রে জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু যুক্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থের নেতৃত্বে যুক্ত প্রদেশ জমিদারী উচ্ছেদ কমিটি ১৯৪৮এর শেষ দিকে প্রস্তাব করে যেন জমিদারের বা রাইয়তের জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা না হয়। (D. Thorner, Agrarian Prospect in India p 46.)

১৯৫১ সনে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়ায় বর্তমান জোতগুলির সর্বোচ্চ-সীমা নির্ধারণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল ভবিষ্যতে যে সমস্ত জোত তৈরি হবে তার জন্য নির্ধারিত সীমা মেনে নিতে হবে। কিন্তু প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রস্তাব করেছিল যে রাজ্যগুলিকে জোতের জন্য অলংঘনীয় সীমা বেঁধে দিতে হবে।

প্রকৃত ভূমি সংস্কারের অন্তরায়

ভূমি সংস্কারের সমস্যাটাকে কংগ্রেস মহলে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হত না। যে গুরুত্ব কুমারাপ্পা কমিটি দিয়েছিল তাকে কংগ্রেস নেতারা আমল দিতে চাননি। কুমারাপ্পা কমিটি বলেছিল: তিন ধরনের [জমিদারী, রাইয়তওয়ারী ও মহলওয়ারী] ভূমি ব্যবস্থার মধ্যেই কালক্রমে বিভিন্ন ভূমি স্বার্থের উদ্ভব হয়েছে,

তার মধ্যে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে তফাত অনেক, এবং এই সকল স্বার্থের মধ্যে জটিল পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি ব্যবস্থার মধ্যে চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে এই যে গ্রামের অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, জমির উপর নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে এক দল অকৃষকের হাতে, খাজনা-ভোগী-মালিকরা প্রকৃত কৃষকদের উচ্ছেদ করে দিয়েছে, এবং যথাসম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত প্রচেষ্টার অভাব ঘটেছে।" (**Kumarappa Report, p 35**)

আরো, "বাংলাদেশে ফসল ভাগের ভিত্তিতে যে সব স্বত্বহীন কৃষক জমি চাষ করে তাদের সমস্যা যে কত গুরুতর তা বোঝা যাবে এই ঘটনা থেকে যে মোট আবাদযোগ্য জমির শতকরা প্রায় ২০ ভাগ চাষ করে ভাগচাষীরা, অথচ তাদের আইনগত কোন নিরাপত্তা নাই…"(**India, p31**)

বাংলার ভূমি রাজস্ব কমিশন তার রিপোর্টে (১৯৪০) বলেছিল **Vol I,para 85-88**) : "এ কথা সত্য যে প্রজাস্বত্ব আইনগুলি পরপর যে ব্যবস্থাগুলি দিয়েছিল তাতে রাইয়তদের কার্যত জমির মালিকানা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু খোদ-চাষীদের একটা বৃহৎ ও ক্রমবর্ধমান অংশের হাতে মালিকানা স্বত্বের কিছু ছিল না, অত্যধিক খাজনা থেকে তাদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং স্বত্বেরও কোন নিরাপত্তা ছিল না।"

এ প্রসংগে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের মন্তব্য এই (চূড়ান্ত রিপোর্ট, ১৯৪৫ **Appendix II-c**) : এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে জমির মালিকানা কৃষিকর শ্রেণীগুলির হাত থেকে বেরিয়ে যাবার একটা ক্রমবর্ধমান ঝোঁক রয়েছে। যাদের নিকট হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে তারা অকৃষক হতে পারে অথবা এমন কৃষিজীবী হতে পারে যারা ইতিমধ্যেই সরাসরি যা চাষ করতে পারে তার চেয়ে বেশি জমি পেয়ে গেছে। এ রকম ধারণা করবার কারণ নাই যে এই ঝোঁক্ বন্ধ করা বা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

কুমারাপ্পা রিপোর্টে এই কথাও বলা হয়েছে: "অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে কৃষক জমির মালিক না হলে উৎপাদনকে তার সম্ভাব্য পরিমাণে পৌঁছে দেবার পক্ষে তার উৎসাহ জাগে না।"

কংগ্রেস গবরমেন্টগুলির বিরোধিতা

গোটা ভূমি সমস্যাকে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করবার মনোভাব কিন্তু কংগ্রেস শাসক শ্রেণীদের মধ্যে প্রকাশ পেলে না। দেশের খাদ্য সমস্যা

ক্রমেই সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তবু খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর নাই। শিল্পের জন্য কাঁচা মালের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনকেও তারা কার্যত স্বীকার করে না। ভরসা আছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি থেকে খাদ্য ও কাঁচামাল আমদানী করে দেশের অভাব পূরণ করা যাবে। কিছুতেই অকৃষক মালিকদের শোষণ থেকে বড় বড় জোতগুলো সরিয়ে নিয়ে তার জমি প্রকৃত উৎপাদকদের হাতে দিয়ে উৎপাদন বাড়াবার এবং সেই সঙ্গে কৃষকদের বাঁচবার ব্যবস্থা করতে তারা প্রস্তুত নয়।

ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা ছিল সাম্রাজ্যবাদী। সামন্তবাদী শোষক শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রাখবার ও তার স্বার্থ রক্ষা করবার প্রয়োজন ছিল তার, তাতে দেশের দুরবস্থা যতই বৃদ্ধি পাক। কিন্তু স্বাধীন ভারতের "স্বদেশী ও দেশপ্রেমিক" শাসক গোষ্ঠীর নীতি সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই অনুরূপ হল কেন? এখানে স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে স্বদেশী-বিদেশী প্রশ্ন নয়, শ্রেণী স্বার্থের প্রশ্ন। শ্রেণী স্বার্থের বিচারে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এলেও কংগ্রেসের পুঁজিবাদী ও জমিদার শ্রেণীদের শাসন ব্যবস্থা মূলত জমির এক-চেটিয়া মালিকানা বজায় রাখতেই চেয়েছিল, যদিও এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সে মালিকানার বাইরের রূপটা কিছু বদলানো দরকার মনে করেছিল।

মোট কথা, জমির একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থ কংগ্রেস নেতাদের এমন অন্ধ করে রেখেছিল যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের স্বার্থে ভূমি সংস্কারের বা ভূমি সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের প্রশ্নকে তাঁরা আমলই দিতে চাইতেন না। স্বভাবতই বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসী সরকারগুলিও সেই নীতিই মেনে চলত। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীদপ্তর ও পরিকল্পনা কমিশন সরকারগুলির নিকট প্রস্তাব পাঠান ভূমি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। ঐ বছর নবেম্বরে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির কর্মচারীদের যে সরকারী সম্মেলন বসে তাতে জোত সম্বন্ধে তথ্য নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু হায়দরাবাদ ও বোম্বাই ছাড়া অন্য সব রাজ্য সরকার নাটু কমিটির প্রস্তাব-গুলিকে বানচাল করে দেয়। (Thorner, Agrarian prospect in India, Lecture on Ceilings.)

এই বইতে আরো দেখান হয়েছে যে ভূমি সংস্কারের একটা সম্ভাবনা আছে দেখে জমির মালিকরা ব্যাপকভাবে সর্বত্র কৃষকদের উচ্ছেদ করছে

থাকে। কৃষক ও রাইয়তদের আর্থিক অবস্থা এমন হয় যে জমির খাজনা দেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে এবং জমিদারদের খাজনা বাকি পড়তে থাকে। সেজন্য কোন কোন কংগ্রেস নেতা বিচলিত বোধ করেন। ১৯৫৩-র শেষ দিকে পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে কৃষক উচ্ছেদ চলছে দেখে নেহরু বিরূপ মন্তব্য করেন এবং ভূমি সংস্কারের জন্য আরো দ্রুত ও আরো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন। সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির আগ্রা অধিবেশনে (৬-৭ জুলাই ১৯৫৩) ভূমি সংস্কারের কাজ দ্রুততর করবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। (Ibid)

কিন্তু ভূমি সংস্কার করতে হলে জোতের সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করবার প্রশ্ন এড়ানো যায় না। কাজেই সে বিষয়ে বিলম্ব করা হতে থাকে। ১৯৫৪ সনে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি পার্টিতে বক্তৃতা কালে নেহরু বলেন ভূমি সংস্কারের কাজ ভালো চলছে না। যদিও এই প্রশ্ন একান্ত জরুরী তবু তা "আমাদের রাজ্যগুলিতে আটকে পড়ে আছে।" কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী পাঞ্জাব রাও দেশমুখও ছিলেন জোতের সীমা নির্ধারণের বিরোধী। (Ibid, p 70)

কৃষিজীবীদের অবস্থা

ভারতের ও বাংলার কৃষিজীবীদের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা এখানে বলা দরকার। ভারতের কৃষিজীবী ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ (১৮৭২), ৬৫ (১৯০১), ৭৩ (১৯৪৫)। আর শিল্পের উপর নির্ভর করত মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৩ (১৮৮০) এবং ৯ (১৯৪৫)। অর্থাৎ কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার অনুপাত ক্রমেই বেড়েছে আর শিল্পনির্ভরদের সংখ্যার অনুপাত ক্রমেই কমেছে। তার মানে হল জমির উপর চাপ ক্রমাগত বেড়েই গেছে।

১৯৬১-র আদমশুমারীর হিসাবে দেখা যায় ভারতে খেতমজুরের সংখ্যা ছিল ৩১০ লক্ষ—মোট কৃষিকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সিকি ভাগ। তারা খুব বেশির ভাগই জমিহীন। দৈনিক মজুরীর হার ছিল (পুরুষের) ১৯৫০-এ ১০৯ পয়সা, ১৯৫৬-তে ৯৬ পয়সা। মজুরী হারের নিম্নগতি লক্ষণীয়।

ভারত সরকার দুটি খেতমজুর তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করেছিল ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৬-৫৭-তে। এই দুই কমিটির তদন্তের মধ্যকালে দেখা যায় প্রত্যেক খেতমজুর পরিবারের আয় কমেছে শতকরা ১১ ভাগ, মাথা পিছু আয় নেমেছে ১০৪ টাকা (মাসে ৮·৬৬ টাকা) থেকে ৯৯ টাকায় (মাসে ৮·২৫

টাকায়)। কিন্তু পরিবার পিছু ব্যয় বেড়ে হয়েছে ৬১৭ টাকা (১৯৫৬-৫৭) —আয়ের চেয়ে ১৮০ টাকা বেশি, মানে ঘাটতি ১৮০ টাকা। গ্রাম্য জন-সংখ্যার সিকি ছিল খেতমজুর। তাদের যে মজুরী দেওয়া হয় তার শতকরা ৫১.২ ভাগ নগদে, ১২'৪ ভাগ জিনিসে আর ৩৬'৪ ভাগ দুয়ে মিলিয়ে।

পশ্চিম বাংলার হিসাব

পশ্চিম বাংলার হিসাবে দেখা যায় (১৯৫১ আদমশুমারী): মোট জন-সংখ্যা ২৬৩ লাখ, গ্রাম্য জনসংখ্যা২০০লাখ (শতকরা ৭৬), কৃষিজীবী জনসংখ্যা ১৫২ লাখ (গ্রাম্য জনসংখ্যার শতকরা ·৭৬ ভাগ) এবং খেতমজুর ৩১ লাখ (গ্রাম্য জনসংখ্যার শতকরা ১৬ এবং কৃষিজীবী জনসংখ্যার শতকরা ২১ ভাগ)। খেতমজুররা কাজ পায় গড়ে বছরে (১৯৫৬-৫৭) ২৪২ দিন। গড়ে মজুরীর হার (পুরুষের) দৈনিক ১৬৬ পয়সা (১৯৫০-৫১) এবং ১৪৩ পয়সা (১৯৫৬-৫৭)। গড়ে প্রত্যেক পরিবারের বার্ষিক আয় ৬০৮ টাকা (১৯৫০-৫১) ও ৬৫৭ টাকা (১৯৫৬-৫৭) আর বার্ষিক ব্যয় যথাক্রমে ৬২৫ ও ৭২৫ টাকা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হিসাব ধরলে এই আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও ক্রয় ক্রমতা হ্রাস পেয়েছিল, যে কারণে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি ছিল। খেত-মজুর পরিবারগুলির মধ্যে ঋণগ্রস্ত ছিল যথাক্রমে শতকরা ৩৩ ও ৬৯ ভাগ, পরিবার পিছু গড়ে ঋণ ছিল ১৫ ও ৩৯ টাকা, আর ঋণগ্রস্ত পরিবার পিছু গড়ে ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৪ ও ৫৬ টাকা।

পশ্চিম বাংলায় মোট প্রকৃত কৃষকদের শতকরা ২০ ভাগ হল ভাগচাষী। তারা মোট আবাদী জমির শতকরা ২১ ভাগ চাষ করে। তারা খুব বেশির ভাগই জমিহীন বা প্রায়-জমিহীন।

আরো একটা বিষয় পশ্চিম বাংলায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার। যে সব কৃষকের জমিতে রাইয়তী স্বত্ব আছে এবং দান বিক্রয়ের অধিকার আছে তাদের মোটামুটি জমির মালিক বলেই গণ্য করা হয়। কৃষকদের মধ্যে এমন অনেক গরিব কৃষক আছে যারা সামান্য জমির মালিক, সেই সঙ্গে ভাগচাষী, আবার হয়তো খেতমজুরের বা অন্তত গ্রাম্য মজুরের কাজও করে। একই ব্যক্তি ভাগচাষী ও খেতমজুর অনেক আছে। এই তিন ধরনের কাজে সামাজিক দিক থেকে তেমন কোন বাধা নাই, যদিও ব্যক্তিগত মর্যাদার দিক থেকে কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ হতে পারে।

গরিব কৃষক, ভাগচাষী ও খেতমজুর এই তিন স্তরের মানুষই সবচেয়ে

বেশি শোষিত ও নিষ্পেষিত হয়ে থাকে। সেই কারণে তাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। সামাজিক মর্যাদার কথা বাদ দিলেও আর্থিক নিরাপত্তা সবচেয়ে কম খেতমজুরদের।

এই তিন স্তরের কৃষক বড় ও মাঝারি কৃষক সমেত পশ্চিম বাংলার সমগ্র কৃষক সমাজের মধ্যে শতকরা অন্তত ৭০ ভাগ। তারাই জমিহীন ও প্রায়-জমিহীন কৃষিজীবী। জমিদারী প্রথা বর্তমান থাকতে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়েছিল তাদের স্বার্থে ; বড় বড় জোতের অকৃষক পরগাছা একচেটিয়া মালিকদের জমি তাদের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে এদেরই হাতে তার মালিকানা তুলে দেওয়া দরকার ছিল। তাই ছিল একমাত্র উপায় যার দ্বারা পশ্চিম বাংলার ভূমি ব্যবস্থার ও অর্থ ব্যবস্থার এবং কিছু পরিমাণে সমাজ ব্যবস্থারও যুক্তিসংগত ও জরুরী এবং প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটতে পারত।

কিন্তু কংগ্রেসী শাসনে আইনকানুন করে বা করতে গিয়ে এ সম্বন্ধে যে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে তা প্রগতি-মুখী না হয়ে প্রতিক্রিয়ার পথেই গেছে। জোতের সীমা নির্ধারণ সম্বন্ধে আইন মারফত আনুষ্ঠানিকভাবে যাই লেখা হয়ে থাকুক, জমির একচেটিয়া মালিকানা ভাঙ্গা হয়নি। যাদের জমির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি তাদের জমি পাবার ব্যবস্থা তো দূরের কথা, যে সামান্য জমি তাদের হাতে ছিল তাই থেকে উচ্ছেদই হয়েছে তারা বেশি।

সামন্তবাদী শোষণ আছে কেন

জমির বড় বড় মালিকরা আগের মতো শুধু জমির মালিকই থাকল না, পরগাছা মালিকও থেকে গেল। তারা যদি উৎপাদনের কাজে কিছু সাহায্য করত, পুঁজি লগ্নীর ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিত, তাহলেও তার সপক্ষে হয়তো কিছু বলার থাকত। কিন্তু তাদের জোতে কৃষি ব্যবস্থার বিশেষ কোন উন্নয়ন প্রচেষ্টা দেখা গেল না। এই সব মালিকদের শোষণের কাজ আজও চলছে প্রধানত সামন্তবাদী কায়দায়।

তাসত্ত্বেও কংগ্রেস গবরমেন্ট তাদের এই একচেটিয়া মালিকানা বজায় রাখলে কেন? সেটাই এখন আলোচ্য বিষয়।

সাধারণত দেশে একটা ধারণা আছে যে কংগ্রেসের শাসন পুঁজিবাদী শ্রেণীর শাসন এবং সেইহেতু তা সামন্তবাদের বিরোধী। একথা ঠিক যে এই শাসন ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী উৎপাদন বাড়াবার জন্য শিল্প কারখানার কাজে

পুঁজির মালিকদের সাহায্য করা হয়, যদিও তার প্রধান লক্ষ্য মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার দিকেই থাকে এবং সেজন্য ছোট ও মাঝারি পুঁজিদারদের ক্ষতি হলেও তা গ্রাহ্য করা হয় না। কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাংলাদেশে সামন্তবাদী শোষণের ঐতিহ্যকে এই শাসন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেয়নি। সেটাই তার নীতি, কেননা তা না করলে শাসন ব্যবস্থার উপর পুঁজিবাদী শ্রেণীর সঙ্গে জমিদার-জোতদার শ্রেণীর মিতালি ও কর্তৃত্ব থাকত না।

কংগ্রেস শাসন যদি শুধু পুঁজিবাদী শ্রেণীরই শাসন হত তাহলে সারা দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য এবং দেশকে শিল্পায়িত করবার জন্য বাজার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করতে হত, সুতরাং ব্যাপক জনগণের এবং বিশেষত কৃষক জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করতে হত। তার উপায় ছিল কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বণ্টন করা, সেজন্য একচেটিয়া মালিকদের হাত থেকে জমি সরিয়ে নেওয়া, অর্থাৎ প্রকৃত ভূমি সংস্কারের পথ গ্রহণ করা। সেই সঙ্গে খাদ্য ও কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ছিল উৎপাদনের কাজে কৃষকদের সাহায্য করা, পুঁজিবাদী মালিকদের জমিতে পুঁজি লগ্নী করতে উৎসাহ দেওয়া, এবং যেসব মজুর নিজেরা উৎপাদনের কাজ করে তাদের জন্য উপযুক্ত জীবিকার ও কাজের অবস্থার উন্নতি করা। কংগ্রেস শাসনে তা করা হয়নি। জমির পরগাছা একচেটিয়া মালিকদের বাঁচিয়ে রাখারই ব্যবস্থা হয়েছে। আর তাদের শোষণের মাত্রা বাড়াতে সাহায্যও করা হয়েছে।

এই ব্যবস্থা কেন করা হল? পূর্বেই বলা হয়েছে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন জমিদারী প্রথা প্রবর্তন করেছিল তখন তার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতিক: গ্রামাঞ্চলে তার সামাজিক সমর্থনের জন্য নতুন এক জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করা ছিল সেই উদ্দেশ্য। স্বাধীনতা পাবার আগে না হলেও পরে, যখন ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনকে আর এড়িয়ে যাবার উপায় থাকল না তখন, কংগ্রেস নেতারা বুঝেছিলেন যে এ সময়ে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে হলে সাধারণ মেহনতকারী জনগণের উপর নির্ভর করা চলবে না, বড় বড় জোত দখল করে ও ভেঙ্গে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করলেও তারা কংগ্রেসের পক্ষে, তার শোষণ ব্যবস্থাকে স্থায়ী করার পক্ষে সমর্থন জানাবে না। ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সুবিধা পাওয়া যাবে

যদি জমির বড় মালিকদের শোষণ পীড়ন চালাবার কাজে কংগ্রেস সরকার বাধা না দিয়ে সাহায্য করে।

কংগ্রেসের স্ববিরোধী নীতি

একথা সকলেই জানে যে বহুকাল ধরে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের পরিচালক থেকেছে মুষ্টিমেয় বড় অকৃষক জমির মালিক। সে কাজে যা কিছু ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন তাদেরই হাতে থেকেছে এবং শাসন ব্যবস্থা তাকে সাহায্য করে এসেছে। প্রত্যেক গ্রামের উপর সেই গ্রামের দু একটি বা কয়েকটি ধনী জমির মালিক পরিবারই করে এসেছে এই মাতব্বরির কাজ, গরিবরা সাধারণত তাদের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে এসেছে, অন্তত খোলাখুলি বাধা দেয়নি। তাদের সেই কর্তৃত্বের বুনিয়াদ ছিল তাদের জমির মালিকানা আর তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আর্থিক অবস্থার সুযোগ, আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদা। এখন যদি সেই শ্রেণীর হাত থেকে তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বুনিয়াদই সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সে কর্তৃত্বও আর থাকবে না। সেই কারণে কংগ্রেস শাসনের গ্রাম্য সমর্থন ও ক্ষমতার উৎস এই শ্রেণীকে নীতিগতভাবেই বজায় রাখতে হয়েছিল কংগ্রেস নেতাদের।

তথাকথিত পঞ্চায়েতী রাজ ও গ্রামাঞ্চলের "নীরব বিপ্লবের" মূলেও আছে কংগ্রেসের এই শ্রেণী কর্তৃত্বের সংকীর্ণ লক্ষ্য—সমগ্র সমাজের গণতান্ত্রিক বিকাশ ও অগ্রগতির বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণীদের সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য।

এই নীতি ছিল কিন্তু স্ববিরোধী। দেশে ব্যাপক পুঁজিবাদী শিল্পায়নের ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে এই নীতি একটা প্রচণ্ড বাধা, অথচ শিল্পায়ন করা কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি। শিল্পায়ন বা শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ তো দূরের কথা, জনগণের নিম্নতম প্রয়োজন মেটাবার পথেও এই নীতি ঘোরতর অন্তরায়। প্রাচীন অনুন্নত ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় থাকার ফলে দেশের কোটি কোটি মানুষ বেকার ও আধা-বেকার থাকতে বাধ্য হচ্ছে, সামাজিক শ্রমশক্তির বিপুল অপচয় ঘটতে থাকছে, প্রচুর অর্থ সম্পদ নিষ্ক্রিয় থাকছে অথবা অনুৎপাদক কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। তাই এই লক্ষ্যহীন ও ক্ষতিকর অর্থনীতিক অবস্থার সাথে সাথে সমাজের নৈতিক জীবনকেও অচল করে রেখে ক্রমে পিছনের দিকেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক জনগণের মধ্যে এই স্ববিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল

নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠছে, ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত হচ্ছে।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের উৎপাদন শক্তিকে উপেক্ষা না করে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ভূমি ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ককে পরিবর্তন করলে সামগ্রিকভাবে দেশের জন্য যে সুফল পাওয়া যেত, কংগ্রেস নেতৃত্ব ও তার প্রতিক্রিয়াশীল ও সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থের অনুকূল শাসন ব্যবস্থা তার থেকে দেশকে বঞ্চিত রেখে দেশের প্রভূত অনিষ্ট করেছে, এখনো করছে।

ভূমি সংস্কারের নামে কংগ্রেসকে আইন অবশ্য পাস করতে হয়েছে কিন্তু কংগ্রেসের এই স্ববিরোধী ও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর নীতি অনুসারেই তা করা হয়েছে। আর জনগণের চাপে যেটুকু ভালো ব্যবস্থার কথা আইনে রাখা হয়েছে, তাকেও বানচাল করবার জন্য চেষ্টার অন্ত নাই। তার ফল হয়েছে বিষময়—জনগণের পক্ষে দুঃখদায়ক ও কংগ্রেসের পক্ষে বিপজ্জনক। কৃষকদের বিপ্লবের পথে যেতে হচ্ছে।

এগার

১৯৪৭ সনের সম্মেলনের পর ১৯৪৮ সন থেকে ধরপাকড়, লাঠি, গুলি ইত্যাদি পুলিসী হামলা ও সন্ত্রাসের কারণে দেশে যে অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয় তাতে পাঁচ বছরের মধ্যে কোন সম্মেলনের অনুষ্ঠান অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সকল ধাক্কা সামলে ওঠবার পর এবং কর্মী ও নেতারা জেল ও অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে আসবার পর পরবর্তী সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়।

স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগ

ইতিমধ্যে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হয় এবং ভারত বিভাগের দ্বারা ভারত ও পাকিস্তান দুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বাংলাদেশও বিভক্ত হয়ে যায় এবং ভারতের মধ্যে থাকে পশ্চিমবঙ্গ আর পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত কয়েক বছরের অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে স্বভাবতই প্রাদেশিক কৃষক কমিটির কাজকর্ম নিয়মিতভাবে চলতে পারেনি। ১৯৫০ সনে অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা যায়। সে সময়ে কমিটির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের অধিকাংশই ছিলেন জেলে অথবা গোপন অবস্থায়। বঙ্কিম মুখার্জি বাইরে ছিলেন। তিনি প্রাদেশিক কৃষক কমিটির এক সভা ডাকেন। কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনসুর হবিব দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সনে পাকিস্তানে কাজ করবার জন্য দায়িত্ব নিয়ে চলে যাওয়ার ফলে পদটি তখন পর্যন্ত শূন্য ছিল, কমিটি স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে না পারায় তা পূরণ করা যায়নি। এখন কমিটি সেই পদে সৈয়দ শাহেদুল্লাহকে নিযুক্ত করে এবং আফিসের দায়িত্ব দেয় শান্তিময় (বাচ্চু) ঘোষকে। প্রাদেশিক কৃষক কমিটি আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম করার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে।

দুর্ভিক্ষের বছর থেকে দেশে খাদ্য সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি। বরং সমস্যার জটিলতা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। খাদ্য শস্যের সংগ্রহ, বণ্টন, দর, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রস, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত নীতি

ও ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি বিষয় সমস্যাকে ক্রমেই জটিলতর করে তুলতে থাকে। ক্রমবর্ধমান মজুতদারী-মুনাফাখোরী এই জটিলতা বৃদ্ধিতে আরো সাহায্য করে। খাদ্য সমস্যার জটিলতা বাংলার ভূমি সমস্যাকেও জটিল করতে থাকে। ব্যাপকভাবে ভাগচাষী ও উঠবন্দী প্রজাদের উচ্ছেদ করা হতে থাকে। জমিহীন ও নিঃস্ব কৃষকের সংখ্যা বেড়ে যায়। তার ফলে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যায়, প্রয়োজনের তুলনায় কাজের পরিমাণ আরো কমে যায়, সেই সঙ্গে মজুরীর হারও হ্রাস পায়। ফলে টেস্ট রিলিফ ও খয়রাতী সাহায্যের প্রয়োজন বাড়তে থাকে। রিলিফ যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হয় না।

খাদ্যের অভাব, রিলিফের অভাব, বেকার সমস্যা, কাজ ও মজুরীর অল্পতা, কৃষিঋণের অল্পতা গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। সেই বিক্ষোভকে সংগঠিত আন্দোলনে পরিণত করার দায়িত্ব এসে পড়ে কৃষক সভার উপর।

বঙ্গ বিভাগের ফলে বিশৃংখলা

দেশ বিভাগের সঙ্গে বঙ্গ বিভাগও হয়। তখন অখণ্ড বঙ্গের অখণ্ড অর্থ-ব্যবস্থাও বিভক্ত হয়ে পড়ে। শিল্পকারখানা এবং বিশেষ করে চটকল শিল্প থেকে যায় পশ্চিমবঙ্গে, কৃষি ব্যবস্থার এবং বিশেষ করে পাট উৎপাদনের প্রধান অংশ থেকে যায় পূর্ববঙ্গে বা পূর্বপাকিস্তানে। এদিকে শিল্প শ্রমিকরা কৃষির উৎপাদনে কাজ না করলেও তাদের খাদ্যের প্রয়োজন থাকে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু কৃষক পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলায় চলে আসে। এখানকার রেফিউজি কৃষকদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয় কিন্তু তারা জমি পায় না, জমির অভাবে কৃষি উৎপাদনের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে না।

বাংলার অবিভক্ত এবং পূব ও পশ্চিম বঙ্গের পরস্পর-নির্ভর অর্থ-ব্যবস্থা বিভক্ত হয়ে যাবার ফলে আর এক অসুবিধা দেখা দেয়। সে অসুবিধা ছিল পাট সম্বন্ধে। তখন সমস্ত চটকল ছিল কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে, আর কাঁচা পাটের উৎপাদন ক্ষেত্র ছিল প্রধানত বাংলার পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলে, পাকিস্তানে। ফলে চট শিল্পের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য উৎপাদন কমাতে হলেও পাট উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রচুর নতুন জমি ছেড়ে দিতে হয়। তাতে খাদ্যের ঘাটতি আরো বৃদ্ধি পায়।

দীর্ঘকাল ধরে যোটের উপর যে অখণ্ড ও অনেকটা সুসংবদ্ধ অর্থব্যবস্থা বাংলা দেশে গড়ে উঠেছিল তাকে হঠাৎ অবৈজ্ঞানিকভাবে ভেঙ্গে দেওয়ায়

শুধু যে খাদ্যশস্যের দিক থেকেই সমস্যা বেড়েছিল তাই নয়, মাছ, হাঁস, মুরগী, ডিম, সুপারি ইত্যাদির উৎপাদন ও সরবরাহ সম্বন্ধেও অনেক অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল।

এ সকল বিষয়ে সবচেয়ে বড় আঘাত আসে কৃষকদের উপর। তাই কৃষক সভাকে এদিকে নজর দিতে হয়। তার দায়িত্ব বিশেষভাবে বেড়ে যায়।

অভাব ও অব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি গণবিক্ষোভ। তাই থেকে আসে গণ আন্দোলন। তখন তাকে দমন করবার জন্য শোষক শ্রেণীদের সরকার যথারীতি এগিয়ে আসে তার আইন, আদালত, পুলিস, জেল ইত্যাদি নিয়ে। তার প্রতিরোধের জন্য কৃষক সভাকে পরিচালনা করতে হয় সংগঠিত কৃষকদের আন্দোলন। ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্ন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্ন তখন বড় হয়ে ওঠে। ২৬শে জানুয়ারি ১৯৫০ তারিখে যখন ভারতীয় সংবিধান জারি হয় তারপর থেকে এই প্রশ্নের গুরুত্ব স্বভাবতই আরো বৃদ্ধি পায়।

এই পরিস্থিতির মধ্যে নব পর্যায়ের কৃষক সভার কাজ চলে, কুমারশা ও পরবর্তী সম্মেলনগুলির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কংগ্রেসী শাসনের প্রথম স্বাদ

কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ১৯৪৮ এর ৮ই জুনের প্রাদেশিক কৃষক সভার ১নং সাংগঠনিক পত্রে অনেকগুলি কথা বলা হয়েছে। ১৫ই আগস্ট (১৯৪৭) স্বাধীন পশ্চিম বাংলায় ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে যে প্রাদেশিক সরকার গঠিত হয় সেই সরকার বিনা বিচারে আটক রাখার ক্ষমতা দিয়ে, শরৎ বসু প্রভৃতির নেতৃত্বে ব্যাপক জনগণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও, নিরাপত্তা আইন পাস করে। এই বিলের আলোচনা কালে বিলের বিরুদ্ধে বিধান সভার নিকট প্রতিবাদকারী জন জমায়েতের উপরে ১০ই ডিসেম্বর পুলিস হামলা করে এবং গুলি চালিয়ে শহীদ শিশির মণ্ডলকে হত্যা করে। ঐ মাসেই গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষক সভার আহ্বানে ছ হাজার কৃষক কলকাতা এসে সরকারের নিকট কৃষকদের দাবিদাওয়া পেশ করতে চাইলে তাদের কাঁদানে গ্যাস দিয়ে তাড়াবারও ব্যবস্থা করে।

এই সাংগঠনিক পত্রে বলা হয়েছে যে মার্চ (১৯৪৮) মাসের প্রথম দিকে কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হবার অল্পদিন পরে ২৬শে

মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং সেই সঙ্গে কৃষক সভার বিরুদ্ধে "প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু" করে, "অনেক কৃষক নেতা ও কর্মীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা" হয়। প্রাদেশিক কৃষক সভার আফিস ও সারা ভারত কৃষক সভার আফিস (২৪৯ বৌবাজার স্ট্রীট, তেতলা) দীর্ঘকালের জন্য তালা বন্ধ করে সেখানে পুলিস পাহারা মোতায়েন করা হয়। জনগণের দাবির, বিশেষত বিভিন্ন স্তরের মেহনতকারী মানুষের দাবির "সংগ্রামগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য কায়েমী স্বার্থ, সরকারী আমলা, পুলিস ও…কংগ্রেসের নামে ছদ্মবেশী দালাল একযোগে ষড়যন্ত্র করিতে শুরু করিল। আজ তাই ১৫ই আগস্টের পরও পুলিসের লাঠি, গুলি, অত্যাচার, জেল, নিরাপত্তা আইন সবই পুরাদমে চলিতেছে। ইহাই নাকি স্বাধীনতা !"

জনস্বার্থ-বিরোধী সরকার

কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গদীতে বসবার সঙ্গে সঙ্গে "তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রী হুমকি দিয়া ঘোষণা করিলেন তেভাগার দাবিতে কোন সংঘর্ষ সহ্য করিব না…।" (সাংগঠনিক পত্র ১, পৃ ৭) "খাদ্য সংগ্রহেও গরিব চাষীর ঘর হইতে তাহার ২।১ মাস চলে এমন ধান চাউলও টানিয়া বাহির করা হইল, অথচ বড় বড় জোতদারের মজুত চাউলের উপর হাত পড়িল না,—যাহা পড়িল তাহা লোক দেখানো মাত্র। কৃষক সমিতি তখনকার সরবরাহ মন্ত্রীকে লিস্টের পর লিস্ট পাঠাইয়া কোন জোতদারের ঘরে কত মজুত আছে তাহা জানাইয়াছে, জোতদারদের এই প্রচুর ধান চাউল আটক করার বিষয়ে সহযোগিতার কথা বলিয়াছে, কিন্তু ২।১টি ক্ষেত্রে ছাড়া মন্ত্রী মহাশয় এই খাদ্যের উপর হাত দেন নাই।" (পৃ ৮)

জমিদারী উচ্ছেদ সম্বন্ধে আইন তৈরীর কোন প্রচেষ্টা এই সরকারের ছিল না, যদিও মাদ্রাজ, বিহার ও যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস সরকার ইতিমধ্যে আইন সভায় বিল পেশ করেছিল (পৃ ৯)। দারুণ বস্ত্রসংকট সত্ত্বেও কাপড়ের মুনাফাখোরী ও চোরাকারবার অবাধে চলতে দিয়েছিল (পৃ ১০)"।

"কংগ্রেসী সরকারের সর্বনাশা নীতি এইভাবেই গ্রাম্য অর্থনীতি ক্ষেত্রে জমিদারীর স্থানে আর একটি প্রবল ও বড় দলের কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করিতে চলিয়াছে। সুতরাং আজ জমিদারী উচ্ছেদের প্রয়োজনে চাষীর স্বার্থের বিরুদ্ধে, কৃষি সমস্যার প্রকৃত সমাধানের বিরুদ্ধে এই গভীর ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিতেই হইবে" (পৃ ১৩)। "সুতরাং আজ আমাদের স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে এই কংগ্রেসী

সরকার ও নেতৃত্ব জনস্বার্থ-বিরোধী কায়েমী স্বার্থের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে…" (পৃ ১৬)।

"জমিদারীর উচ্ছেদ ও লাঙ্গল যার জমি তার এই দাবির লড়াই হইবে আমাদের বর্তমান মূল লক্ষ্য। জমি সমস্যা, কৃষকের দারিদ্র্য, খাদ্য প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ উহাই। …কৃষককে উচ্চতম দেশপ্রেম ও শ্রেণী স্বার্থের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। …"(পৃ ১৮) সরকার কৃষকদের দাবির আন্দোলন দমনের জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। হুগলি জেলার বড়া-কমলাপুরে গুলি চালিয়ে দুজন কৃষককে—কমরেড কার্ত্তিক ও গুইরামকে —হত্যা করেছিল। (পৃ ১৯)

আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে কৃষক সভার সংগঠনকে ভাঙ্গবার চেষ্টা হচ্ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করা হচ্ছিল। "১৫ই আগস্টের পর সরকারী আমলা হইতে শুরু করিয়া কোন কোন রাজনীতিক দলের কর্মী পর্যন্ত নানা ভাবে এই বিভেদের চেষ্টা করিতেছে।" তারা "প্রথমেই আমাদের সংগঠনের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চালাইয়া তাহাদের কুমতলব হাসিল করবার চেষ্টা করে।" (পৃ ২২-২৩)

এর পরবর্তী দু বছরে কংগ্রেস সরকারের দমন পীড়নের ব্যবস্থা আরো অনেক তীব্র হয়। বহু গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র পুলিসের ক্যাম্প বসানো হয়, পুলিসের গুলিতে বহু পুরুষ ও নারী কৃষককে হত্যা করা হয়, সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়।

এই পরিস্থিতির মধ্যে কৃষক সভার ও তার সম্মেলনগুলির আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বিশেষভাবে থাকে বর্গাদার সমস্যা, খেতমজুর সমস্যা, উচ্ছেদ, খাদ্য ও রিলিফ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, ঋণ ও সেচ সমস্যা। অবশ্য জমিদারী প্রথার উচ্ছেদও কিছুদিন প্রধান সমস্যা হয়ে থাকে, এবং জমিদারী দখল আইন ও ভূমিসংস্কার আইন পাস হবার পর এ বিষয়ে বক্তব্যের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে।

একাদশ সম্মেলন ঃ কুমারশা

১৯৪৭ সনে দশম সম্মেলন হবার পর ১৯৫২ সনের ৩১ মে ও ১ জুন তারিখে ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংএর নিকটবর্তী কুমারশা গ্রামে প্রাদেশিক সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন হয়। কুমারশা সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন আবদুল্লাহ রসুল। তিনি ৩০ মে ১৯৫২ তারিখে নিবর্তন মূলক আটক

আইনে আটক বন্দীদের শেষ দলের মধ্যে দমদম জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসেন এবং পরদিন সম্মেলনে যোগদান করেন। তখন প্রাদেশিক কৃষক সভার প্রাথমিক মেম্বর ছিল মাত্র ৩০ হাজার; সরকারী হামলায় বিধ্বস্ত কৃষক সভার পক্ষে আর বেশি মেম্বর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

দুই সম্মেলনের মধ্যকালে মৃত কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শোক প্রস্তাব প্রত্যেক সম্মেলনেই গৃহীত হয়। কুমারশায় বিশেষভাবে ছিল "শহীদ স্মরণে" প্রস্তাব। কংগ্রেসী পুলিসের অমানুষিক দমন ও নির্যাতনের ফলে বিগত চার বছরের কৃষক আন্দোলনে যে সমস্ত বীর নারী ও পুরুষ সংগ্রামী শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছিল এই প্রস্তাবে। তাঁদের সংখ্যা ছিল ৭২। তাঁরা ছিলেন মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান ও পশ্চিম দিনাজপুরের কর্মী ও সংগ্রামী কৃষক। জেলের মধ্যে বন্দী অবস্থায়ও পুলিসের গুলিতে কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমানের কৃষক কর্মী প্রভাত কুণ্ডু এবং কলকাতার কলেজের ছাত্র সুশীল চক্রবর্তী। দুজনেই দমদম জেলে পুলিসের গুলিতে নিহত হন। সুশীল কৃষক আন্দোলনের কাজে যোগ দেবার পর ২৪পরগনা জেলার সন্দেশখালি অঞ্চলে গ্রেপ্তার হয়ে দমদম জেলে আটক ছিলেন।

তেভাগা আন্দোলনে সারা বাংলায় যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যাও ছিল প্রায় একই—৭০। কিন্তু এবারকার শহীদদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তাঁদের মধ্যে প্রায় ২৫ জন ছিলেন নারী, বিশেষ করে হাওড়া, হুগলি ও ২৪ পরগনা জেলায়। আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে এবারকার আন্দোলনের রাজনীতিক গুরুত্ব ছিল পূর্বেকার আন্দোলনের তুলনায় বেশি। এই রাজনীতিক চরিত্রের আন্দোলনে এত বেশি কৃষক নারীর আত্মদান আন্দোলনের রাজনীতিক অগ্রগতিই সূচনা করে।

জমিদারী উচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রস্তাবে সম্মেলনে যে সমস্ত দাবি তোলা হয় তার মধ্যে ছিল: ছোট ছোট জমিদারদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও জমির উপর কৃষকের প্রকৃত মালিকানা, বড় বড় জমিদার ও জোতদারদের খাস জমি বাজেয়াপ্ত করে তা বিনা মূল্যে খেতমজুর, গরিব কৃষক ও অন্যান্য ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ; খাজনার পরিবর্তে আয়কর প্রবর্তন এবং সেজন্য নিম্ন আয়ের

একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ছাড়; এবং বকেয়া খাজনা ও বকেয়া ঋণ মকুব। এই সমস্ত দাবির আন্দোলনের পিছনে বৃহত্তম জনমত ও গণ ঐক্য এবং বিশেষ করে কৃষকদের সহিত শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগিতার কথা বলা হয়।

খাদ্য প্রস্তাবে বলা হয়, "বর্তমান ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির জন্য প্রধানত দায়ী কায়েমী স্বার্থের তোষক ও জনস্বার্থ-বিরোধী সরকারী নীতি, অন্যায় উৎপীড়ন, দুর্নীতি ও অযোগ্যতা এবং নিষ্ঠুর উদাসীনতা।" খাদ্য সম্বন্ধে সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক সম্মেলন আহ্বান করার ও সরকারী খাদ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস পালনের কথাও প্রস্তাবে বলা হয়।

কৃষিঋণ সম্বন্ধে পৃথক প্রস্তাবে দাবি করা হয়: খেতমজুর, ভাগচাষী ও গরিব কৃষকের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ঐ বছরে (১৯৫২-৫৩) কৃষিঋণের টাকা আদায় বন্ধ রাখতে হবে।

বর্গাদার সংক্রান্ত প্রস্তাব

ভাগচাষ প্রথা সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে বলা হয়: ভূমি রাজস্ব কমিশন বলেছিল (১৯৪০) বাংলায় প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জমিতে বর্গা প্রথায় চাষ হয়। ১৯৪৫ সনে সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছিল এরূপ জমির পরিমাণ প্রায় এক-চতুর্থাংশ। ধান কর্জার উপর শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ সুদ আদায় করে "মহাজনী মূলধন পরগাছার মতো কৃষকের জীবনে জাঁকিয়া বসিয়াছে।" "পশ্চিমবাংলায় খাদ্যের উপর একচেটিয়া মুনাফাখোরীর অন্যতম মূল কারণ ভাগচাষ প্রথা।" "এক কথায়, ভাগচাষ প্রথায় জোতদারী ও মহাজনী শোষণের তীব্রতা কৃষককে বিত্তহীন কাঙ্গাল করিয়াছে। ···বাংলাকে স্থায়ী দুর্ভিক্ষের গ্রাসে ঠেলিয়া দিয়াছে।

"সুতরাং ভাগচাষ প্রথার অবসান করিয়া বর্গা চাষীকে জমির মালিকানা দেওয়াই কৃষক সভার লক্ষ্য।"

কংগ্রেস সরকারের বর্গাদার আইনের সমালোচনা করে বলা হয়, "এই আইনে যে ভাগচাষ সালিসী বোর্ড স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাতে কৃষকদের দ্বারা নির্বাচিত কোন প্রতিনিধির স্থান নাই। ভাগচাষীদের প্রতিনিধিত্ব করিবে কে তাহাও স্থির করিবেন ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী।··· ভূস্বামীদের ভাগচাষী উচ্ছেদের প্রায় অবাধ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।··· ফলে আজ সারা পশ্চিম বাংলায় ভাগচাষী উচ্ছেদের ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিতেছে।··· ফসল ভাগের যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহাতে ভূস্বামীরা

ভাগচাষীদের নিকট হইতে 'চাষের খরচ পাইয়াছি,' 'বলদ পাইয়াছি,' কিংবা 'মজুর হিসাবে কাজ করিয়াছি', এইরূপ মিথ্যা কবুলিয়ত লিখাইয়া লইয়া ফসলের প্রাপ্য অংশ হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিতেছে। এই আইনের ফলে বর্গাদাররা ফসলের প্রাপ্য অংশ তো পায়ই নাই, পরন্তু নানা ধরনের বর্গা কবুলিয়ত প্রথা ব্যাপকভাবে চালু হইয়াছে এবং ভাগচাষী লিখিতভাবে জমি চাষের সমস্ত অধিকার হারাইয়াছে।"

আরো : কোন ভাগচাষী সালিসীবোর্ডে গেলে "বোর্ড মামলাটিকে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া এবং মামলা চলা কালে ফসল ভাগ বন্ধ করিয়া বর্গাদারদের ভূস্বামীদের সব শর্ত মানিতে বাধ্য করে।" মোট কথা, "কংগ্রেস সরকারের বর্গাদার আইন ভূস্বামীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই রচিত হইযাছে।"

প্রস্তাবে যে সমস্ত দাবি তোলা হয় তার মধ্যে ছিল : ভাগচাষীর তেভাগা দাবির স্পষ্ট স্বীকৃতি ও নিজ খামারে ধান তোলবার অবাধ অধিকার ; ভাগের ধান পেয়ে চাষীকে রসিদ দেওয়া, এবং ভাগচাষী উচ্ছেদের কোন অধিকার না রাখা। শেষে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনের আহ্বান দেওয়া হয়।

সম্মেলন কয়েকটি খসড়া প্রস্তাবের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার দেয় নতুন কাউন্সিলের উপর। কাউন্সিল ১৪ই জুলাইয়ের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ময়ূরাক্ষী ক্যানাল সম্বন্ধে প্রস্তাবটিতে বলা হয় প্রস্তাবিত ৬ লক্ষের মধ্যে ২ লক্ষ একরে জল দেবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেজন্য সরকার শুধু এই বছরের খরিফ ফসল বাবত একরে ১০ টাকার পরিবর্তে সাড়ে সাত টাকা কর ধার্য করেছে। এই কর ধার্যের ব্যবস্থাকে "অত্যন্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক" বলে ঘোষণা করা হয়। এবং বলা হয় যে ক্যানালের রক্ষণাবেক্ষণের খরচের বেশি কর কৃষকদের নিকট থেকে আদায় করা উচিত নয়।

উদ্বাস্তু নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি

বাস্তুহারা পুনর্বাসন প্রস্তাবে পুনর্বাসন সম্বন্ধে সরকারী ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলা হয় : "ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ইউনিয়ন বোর্ডের মারফত গ্রামে গ্রামে উদ্বাস্তুদের পাঠাইয়া পুনর্বসতির ব্যবস্থাও ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।" উদ্বাস্তুদের উপর জমিদার-জোতদারদের

শোষণ সম্বন্ধে বলা হয়: "দেশের ব্যাপক বেকারীর সুযোগে এই কায়েমী স্বার্থের দল উদ্বাস্তুদের কম মজুরীতে খাটাইয়া স্থানীয় চলতি মজুরীর হার কমাইয়া স্থানীয় খেতমজুর ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিভেদ আনিতেছে এবং উভয়ের সর্বনাশের ব্যবস্থা করিতেছে।··· উদ্বাস্তুদের পাকিস্তানের সীমানার কাছাকাছি এলাকায় বসবাসের ব্যবস্থা করে এইসব এলাকায় পরিত্যক্ত মুসলমানদের জমিতে চাষ আবাদ করাইয়া সরকার এবং জমিদার উভয়েই উৎপাদিত ফসলের ভাগ আদায় করিয়াছে।··· পশ্চিমবঙ্গের অনেক উদ্বাস্তু মুসলমান পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসার পর এই অবস্থা আরো জটিল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা না হওয়ায় পুনরাগত মুসলমানরা বাস্তুহারায় পরিণত হইয়াছে। জমিদার-জোতদাররা এই সুযোগে মুসলমান ও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখারই চেষ্টা করিতেছে।"

প্রস্তাবে অন্যান্য দাবির সঙ্গে এই দাবি তোলা হয়: অবিলম্বে আইন জারি করে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আবাদযোগ্য পতিত জমি দখল করে তা বিনামূল্যে স্থানীয় গরিব কৃষক ও খেতমজুর এবং উদ্বাস্তু কৃষক প্রভৃতির মধ্যে বিলি করতে হবে। প্রত্যাগত উদ্বাস্তু মুসলমানদের পুনর্বাসনের যাবতীয় দায়িত্ব ও সরকারকে গ্রহণ করতে হবে এবং পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে তাদের বাস্তু ও জমি ফিরিয়ে দিতে হবে।

আন্দোলন সম্বন্ধে বলা হয়: "গ্রামের উদ্বাস্তু পুনর্বসতির আন্দোলনকে মূল কৃষক আন্দোলনের সহিত যুক্ত করিতে হইবে।"

অন্যান্য প্রস্তাব

কৃষকদের ঋণের সমস্যা নিয়ে এক প্রস্তাবে আলোচনা করা হয়। তাতে দেখানো হয় যে সরকারী ঋণ ও কো-অপারেটিব ঋণের পরিমাণ অতি সামান্য বলে কৃষকদের মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয়। মহাজনরাও সুযোগ বুঝে যে হারে সুদ নিয়ে তাদের শোষণ করে এবং যে শর্তে ঋণ দেয় তাতে কৃষকরা ব্যাপকভাবে জমি থেকে উৎখাত ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। "ঋণের দায়ে জর্জরিত কৃষক সর্বস্বান্ত হইয়া জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের কাছে বাঁধা পড়িয়া ভূমিহীন ও ভূদাসে পরিণত হয়।" প্রস্তাবে অন্যান্য দাবির মধ্যে এই দাবিও তোলা হয়: "ঋণের পরিবর্তে বিক্রী বা সাফ কবুলিয়ত করিয়া মহাজনরা কৃষককে যেসব জমি হইতে উচ্ছেদ করিয়াছে সেই সব জমি কৃষককে ফিরাইয়া

দিতে হইবে। লিখিত বা অলিখিত শস্য ঋণের এক-চতুর্থাংশের বেশি সুদ বে-আইনী ঘোষণা করিতে হইবে।”

অন্যান্য প্রস্তাবে আবাদযোগ্য পতিত জমি উদ্ধার করে বিনামূল্যে গরিব কৃষক, খেতমজুর ও বাস্তুহারা কৃষকদের মধ্যে বিলি করবার জন্য দাবি তোলা হয়। খেতমজুরদের ন্যায্য মজুরীতে কাজ দেবার ব্যবস্থার জন্যও আওয়াজ তোলা হয়। খেতমজুর সংগঠন সম্বন্ধে বলা হয় যেসব অঞ্চলে পৃথকভাবে তাদের আন্দোলন গড়ে উঠবে সেখানে তাদের নিজস্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রধান প্রধান খেতমজুর এলাকগুলিতে এখনি এই সংগঠন গড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সংগঠন কৃষক সভার অন্তর্ভুক্ত ইউনিট হিসাবে কাজ করবে।

কুমারশায় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের এই একাদশ অধিবেশনে প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলে নির্বাচিত হন: আবদুল্লাহ রসুল (সভাপতি); অজিত বসু, ধরণী সরকার ও আবদুর রাজ্জাক খাঁ (সহ-সভাপতি); ভূপাল পাণ্ডা (সম্পাদক); শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, সুনীল সেন, অবনী লাহিড়ী ও বগলা গুহ (সহ-সম্পাদক); বিজয় মোদক (কোষাধ্যক্ষ); এবং হরেকৃষ্ণ কোঙার, সুবোধ চৌধুরী, রাধাকিংকর পাল, ননী রায় (বাঁকুড়া), বিশ্বনাথ মুখার্জি, যতীন মাইতি, রবি মিত্র, গৌরী ভট্টাচার্য, বসন্ত চ্যাটার্জি, অনন্ত মাজি (মেদিনীপুর), বিভূতি গুহ ও অমৃতেন্দু মুখার্জি। ২৪ পরগনা জেলা থেকে আর একজন মেম্বর নেবার কথা ছিল কিন্তু তখন নাম পাওয়া যায়নি।

১৪ই জুলাই কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করে প্রাদেশিক কৃষক সভার আফিস ২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট থেকে ১ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে সরিয়ে নেওয়া হবে।

প্রধান লক্ষ্য বড় জোতদাররা

গবরমেণ্ট ১৯৪৯ সনে বর্গাদার অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল এবং ১৯৫০ সনে তাকে আইনে পরিণত করেছিল। কুমারশা প্রস্তাবে তার সমালোচনা করা হয়েছিল। পরে সেই আইনের সংশোধন করা হয়েছিল একটা অর্ডিন্যান্স জারি করে (অক্টোবর ১৯৫২)। কিন্তু তাতে সভার দাবি পূরণে বিশেষ সাহায্য হয়নি। তাই কৃষক সভা নিজে একটা সংশোধনী বিল রচনা করে। সরকার অবশ্য তা মেনে নেয়নি। তবে এই বিলের সমর্থনে জনমত গঠনের জন্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হয়।

তেভাগা ও অন্যান্য দাবির আন্দোলন করলেও কৃষক কাউন্সিল ঘোষণা

করে যে আন্দোলনে কৃষকদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হবে বড় জোতদাররা। যাতে ছোট জোতদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আন্দোলনের সপক্ষে টানা যায় সেজন্য ছোট জোতদারদের সঙ্গে ভাগের ব্যাপারে পুরো তেভাগা আদায় না করে আপসের পথে যেতে হবে। কী ধরনের আপস হবে তা সিদ্ধান্ত করবে স্থানীয় কৃষক ও গ্রামবাসীদের নির্ধারিত কমিটি। তাছাড়া খেতমজুরদের পূর্ণ সমর্থন লাভের চেষ্টা করতে হবে। সেজন্য ভাগচাষী ও খেতমজুরদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার ব্যবস্থা করতে হবে। (প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রস্তাব, ১৩-১৪ নবেম্বর ১৯৫২।)

নতুন খাদ্য নীতি ঃ লেভি ও কর্ডন

সরকার এই বছর (১৯৫২) ২২ অক্টোবর যে নতুন খাদ্যনীতি জারি করে তাতে দশ একর ও তার বেশি জমির মালিক ও বর্গাদারদের উপর লেভি ধার্য করা হয়। এই লেভি বাবত আড়াই লাখ টন চাল সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত হয়। তাছাড়া চালকলগুলি থেকে তার উৎপন্ন এক-তৃতীয়াংশ (এক বা দেড় লাখ টন) কনট্রোল দরে নেওয়া স্থির হয়। আমন ধানের ক্রয় মূল্য ধার্য হয় ৮৷৷০ টাকা মণ। কলকাতা ও অন্যান্য রেশন এলাকায় রেশনের পরিমাণ বিশেষ না বাড়িয়ে রেশনের অতিরিক্ত চাল ৺২৷৷০ দরে বিক্রীর ব্যবস্থা হবে ঠিক হয়। ধান চাল যাতে নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেতে না পারে সেজন্য কর্ডন ব্যবস্থা হয়।

উৎপাদকদের জন্য মাথাপিছু ১০ মণ ধান, বীজ বাবত বিঘা প্রতি ১০ সের ও চাষের খরচ ১ মণ হিসাবে বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত ধান লেভি বাবত আদায় করার সিদ্ধান্ত হয়। লেভি আদায়ের জন্য সাধারণ পেট্রল গার্ডকে পর্যন্ত ঘরে ঢুকে তল্লাসীর অধিকার দেওয়া হয়।

এই লেভি ও লেভি আদায়ের জন্য ধান সিজ করার সিদ্ধান্ত সারা বাংলার গ্রামাঞ্চলে দারুণ চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। সিজ সম্বন্ধে লোকের তিক্ত অভিজ্ঞতা পূর্বেই হয়েছিল।

কৃষক সভার বক্তব্য ছিল এই যে মোট সাড়ে তিন লাখ বা চার লক্ষ টন চাল সংগ্রহের জন্য কেবল বড় বড় জোতদার ও মালিকদের উপর লেভি করা ও উপর থেকে অর্থাৎ সবচেয়ে বড় মালিকদের থেকে সংগ্রহ আরম্ভ করা এবং চালকলগুলি থেকে এক-তৃতীয়াংশের বেশি আদায় করা হলেই লক্ষ্য পূরণ হতে পারে। তাহলে কৃষক ও ছোট মালিকদের উপর লেভি ধার্য করা

দরকার হবে না এবং তা করা উচিত নয়। ধানের ক্রয় মূল্য বাড়ান এবং পারিবারিক ও চাষের খরচের জন্য পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। লেভি ও সিজ করার বিরুদ্ধে কৃষক সভার সবচেয়ে বড় আপত্তির কারণ ছিল এই যে. সরকারী সংগ্রহের ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও অনাচার অনিবার্য। তাতে বড় বড় জোতদাররা লেভি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে আর ছোট ছোট উৎপাদকদের, এমন কি ১০ একরের কম জমির উৎপাদকদের কাছ থেকেই সমস্তটা সংগ্রহ করার জন্য চাপ দেওয়া ও তাদের পীড়ন করা হবে। কার্যতও সেটাই ঘটেছিল।

সেই কারণে কৃষক সভার আহ্বানে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কৃষকদের উপর, বিশেষ করে অনেক ছোট কৃষকের উপর পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীদের ও পুলিসের পীড়ন ও অত্যাচার এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে "লেভি" ও "সিজ" শব্দ দুটি সর্বত্র একটা আতংকের বিষয় হয়ে পড়েছিল। এই লেভি ব্যবস্থা কৃষকদের মধ্যে কংগ্রেস সরকারকে অত্যন্ত অপ্রিয় ও ঘৃণার পাত্র পর্যন্ত করে তুলেছিল।

বারো

সরকারী খাদ্য সংগ্রহের ও বণ্টনের দুর্নীতি-মূলক ব্যবস্থার ফলে খাদ্য সঙ্কট তীব্র হয়ে ওঠে। ২৪ পরগনা জেলার ব্যাপক অঞ্চল দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। লক্ষ লক্ষ খেতমজুর, গরিব চাষী, ভাগচাষী এবং গরিব মধ্যবিত্ত ও কারিগর অনাহারে ও অর্ধাহারে থাকে, অখাদ্য কুখাদ্য খায় এবং অনেকে অনাহারে মারা যায় বা আত্মহত্যা করে। বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অনেকগুলি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দেয়। এই অবস্থায় কৃষক সভা স্থানীয়ভাবে রিলিফ আদায় বা সংগ্রহ ও বণ্টনের জন্য সংগঠনের কাজ করে।

দ্বাদশ সম্মেলন ঃ বাগনান

এই অবস্থার মধ্যে এবং লেভি-বিরোধী আন্দোলনের পর ২১-২৪ মে ১৯৫৩ তারিখে বাগনানে (হাওড়া) প্রাদেশিক সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন বসে। তখন কৃষক সভায় প্রাথমিক মেম্বর ছিল ১,০৪,০০০।

ইতিমধ্যে ভূমি সংস্কারের জন্য আইনের প্রথম কিস্তি জমিদারী দখল বিল প্রচার করা হয়।

বাগনান সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল এই বিল। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছিল ভাগচাষ সংক্রান্ত প্রস্তাব।

জমিদারী দখল বিল ভূমি ব্যবস্থার সম্বন্ধে একটা আংশিক ব্যবস্থামাত্র। কাজেই সামগ্রিকভাবে ভূমি সংস্কার আইনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবার পক্ষে এই বিল অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল। এইভাবে কিস্তিবন্দী আইন করার পিছনে কংগ্রেস সরকারের উদ্দেশ্য ছিল আসল প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া এবং পরবর্তী কিস্তিতে আইনে কী ধরনের ব্যবস্থা করা হবে সে সম্বন্ধে কৃষকদের কিছু জানতে না দিয়ে তার গোড়াপত্তন করে রাখা। এখানে এই বিলের প্রসংগে বিস্তৃত আলোচনা না করে পরে ভূমি সংস্কার আইন সমেত দুটো আইনের আলোচনা এক সঙ্গে করা হবে।

এখানে কেবল এইটুকু বলা যেতে পারে যে এই বিল মূলত কৃষক স্বার্থে না হয়ে জমিদার-জোতদারদের স্বার্থেই রচিত হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অচল হয়ে পড়ায় আইনত জমিদারী প্রথা তুলে দিয়ে জমির একচেটিয়া মালিকানা বড় বড় মালিকদের হাতে থাকতে দেওয়াই ছিল এই আইন রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই বিলে ব্যবস্থা ছিল সমগ্র আইনটিকে এক সঙ্গে জারি না করে খণ্ড খণ্ড ভাবে জারি করার এবং জমির মালিকদের স্বার্থের প্রতিকূল প্রত্যেকটি ধারাকে কাজে পরিণত করতে গড়িমসি করে যথাসম্ভব বেশি সময় ক্ষেপ করার যাতে আন্দোলনেব তীব্রতা নষ্ট হয়ে যায়। তাতে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল বেশি জমির মালিকদের উদ্বৃত্ত জমি বেনামী ও গোপন করার। মোট কথা, ভূমি সংস্কারের আসল উদ্দেশ্য এড়িয়ে যাবার জন্য বিলের মধ্যে বহু ছিদ্র ও সুযোগ সুবিধা রাখা হয়েছিল। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে বিলের গলদগুলি দেখিয়ে কৃষক সভার বক্তব্য প্রচার করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেজন্য প্রচার পুস্তিকা ("জমিদারী ক্রয় আইনের আসল চেহারা") প্রকাশ করা হয়, এবং ব্যাপক আন্দোলনও চালান হয়।

ভাগচাষ সম্বন্ধে প্রস্তাবে বিশেষ কোন নতুন দাবি ছিল না। কেবল আরো কিছু ব্যাখ্যা দিয়ে আন্দোলনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

সম্মেলনের পরে কৃষক কাউন্সিল মাঝে মাঝে বসে প্রয়োজন মতো সভার দাবি ও আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জমিদারী দখল আইন পাস হবার পর সে সম্বন্ধে কাউন্সিল প্রস্তাব গ্রহণ করে।

কলকাতায় খাদ্য সমাবেশ

বাগনান সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আবদুল্লাহ রসুল। কাউন্সিলের সম্পাদক নির্বাচিত হন হরেকৃষ্ণ কোঙার। বিহারের কৃষক নেতা এবং সারা ভারত কৃষক সভার প্রাক্তন সভাপতি কার্যানন্দ শর্মা ও সারা ভারত সভার সম্পাদক এন. প্রসাদ রাও এই সম্মেলনে যোগদান করেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে যোগ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেন।

প্রতিনিধি সম্মেলনের কাজ চলা কালে সম্মেলনের অন্যতম বিশিষ্ট সংগঠক জ্ঞান চক্রবর্তী সম্মেলন স্থলেই হঠাৎ মারা যান। মৃত্যুর প্রধান ও অব্যবহিত কারণ ছিল সম্মেলনের কাজে অত্যধিক পরিশ্রম ও নিয়মিত

আহারের অভাব। স্বভাবতই এই অস্বাভাবিক ঘটনায় তামাম সম্মেলনের উপর শোকের কালো ছায়াপাত ঘটে। শোকযাত্রা ও সৎকারের পর আবার সম্মেলনের কাজ চলতে থাকে।

সম্মেলনের কিছুদিন পরে চিতার পাশে একটি ছোট স্মৃতি স্তম্ভ তৈরি করা হয়।

সম্মেলনের পর খাদ্য সংকট আরো তীব্র হয়ে ওঠে। এই সময়ে খাদ্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য বামপন্থী রাজনীতিক দলগুলির দুটি সংগঠন ছিল—দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি ও খাদ্য অভিযান কমিটি। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন খাদ্য অভিযান কমিটির সঙ্গে একযোগে কাজ করতে প্রতিরোধ কমিটি প্রথমে রাজি ছিল না। কিন্তু ২৯ আগস্ট খাদ্য অভিযান কমিটির আহ্বানে কলকাতা ময়দানে খাদ্য ও রিলিফের দাবিতে গ্রাম ও শহরের লোকের বিরাট সমাবেশ হবার পর প্রতিরোধ কমিটি আর ঐক্যের পথ থেকে সরে থাকতে পারে না। তখন দুই কমিটিকে মিলিয়ে একটিই রাখা হয়, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির মধ্যে এই সকল দল একত্র হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করে।

এই আন্দোলন উপলক্ষে সে বছর (১৯৫৩) দুটি বৃহৎ জমায়েতের আয়োজন করা হয়েছিল—২৯ আগস্ট ও ২৮ সেপ্টেম্বর। কৃষক সভার নেতৃত্বে নিকটবর্তী জেলাগুলি, বিশেষত ২৪ পরগনা জেলা থেকে হাজার হাজার কৃষক এসে যোগ দেয়। ২৮ সেপ্টেম্বরের জমায়েতে প্রায় ২০ হাজার কৃষকের যে মিছিল আসে তা দেখে শহরের লোকের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা জাগে। এই সমাবেশ উপলক্ষে পূর্বাহ্নেই বেশ কিছু ধরপাকড়ও হয়। আন্দোলন থেকে যে সব দাবি তোলা হয় তার কিছু কিছু আদায় করা যায় কিন্তু সরকারের এবং বিশেষ করে খাদ্য মন্ত্রীর বিরোধীতার কারণে বেশির ভাগই আদায় হয় না। মজুতদারী-মুনাফাখোরী বন্ধ না করলে দাবি আদায় হওয়া কঠিন, অথচ কংগ্রেস সরকার তার শ্রেণী স্বার্থের প্রয়োজনে মুনাফাখোরী বন্ধ না করে বরং তাকে উৎসাহই দিতে থাকে।

ত্রয়োদশ সম্মেলন ঃ নঘরিয়া

প্রাদেশিক সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন হয় ১৯৫৪ সনের ৪ থেকে ৭ জুন তারিখে মালদহ জেলার নঘরিয়া গ্রামে। এই সম্মেলনে ভূমি সংস্কার

আইন, কৃষক উচ্ছেদ, ভাগচাষ, বর্গাদার অর্ডিন্যান্স, প্রজা উচ্ছেদ, সেটল-মেণ্ট জরিপ ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সময় মেম্বর ছিল ১,৮৫,৩৫৯।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আবহুর রাজ্জাক খাঁ। ৪৫ জন মেম্বার নিয়ে প্রাদেশিক কমিটি নির্বাচিত হয়। তার মধ্যে এই ১৫ জনকে নিয়ে নির্বাচিত হয় কাউন্সিল : সভাপতি—আবহুর রাজ্জাক খাঁ; সহ সভাপতি—অজিত বসু, ভবানী সেন ও বিশ্বনাথ মুখার্জি; সম্পাদক—হরেকৃষ্ণ কোঙার; সহ-সম্পাদক—অজিত গাঙ্গুলী, শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ও সুনীল সেন; কোষাধ্যক্ষ—বগলা গুহ; সভ্য—আবহুল্লাহ রসুল, হরিধন চক্রবর্তী, অনন্ত মাজি, শাহেহুল্লাহ, অমল গাঙ্গুলী এবং বিজয় মোদক।

১৯৫৩-৫৪ সনে ফসল ভালো হয়েছিল। তাসত্ত্বেও খাদ্য পরিস্থিতির যতটা উন্নতি করা সম্ভব ছিল তা করা হয় নি। কোন কোন অঞ্চলে প্রাকৃতিক হুর্যোগের কারণে ফসল নষ্টও হয়েছিল। তাছাড়া সামগ্রিক ভাবে গ্রামাঞ্চলের অর্থব্যবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পড়েছিল যে লক্ষ লক্ষ হুঃস্থ ও বেকার মানুষ ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে অনাহারী থাকতে বাধ্য হয়। সেজন্য প্রয়োজন হয় রিলিফের, টেস্ট রিলিফের কাজের, খয়রাতী সাহায্যের। রিলিফ আদায় ও সংগঠন করা এই সময়ে কৃষক আন্দোলনের একটা প্রধান কাজ হয়ে পড়ে। এই কাজের প্রয়োজন বিশেষ ভাবে দেখা দেয় খেতমজুরদের জন্য।

ভূমি সংস্কার দাবি, ভাগচাষীর ফসল, উচ্ছেদ, ক্যানাল কর, পাটের দর ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কৃষকদের আন্দোলন চলছিল। ভূমি সংস্কার এবং খাদ্য ও রিলিফের আন্দোলন সকল জেলাতেই কম বেশি পরিমাণে চলছিল। কিন্তু খুব জোরালো এবং প্রদেশ-ব্যাপী সংগঠিত আন্দোলন তেমন হচ্ছিল না। তাহলেও কৃষক সভা মোটের উপর সক্রিয় ও সংগঠিত ছিল।

চতুর্দশ সম্মেলন ঃ বড়া-কমলাপুর

এমনি পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৫৫ সনের ২৭ থেকে ৩০ এপ্রিল চতুর্দশ সম্মেলনের অধিবেশন হল হুগলি জেলার বড়া-কমলাপুরে। তখন প্রাথমিক মেম্বার ছিল ২, ১৯, ৮৬১। সভাপতিত্ব করেন আবহুল্লাহ রসুল।

এই সম্মেলনের শোক প্রস্তাবে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয় যাঁদের নাম তাঁরা ছিলেন নিত্যানন্দ চৌধুরী, গটু সহায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, আলবার্ট আইনস্টাইন ও আন্দ্রে ভিশিন্স্কি। গটু সহায় ছিলেন মধ্য ভারত কৃষক সভার সভাপতি। জমিদাররা গোপনে নৃশংস ভাবে তাঁকে হত্যা করে। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক ও কৃষক সভার ঘনিষ্ঠ সমর্থক। পাত্রসায়ের সম্মেলনে তিনি সভাপতি পরিষদের মেম্বরও ছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক থাকা কালে কৃষক সভার প্রথম কয়েক বছর সভার প্রচার বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন এবং কোন কোন সম্মেলনে নিজে যোগদানও করেছিলেন। আইনস্টাইন ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ভিশিন্স্কি সোবিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। নিত্যানন্দ চৌধুরী দীর্ঘকাল বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ভূমি সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে সম্মেলনের প্রস্তাব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

সম্মেলনে ৫১ জনের প্রাদেশিক কৃষক কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক হরেকৃষ্ণ কোঙার নঘরিয়ার মতো এখানেও পুনর্নির্বাচিত হন।

১৯৫৪ সনের আন্দোলনের ফলে সরকার ৯ই জুন উচ্ছেদ বিরোধী অর্ডিন্যান্স ও সেই সঙ্গে জমিদারী দখল আইনের সংশোধন অর্ডিন্যান্স জারি করতে বাধ্য হয়। উচ্ছেদ বিরোধী অর্ডিন্যান্সে ব্যবস্থা ছিল এই : মৌখিক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মহকুমা শাসকের নিকট দরখাস্ত করা যাবে এবং তিনি জমি ফেরতের নির্দেশ দিতে পারবেন। অর্ডিন্যান্স জারির পর উচ্ছেদ করা হলে তা পুলিস-গ্রাহ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

এই ব্যবস্থা জারি করার ফলে উচ্ছেদ বিরোধী সংগ্রাম আরো জোর ধরে। অনেক ক্ষেত্রে সংগঠিত শক্তির জোরে উচ্ছেদ বন্ধ করা হয়, অনেক ক্ষেত্রে আপসের পথ ধরা হয়। তামাম পশ্চিমবাংলায় ২০।২৫ হাজার উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলা হয়েছিল। আন্দোলন ও প্রচারের ফলে সেই সব মামলায় কৃষকরা অনেক সুবিধা লাভ করে, যদিও সরকারী কর্তৃপক্ষ সহজে মামলা-গুলির নিষ্পত্তি করতে চায় না। এ বিষয়ে অনেক ডেপুটেশনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। সব কিছুর ফলে কোর্ট ফি নেওয়া বন্ধ হয়, মামলা গ্রহণ করা ও নিষ্পত্তি করা সম্বন্ধে কিছু সুবিধা আদায় হয়। মামলার রায় বেশির

ভাগ ক্ষেত্রে কৃষকদের পক্ষে পাওয়া যায়। পরে আর একটা অর্ডিন্যান্স জারি করে বলা হয় যে মালিক যদি ইতিমধ্যে জমিতে চাষ করে থাকে তাহলে জমি ফেরত পাবার জন্য কৃষককে তার খরচের টাকা দিতে হবে। কৃষক সভা তার প্রতিবাদ করে কিন্তু ফল হয় না।

মামলার সাহায্যে যত উচ্ছেদ বন্ধ হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছিল আপসের মাধ্যমে। অনেক পরিমাণে দখল বজায় রেখেও উচ্ছেদ বন্ধ করা গিয়েছিল। একথা বলা যায় যে সরকারের আইনের ফলে যে ব্যাপক উচ্ছেদের অবস্থা দেখা দিয়েছিল তা অনেকাংশে প্রতিহত করা গিয়েছিল এবং তার ফলে গরিবদের মধ্যে সভার বুনিয়াদ আরো মজবুত হয়েছিল। সভার উপর তাদের আস্থা বেড়েছিল, এবং অনেক নতুন এলাকায় আন্দোলন প্রসার লাভ করেছিল। (সম্পাদকের রিপোর্ট, বনগাঁ সম্মেলন, পৃ ৪-৫।)

এই আন্দোলনের কারণে কৃষকদের জব্দ করার উদ্দেশ্যে জোতদার-মহাজনরা ধান কর্জ দেওয়া ব্যাপকভাবে বন্ধ করে দেয়। আবার অনাবৃষ্টির কারণে কয়েকটি জেলায় গরিবদের মধ্যে বেকারী বেড়ে যায়। খাদ্য সংকট তাদের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে। সরকারী সাহায্যের জন্য চেষ্টা করা হলে খাদ্য সাহায্য পাওয়া যায় না, শুধু কিছু আর্থিক সাহায্য ও রিলিফের কাজের আশ্বাস পাওয়া যায়। এই শোচনীয় অবস্থায় মধ্যে ২৪ পরগনায় অনেক ভাগচাষী জোতদারদের চাপে পড়ে ধান কর্জ পাবার জন্য মজুর কবুলিয়ত লিখে দিতে বাধ্য হয়।

উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের ফলে ভাগচাষীদের ফসল রক্ষা ও ন্যায্য ভাগ আদায়ের আন্দোলন জোরদার হয়। অন্যদিকে জোতদারদের বিরোধীতা তীব্রতর হয়, সরকারী দমন ব্যবস্থাও ব্যাপক হয়। সাধারণ ভাবে ভাগচাষ বোর্ডগুলির মনোভাব বরাবরকার মতো কৃষক-বিরোধী তো ছিলই, এখন তা আরো প্রকট হয়েছিল। তাই আন্দোলনের ভিত্তিকে আরো ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে কৃষক সভা সিদ্ধান্ত করে ছোট মালিকদের সঙ্গে আপসের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ভাগের আন্দোলনের সঙ্গে অন্যান্য কৃষক দাবির আন্দোলনকে ও অন্যান্য স্তরের কৃষককে যুক্ত করতে হবে। আন্দোলনের ক্ষেত্র এবার বেড়ে যায়। ভাগচাষ বোর্ডের বিরোধিতা সত্ত্বেও অন্তত ৫০,০০০ বিঘার ধান পঞ্চায়েত খামারে ওঠে।

আন্দোলনের ফলে অনেক জায়গায় তেভাগা আদায় হয়। তার চেয়ে বেশি হয় ন-আনা—সাত-আনা ভাগ। কয়েকটি বোর্ডও তেভাগার রায় দেয়, যেমন কাঁথি অঞ্চলে। (ঐ, পৃ ১০-১১) এই আন্দোলনের পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা হয়েছিল সরকারী দমনের অন্যায় ব্যবস্থা এবং ভাগচাষ বোর্ডগুলির যথেচ্ছাচার, সেজন্য আইনকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করা।

উন্নয়ন কর বিল বাতিল

উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বন্যা ও শস্যহানির ফলে রিলিফের প্রশ্ন তীব্র হয়ে ওঠে। কাজ, মজুরী, খাদ্য, ঋণ ও রিলিফের দাবিতে কৃষক সভা আন্দোলন করে এবং পি.আর. সি.র সহিত রিলিফের কাজে সহযোগিতা করে। সরকারী রিলিফ যেটুকু আদায় করা যায় তার পরিমাণ ছিল সামান্য এবং সে রিলিফ বণ্টনের ব্যাপারে দুর্নীতিও ছিল বিস্তর। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার কৃষক মেয়েদের ঢেঁকি লোনের দাবিতে আন্দোলন চলে। ঢেঁকিতে বা উদূখলে ধান ভেনে চাল বিক্রী করে অনেক মেয়ে নিজেদের জীবিকার জন্য কিছু উপার্জন করে। ধানের অভাবে তাদের সে রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। সেই কারণে কর্জ বা লোন হিসাবে তারা যে ধান পাবার জন্য সরকারের নিকট দাবি করে তাকেই ঢেঁকি লোন বলা হয়। এই দাবির আন্দোলনে প্রাদেশিক সভাও সাহায্য করে। মেয়েদের জোরদার আন্দোলনের চাপের ফলে কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ দাবি পূরণ করতে বাধ্য হয়।

এই বছর (১৯৫৪) সরকার "পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন (লেভী ও বিবিধ বিধান) বিল, ১৯৪৫" প্রচার করে। এই বিল ছিল সম্পূর্ণ গণতন্ত্র-বিরোধী ও স্বেচ্ছাচার-মূলক। তাতে বিভিন্ন খাতে তথাকথিত উন্নয়নের দোহাই দিয়ে নানা রকম পীড়নমূলক ট্যাক্স জারির ব্যবস্থা থাকে। সমাজের নিতান্ত গরিব স্তরগুলির উপরও এই অন্যায় ট্যাক্সের বোঝা চাপাবার ব্যবস্থা থাকে। জমির ফসল বেড়েছে বা মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে হবে, এই অজুহাতে ট্যাক্স ধার্যের ব্যবস্থা রাখা হয়। এমনি আরো অনেক রকম কর ধার্য করার প্রস্তাব করা হয় এই বিলে।

বিলটি প্রকাশ করার সাথে সাথেই প্রাদেশিক কৃষক সভা সে সম্বন্ধে আলোচনা করে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে দেয়। "জনস্বার্থ-বিরোধী উন্নয়ন কর বিল" নামে একটি প্রচার পুস্তিকা বার করে

বিলটির অনিষ্টকর ও জনবিরোধী চরিত্র ব্যাখ্যা করে (জানুয়ারি ১৯৫৫)। ৩৩ হাজার সই সংগ্রহ করে কয়েক দিনের মধ্যেই বিধান সভার অধ্যক্ষ বা স্পীকারকে গণ দরখাস্ত দেয়। বিলটি এমনই অযৌক্তিক ও স্বেচ্ছাচারমূলক যে শতাধিক কংগ্রেসী এম.এল.এ. পর্যন্ত এই বিল স্থগিত রাখবার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চাপ দেন। শেষ পর্যন্ত গবরমেণ্টকে এই বিলের আলোচনা বন্ধ রাখতে হয়। পরেও আর সে বিল আইন সভায় পেশ করা হয়নি।

উন্নয়ন কর বিলের চরিত্র যে এমন জনবিরোধী ছিল তার কারণ তার মূলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের উপদেশ। ই.এম. বার্নস্টাইনের নেতৃত্বে মার্কিন পরিচালিত আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থার এক প্রতিনিধিদল ভারতের পাঁচসালা পরিকল্পনার জন্য অর্থসংগ্রহ সম্বন্ধে সরকারের নিকট যে উপদেশ-মূলক রিপোর্ট দেয় এবং যা Economic Development With Stability নামে পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করে, তারই মধ্যে সেই উপদেশ লেখা আছে।

এই রিপোর্টে বলা হয়েছে: "পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলস্বরূপ বর্ধিত আয়ের একাংশ সরকারের জন্য দখল করার সর্বোত্তম আকাংক্ষিত পন্থাগুলির অন্যতম হল উন্নয়ন লেভি এবং সেচকর ও বিদ্যুৎ কর।" (পৃ ৭১)…"(সেচ কর, বিদ্যুৎ কর, রেল মাশুল ও অন্যান্য সরকারী কাজের ট্যাক্স সম্বন্ধে) সাধারণ নীতি হওয়া উচিত পুরো মূলধন খরচ ও পুরো নিয়মিত পরিচালনা খরচ আদায়ের চেষ্টা করা। মূলধন খরচের মধ্যে পড়বে লগ্নী করা মূলধনের সুদ ও (পুনর্নিমাণের জন্য) পর্যাপ্ত ক্ষয় পরিপূরক টাকা।" (পৃ ৭২) "কৃষিজাত ও অন্যান্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সেজন্য (সরকারের) প্রকৃত আয় ও (জনগণের) প্রকৃত বোঝা হ্রাস পাওয়ায় ভূমি রাজস্ব বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি করার পক্ষে জোরদার যুক্তি সৃষ্টি হয়েছে।" (পৃ৬৮) (কৃষক সভার প্রকাশিত "জনস্বার্থ-বিরোধী উন্নয়ন কর বিল"।)

সংকটের চাপে যে সব কৃষক জমি বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছিল তাদের জমি ফেরত পাবার অধিকারের জন্য কৃষক সভা আইন পাস করার দাবিতে আন্দোলন করে। শেষ পর্যন্ত একটা আইন পাস হয় এবং ডিসেম্বর মাসে (১৯৫৪) আইনটি জারি করার পর সেই মাসের মধ্যেই দরখাস্ত করতে বলা হয়। কৃষক সভার আন্দোলনের ফলে সময়টা বাড়িয়ে দিয়ে ফেব্রুয়ারির (১৯৫৫) শেষ পর্যন্ত দরখাস্ত দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। তথাপি সময় কম

থাকায় কৃষক সভার তরফ থেকে সংগঠিত ভাবে দরখাস্ত দেবার ব্যবস্থা করে ওঠা যায় না। অসংখ্য ব্যক্তি অবশ্য নিজেদের ব্যক্তিগত চেষ্টাতেও দরখাস্ত পাঠায়।

কিন্তু সরকার আইন করলেও তার কর্মচারীরা মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে কৃষকদের প্রতি বিরূপ মনোভাবই প্রকাশ করতে থাকে। ফলে জমি খুব কমই ফেরত পাওয়া যায়। একটা হিসাবে দেখা যায় মেদিনীপুর জেলার সদরে চার হাজার মামলার রায়ে মাত্র আটটি ক্ষেত্রে জমি ফেরত হয়েছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহ শতবার্ষিকী

এই বছর (১৯৫৫) কৃষক সভা সাঁওতাল বিদ্রোহের শতবার্ষিকী পালন করে। বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রচারের জন্য সভা আবদুল্লাহ রসুলের লেখা ("সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী") ও তার সাঁওতালী অনুবাদ ("হড় হপন কোয়া বিরাদ কাহনী") প্রকাশ করে। এই ইতিহাসের ঘটনাবলী অবলম্বনে পোস্টার চিত্র আঁকিয়ে বিভিন্ন জেলায়, বিশেষ করে বীরভূম ও সাঁওতাল পরগনা জেলায় অনেকগুলি সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকার মেলাতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। অনেক কৃষক সম্মেলনে এবং অন্যান্য সম্মেলনেও এই প্রদর্শনী খোলা হয়।

এ বছর কৃষক সভার তিন সংখ্যা সাংগঠনিক পত্রও প্রকাশ করা হয়েছিল। তার পূর্বে কয়েক বছর সাংগঠনিক পত্র প্রকাশ বন্ধ ছিল।

তের

সারা-ভারত কৃষক সভার পঞ্চদশ অধিবেশন হয় পশ্চিম বাংলায়, ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ শহরে, ১-২ নবেম্বর ১৯৫৭ তারিখে।

পঞ্চদশ সম্মেলন ঃ বনগাঁ

তার ঠিক পূর্বেই, ৩০-৩১ অক্টোবর প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনও বনগাঁতেই অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে কৃষক সভার মেম্বর ছিল ১,০১,৯৯৭। ১৯৫৬ সনে ছিল ১,৪৩,২৪৭। ১৯৫৬ সনে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়নি। বনগাঁ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আবদুল্লাহ রসুল।

সারা ভারত সম্মেলন বাংলা দেশে অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্বভাবতই এখানকার অনেক কর্মীই তার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারেননি। তাসত্ত্বেও সম্মেলনে অন্যান্য কাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা হয় এবং পরে তার সিদ্ধান্ত "বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবংগ প্রাদেশিক কৃষক সভার কর্তব্য" নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হয়।

আলোচনার বিষয়বস্তু পুস্তিকার নামেই প্রকাশ পেয়েছে। এ ছিল তখনকার বিশেষ পরিস্থিতিতে কৃষক সভার দাবি ও কর্মপন্থার ঘোষণা। তখন শুধু জমিদারী দখল আইনই নয়, ভূমি-সংস্কার আইনও পাস হয়ে গেছে, জারিও হয়েছে (যদিও অংশত)।

জমিদারী দখল ও ভূমি-সংস্কার আইনের ব্যবস্থা

ভূমি সংস্কারের আইন সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। জমিদারী দখল আইন পাস হয়েছিল ১৯৫৩ সনে এবং ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ সনে। জমিদারী দখল আইনে প্রধান ব্যবস্থা ছিল এই : ১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথা খতম করে সরকার সমস্ত জমিদারী ও অন্যান্য মধ্যস্বত্ব বা খাজনাভোগী স্বত্ব (অধীন রাইয়ত ও ঠিকা, সাঁজা, গুলো ইত্যাদি স্বত্ব সমেত)

গ্রহণ করবে। ২। সেজন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ; ৫০০ টাকা নিট আয়ের উপর ২০ গুণ থেকে হার কমতে কমতে এক লক্ষ টাকা ও তার বেশি নিট আয়ের উপর ২ গুণ পর্যন্ত হারে ক্ষতিপূরণ ধার্য হবে। ৩। এর নিচের কিছু অংশের জন্য সমস্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে নগদে, বেশি আয়ের কিছু অংশ নগদে আর বাকিটা ২০ বছরের বণ্ডে ; বণ্ডের দরুন সুদের হার তিন টাকা। ৪। জমিদারী দখলের তারিখ ১লা বৈশাখ ১৩৬১ (১৯৫৫)। ৫। খাস জমির মালিকরা প্রত্যেকে খাসে রাখতে পারবে সর্বোচ্চ পরিমাণ আবাদী জমি ২৫ একর, বাস্তু ও বাগান ইত্যাদি ১৫ একর, এবং অনির্দিষ্ট পরিমাণে দেবোত্তর ও ওয়াকফ প্রভৃতি ধর্ম ও দাতব্য কার্যের জমি এবং ফলের বাগান, পুকুর, দীঘি, মেছোঘেরি ইত্যাদি। ৬। খনি প্রভৃতির জমিও সরকার গ্রহণ করবে। ৭। সমস্ত বকেয়া খাজনা সরকার নিজ খরচে আদায় করে তার অর্ধেক মালিকদের দেবে। ৮। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সমস্ত জমি জরিপ করে পরচা (রেকর্ড অব রাইটস্) তৈরি করা হবে, তার পূর্বে ক্ষতিপূরণ বাবত প্রাপ্য টাকার এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেওয়া হবে। ৮। জরিপের দ্বারা উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে এবং সেই উদ্বৃত্ত জমি সরকারে ন্যস্ত (ভেস্টেড) হবে ; কোন্ দাগের জমি মালিকের খাসে থাকবে আর কোন্ দাগের জমি উদ্বৃত্ত বলে সরকারকে দেওয়া হবে, তার হিসাব এবং যাদের জোতে উদ্বৃত্ত জমি থাকবে না তাদেরও জমির হিসাব মালিকরা সরকারকে পাঠাতে বাধ্য থাকবে। ১০। কৃষি সমবায়ের বা আধুনিক কৃষি জোতের সীমা বাঁধা থাকবে না।

ভূমি সংস্কার আইনে প্রধান ব্যবস্থাগুলি ছিল এই : ১। জমির খাজনা বাড়ানো হবে, বাকি খাজনা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারি করা হবে। ২। বর্গাদারদের অংশ তেভাগার পরিবর্তে ফসলের শতকরা ৬০ ভাগ হবে। ৩। কোন কোন শর্তে বর্গা জমির মালিকরা বর্গাদার উচ্ছেদ করে জমি খাস করে নিতে পারবে, সেজন্য ভাগ কোর্টের রায় নিতে হবে। ৪। লাখরাজ বা নিষ্কর জমির উপর খাজনা ধার্য করা হবে। ৫। ২ একর পর্যন্ত জোত নিষ্কর হবে। ৬। এক বিঘা পর্যন্ত বাস্তু জমি নিষ্কর হবে যদি সেজন্য দরখাস্ত করা হয় এবং প্রমাণ করা যায় যে সেটা বাস্তু জমি। ৭। বড় মালিকদের যে সমস্ত উদ্বৃত্ত জমি সরকারে ন্যস্ত (ভেস্টেড) হবে

তা খেতমজুর ও গরিব কৃষকদের বিনামূল্যে জমি বণ্টন করে দেওয়া হবে।

আইন ফাঁকি দেবার ব্যবস্থা

জমিদারী দখল আইনের খসড়া প্রকাশ করার আগে থেকেই, এ-রকম সম্ভাবনা আছে জেনে বা অনুমান করে, বড় জমিদার-জোতদারেরা প্রচুর জমি থেকে কৃষকদের নানা কৌশলে উচ্ছেদ করতে থাকে, আমলনামা প্রভৃতি মারফত প্রচুর সালামী আদায় করে জমি বন্দোবস্ত দিতে থাকে, এবং আত্মীয়-বন্ধু বা চাকর-বাকরের নামে, এমন কি পোষা জীব-জন্তুর নামেও বেনামী করে রাখার ব্যবস্থা করতে থাকে। গোচর, শ্মশান, গোরস্তান, ভাগাড় প্রভৃতি বিবিধ স্বত্বের জমি খাস করে নেয়। আইন ফাঁকি দেবার এই ব্যবস্থা দীর্ঘ সময় ধরে চলে কিন্তু সরকারী তরফ থেকে বাধা দেওয়া হয় না, বরং পরোক্ষভাবে উৎসাহই যোগান হয়। উচ্ছেদের হিড়িকে অসংখ্য কৃষক জমিহীন হয়ে পড়ে। আবার অনেক সম্পন্ন কৃষক নিজেদের জোত বাড়িয়ে নেবারও সুযোগ পায়। একদিকে জমিহীনের সংখ্যা, অন্যদিকে বড় জোতের মালিকের সংখ্যা বেড়ে যায়।

প্রসংগত ঐখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাদেশিক কৃষক সভার সাংগঠনিক পত্রে (১ম সংখ্যা, ৮ জুন ১৯৪৮) কংগ্রেস রাজত্বে ভূমি সংস্কার আইনের সম্ভাবনা বিচার করে বলা হয়েছিল : "রাইয়তওয়ারী ব্যবস্থাভুক্ত জমিতে আজ খোদ-চাষী জমির মালিক নয়। এখানেও কায়েমী স্বার্থ অকৃষক ও পরজীবী উৎপাদনের এক বিরাট অংশ আত্মসাৎ করিয়া কৃষককে চরম দারিদ্র্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। অপর পক্ষে বর্তমানে খোদ-চাষীর মধ্যে শতকরা ৫০।৬০ ভাগেরও অধিক চাষীর জীবিকা-উপযোগী জমি নাই। যদি জমি এমনভাবে বণ্টন করা না হয় যাহাতে প্রতি চাষী পরিবারের জীবিকা-উপযোগী জমি থাকে, তবে বর্তমানের ন্যায় জমি হইতে চাষীকে উৎখাতের গতি অব্যাহত চলিবে, ইহারা দ্রুত ভূমিহীনে পরিণত হইবে, আধিয়ার, খেতমজুর, ও এই নূতন নূতন ভূমিহীনের সংখ্যা মিলিয়া কলের মজুরদের ন্যায় গ্রামে এক বিরাট উদ্বৃত্ত মজুর বাহিনী সৃষ্টি করিবে যাহার ফলে কায়েমী স্বার্থের শোষণের ক্ষমতা আরো বাড়িবে।

"...বাংলায় কৃষকের দারিদ্র্য চরমে পৌঁছিয়াছে। ইহাদের আর্থিক ক্ষমতা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় জমিদারী উচ্ছেদের

সম্ভাবনায় জমিদার, জোতদার, ধনী মহাজনের দল কৃষককে উৎখাত করিয়া যত অধিক সম্ভব জমি খাস করিয়া লইতেছে। ইহার ফলে জমিদারী উচ্ছেদের পর খোদ-চাষীর হাতে জমি অতি অল্পই থাকিবে এবং বর্তমানে কৃষকের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে যে সামান্য জমিও থাকিয়া যাইবে. তাহাও অচিরেই এই কায়েমী স্বার্থের কবলে আসিয়া পড়িবে।

"কংগ্রেসী সরকারের সর্বনাশা নীতি এইভাবেই গ্রাম্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে জমিদারীর স্থানে আর একটি প্রবল ও বড় দলের কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করিতে চলিয়াছে। সুতরাং আজ জমিদারী উচ্ছেদের পিছনে চাষীর স্বার্থের বিরুদ্ধে, কৃষি সমস্যার প্রকৃত সমাধানের বিরুদ্ধে এই গভীর ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিতে হইবে।" (পৃঃ ১৩-১৪)

"জমিদারী উচ্ছেদ ও লাঙল যার জমি তার—এই দাবির লড়াই হইবে আমাদের বর্তমান মূল লক্ষ্য। জমি সমস্যা, কৃষকের দারিদ্র্য, খাদ্য প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ উহাই। সুতরাং প্রত্যেক লড়াই বা আন্দোলনের পিছনে সমগ্র কৃষকের সমর্থন চাই। কৃষককে উচ্চতম দেশ-প্রেম ও শ্রেণীস্বার্থের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।" (পৃ ১৭-১৮)

কৃষক সভার দাবি

এই দুই আইন সম্পর্কে কৃষক সভার প্রধান সমালোচনা ও দাবি ছিল এই: ১। মধ্যস্বত্বভোগীদের জমিদারী নেবার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত নয়, তবে ছোট মালিকদের ক্ষেত্রে, তাদের অন্য আয় না থাকলে, কিছুকালের জন্য ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ২। খাস জোতের পরিমাণ কমাতে হবে। ৩। বকেয়া খাজনা সমস্ত মকুব করতে হবে। ৪। দেবোত্তর, ওয়াকফ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রকৃত দাতব্য ব্যবস্থা যতটুকু আছে তারই জন্য ব্যয়ের সুযোগ দিতে হবে। ৫। খাজনা প্রথার পরিবর্তে আয়কর প্রবর্তন করতে হবে এবং সেজন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়কে করযোগ্য নয় বলে ধার্য করতে হবে। ৬। মেছোঘেরির দখল নিতে হবে এবং তার মধ্যে যতটা আবাদী জমি ছিল তাকে আবার চাষের জন্য রেখে বাকি অংশে মাছের চাষ করতে হবে। ৭। কৃষকদের ও অল্প জমির অকৃষক মালিকদের জোতের খাজনার হার কমাতে হবে। ৮। বাকি খাজনার বা দেনার জন্য সার্টিফিকেট জারি করা চলবে না এবং জমি বা হাল-বলদ ইত্যাদি ক্রোক করা চলবে না। ৯। কৃষককে তার জমির পূর্ণ মালিকানা দিতে

হবে, যে নতুন জমি বণ্টন করা হবে তারও। ১০। কৃষকদের জন্য ১০ বিঘা পর্যন্ত আবাদী জমি এবং ১০ কাঠা বাস্তু জমি নিষ্কর করতে হবে। ক্ষেত-মজুরদের বাস্তুর জন্য বিনা মূল্যে ১০ কাঠা নিষ্কর জমি দিতে হবে। ১১। ভাগচাষীকে সরাসরি তেভাগা দিতে হবে এবং নিজ খামারে ধান তোলবার অধিকার দিতে হবে। ১২। আদিবাসীদের জমি ও স্বত্ব রক্ষায় ব্যবস্থা করতে হবে। ১৩। শ্মশান, গোরস্তান, ভাগাড়, গোচর ও অন্যান্য সর্বসাধাণের ব্যবহার্য বিবিধ স্বত্বের জমি সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে ১৪। নন্দী, খাল. ঘেরি, বাঁওড় প্রভৃতির বাঁধবন্দীর ষোলআনা দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। ১৫। নদী. জলা, বিল, বাঁওড় প্রভৃতি দখল করে বিনা ট্যাক্সে মৎস্যজীবীদের ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের অবাধ ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। ১৬। ১৯৫৩ সনের মে মাস থেকে জমিদারদের যত জমি হস্তান্তর করা হয়েছে তা নাকচ করতে এবং হস্তান্তরিত জমি যাদের দেওয়া হয়েছিল তাদের টাকা ফেরত দেওয়াতে হবে। ১৭। কৃষি সমবায়কে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক করতে হবে এবং তাতে যোগ দেবার ও তার থেকে বেরিয়ে আসবার অধিকার দিতে হবে।

এগুলি ছাড়া আরো কতকগুলি দাবি ছিল। আইনের বিভিন্ন ধারাকে কাজে পরিণত করা সম্বন্ধে সরকারী বা আমলাতন্ত্রী বাধা আসবার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেও কিছু দাবি ও হুশিয়ারির কথা তোলা হয়েছিল। বাগনান, নঘরিয়া, বড়া-কমলাপুর ও বনগাঁ সম্মেলনে এবং তার মাঝে মাঝে কৃষক কমিটি ও কাউন্সিলেও এ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। উপরের দাবি ও বক্তব্যগুলি তারই মধ্যে ছিল। আইন দুটিকে সমগ্রভাবে জারি না করে মাঝে মাঝে অংশ বিশেষ জারি করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সামগ্রিক ভাবে জারি করার দাবি ঘোষণা করা হয়েছিল।

জরিপের দুর্নীতি

এর মধ্যে আর এক সমস্যা দেখা দেয় জরিপের কাজ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে। জমিদাররা জরিপের কাজে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে যোগসাজস করে ছোট ছোট রাইয়ত, অধীন-রাইয়ত, কোর্ফা ও উঠবন্দী প্রজা. চাকরান স্বত্বের প্রজা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অশিক্ষিত বা গরিব ও দুর্বল পক্ষের জমি নিজেদের খাসে রেকর্ড করতে থাকে। এই অনাচার ও দুর্নীতি ব্যাপকভাবে চলতে থাকে, কতকগুলি ক্ষেত্রে কর্মচারীরা ঘুষ খেয়ে

ধরাও পড়ে যায়। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ এই চক্রান্ত দমন করবার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। তখন কৃষকদের জমি রেকর্ড করানোই হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন জেলার কৃষক কমিটিগুলির প্রধান কাজ ও আন্দোলনের বিষয়।

এ রকম যে ঘটবে তা অবশ্য সভা আগেই অনুমান করেছিল এবং সে জন্য হুশিয়ারিও দিয়েছিল। কিন্তু তখনো ঠিক বুঝতে পারেনি দুর্নীতি এত বেশি ব্যাপক হবে, সরকারী কর্তৃপক্ষ তা দমন করা সম্বন্ধে এত বেশি উদাসীন থাকবে, এবং জমিদারদের জমির লোভ মাত্রা ছাড়িয়ে এমন সীমাহীন পর্যায়ে চলে যাবে।

কর্মচারীদের সঙ্গে জমিদারদের কারবার চলত প্রধানত রাত্রির অন্ধকারে। খানাপুরীর সময়ে মাঠে বসে ফরমে যা রেকর্ড করা হল, পরে ঘরে গিয়ে তা কেটে বদলে দেওয়া হল। নিয়ম অনুসারে ফরমের খসড়া রেকর্ড একবার মাত্র লাল কালিতে কাটা চলে। কিন্তু একাধিক বার কাটাই হয়ে পড়েছিল নিয়ম। এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পূর্ব বন্দোবস্ত বা চুক্তি অনুসারে প্রথমেই জমিদারের স্বার্থে রেকর্ড করা হল ভুল। গরিব রাইয়তের সাবাস্ত দাবি ও মিনতির সঙ্গে আর্থিক সংযোগের ফলে সেটা কেটে বদলানো হল। পরে আবার মালিকের আর্থিক সংযোগের মাত্রাধিক্য দেখা গেলে সেটাও আবার কেটে পরিবর্তন করে প্রথম রেকর্ড ঠিক রাখা হল। ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে দরখাস্ত আহ্বানের জন্য খসড়া টাঙ্গিয়ে (ডি. পি.) দেবার পর অসংখ্য জায়গায় একাধিক বার কাটা দেখে প্রাদেশিক কৃষক কমিটি তখনকার ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন পাঠিয়ে অভিযোগ করলে তিনি বলেন অভিযোগ সত্য হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, এবং অভিযোগ সত্য কিনা জানবার জন্য বিশেষ বিশেষ জায়গায় কর্মচারী পাঠাবেন। কিন্তু সেজন্য কেউ যায়ওনি, কিছু কারাও হয়নি। ফলে ভুল ও মিথ্যা রেকর্ড করে বহু লোককে অন্যায়ভাবে তাদের জমি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, সরকার তার কোন প্রতিবিধান করেনি।

আগাগোড়া এই হল কৃষক সভার অভিজ্ঞতা। অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য যেখানে আইনের অভাব সেখানে আইনের জন্য আন্দোলন করতে হবে। যদি আইন পাস হয় তো তার মধ্যে বহু ইচ্ছাকৃত ফাঁক রাখা হবে কায়েমী

১৩·

স্বার্থের সুবিধার জন্য। সেই ফাঁক পূরণের জন্য আবার চাই আন্দোলন। ফাঁক যেখানে নাও থাকে সেখানে সরকারী কর্মচারীরা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার কারণে, তাদের শ্রেণী স্বার্থের কারণে, অথবা দুর্নীতির কারণে দুর্বল পক্ষের স্বার্থের বিরুদ্ধে নানা কৌশলে আইনকে ফাঁকি দেবে, আইনের বিরোধিতা পর্যন্ত করবে। তার বিরুদ্ধে আপিল করতে হল খরচ ও হয়রানী আছে। তখন আবার তার বিরুদ্ধে আন্দোলন চাই। এর সঙ্গে বিবিধ উপায়ে আদালত ও পুলিসের দিক থেকে হয়রানী আছে। মোট কথা, কৃষকের ও গরিবের স্বার্থের বিরুদ্ধে শোষক শ্রেণীদের স্বার্থ, তাদের স্বার্থের অনুকূল আইন ও আদালত এবং শাসন ব্যবস্থা, সেই আইনের দ্বারা প্রভাবিত সমাজ ব্যবস্থা —এ সবই কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষক সভার কাজে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে এসেছে, এখনো করছে।

এই অবস্থা পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া এই সামাজিক অবস্থা বদলাবে না। সেই কাজেই হাত দিয়েছে কৃষক সভা আর সেই পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। এই কাজে সফল হতে হলে সমগ্র কৃষক সমাজকে, বিশেষ করে সমস্ত মেহনতকারী কৃষককে রাজনীতি-সচেতন ও সুশংখলভাবে সংগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন, এটাই এখন কৃষক সভার মত ; সমস্যার সমাধানের উপায় এই রাজনীতি ও সংগঠন।

সম্মেলনের ঘোষণা

বনগাঁ সম্মেলন (৩০-৩১ অক্টোবর ১৯৫৭) থেকে যে ঘোষণা বা কৃষক সভার নীতি ও কর্মসূচী সংক্রান্ত বিবৃতি প্রচার করা হয়েছিল তার মধ্যে ভূমি ও কৃষি সমস্যা এবং কৃষক সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসী সরকারের নীতি ও ব্যবস্থা এবং তার চরিত্র ও ফলাফল বিশ্লেষণ করে কৃষক সভার কর্তব্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্তগুলি লিখিত হয়েছিল। তার মূল বক্তব্যগুলি ছিল এই :

"পশ্চিমবাংলায় কৃষি সংকট প্রশমিত হওয়া দূরের কথা, তাহা বৎসরের পর বৎসর আরো তীব্রতর হইতেছে।

"ইহার প্রধান বহিঃপ্রকাশ হিসাবে দেখা যাইবে যে খাদ্য সংকট শুধু স্থায়ী হইয়াছে তাহাই নহে, প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষের অবস্থার মতো ভয়ংকর রূপ লইতেছে। মুদ্রাস্ফীতির পাশাপাশি গ্রাম্য সমাজে দ্রুত ক্রয়শক্তি হ্রাস, ব্যাপক উচ্ছেদ ও জমি হস্তান্তরের ফলে কৃষকদের মধ্যে ভূমিহীনতা বৃদ্ধি

এবং খেতমজুরদের মধ্যে বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি, কৃষি ক্ষেত্রে ঋণের অভাবে মূলধন সংকট ও মহাজনী শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্য-মূল্যের সহিত শিল্পজাত পণ্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৈষম্য—এ সমস্তই ঘনীভূত কৃষি সংকটের সাক্ষ্য দিতেছে। সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির মধ্যে এই সংকটের আঘাত সবচেয়ে বেশি পড়িতেছে কৃষির উপর। সমগ্র কৃষক সমাজের মধ্যে এই সংকটের আঘাত সবচেয়ে বেশি পড়িতেছে মাঝারি চাষী, গরিব চাষী ও খেতমজুরদের উপর।" (বনগাঁ বিবৃতি, পৃ ২)

ঘোষণায় বলা হয়েছে এই সংকটের কারণ কৃষিতে সামন্তবাদের শক্তিশালী জের, মহাজনী শোষণ, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির লুণ্ঠন এবং সরকারী নীতির দ্বারা পুষ্ট একচেটিয়া পুঁজির ক্রমবর্ধমান শোষণ। এ সবেরই পরিণতি হিসাবে গরিব কৃষক ও খেতমজুররা জমি পায়নি; বরং বিপুলসংখ্যক গরিব কৃষক উচ্ছেদ হয়েছে। ঋণের বোঝা, দরের বঞ্চনা ও ট্যাক্সের পীড়ন কমেনি, বরং বেড়েছে। সেই সঙ্গে গ্রাম্য জীবনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। (ঐ, পৃ ২-৩)

"প্রভূত জমির মালিক বড় জমিদার-জোতদাররা সংহত হইয়াছে, গ্রাম্য জীবনে তাহাদের প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যদিকে গরিব কৃষক, বর্গাদার ও খেতমজুরদের মধ্যে জমিহীনতা, বেকারী, দুঃস্থতা ও অসহায়তা বোধ বাড়িয়েছে। একদিকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে প্রভূত জমি ও অর্থ এবং অন্যদিকে বিপুল-সংখ্যক জমিহীন ও কর্মের সুযোগহীন দুঃস্থ কৃষকের সংখ্যাবৃদ্ধি—এই অবস্থা উন্নততর প্রথায় চাষের পথে অন্তরায় হইয়া থাকিতেছে এবং বড় মালিকেরা গরিবদের দুঃস্থতা ও অসহায়তার সুযোগ লইয়া অনেক ক্ষেত্রে মজুর কবুলিয়ত বা ঠিকাভাগ প্রভৃতি নামে আরো পীড়নমূলক অথচ প্রচ্ছন্ন সামন্তবাদী কায়দায় তাহাদের জমি চাষ করাইবার সুযোগ পাইতেছে।" (ঐ, পৃ ৫)

একচেটিয়া পুঁজির কর্তৃত্ব

"...বকেয়া ঋণের বোঝা হইতে কৃষকদের নিষ্কৃতি দেওয়া হয় নাই। ফলে সামন্তবাদী মহাজনী পীড়ন ও দাদনের বোঝা বাড়িতেছে। জমি বিক্রী কোবালা না করিয়া, কম দরে মজুরী বা ফসল অগ্রিম বিক্রয় না করিয়া, অত্যন্ত চড়া সুদ না দিয়া ঋণ পাওয়া দায় হইয়াছে। [পৃ ৫] কৃষক ও কৃষি ব্যবস্থা বিশেষভাবে আঘাত খাইতেছে বিদেশী মূলধন ও

[দেশী] একচেটিয়া পুঁজির শোষণ হইতে।…[ফলে] শুধু বাজার দরের বঞ্চনাই নহে, বিদেশী ও একচেটিয়া পুঁজির মুনাফার যূপকাষ্ঠে জাতীয় সম্পদের মোটা অংশ বলি হওয়ায় কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষক কমই সাহায্য পাইতেছে, অথচ কৃষক ও জনসাধারণের উপর ট্যাক্সের বোঝা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। [পৃ ৬]…[এই] একচেটিয়া শোষণ ও সামন্তবাদের অবশিষ্ট জঞ্জাল সমগ্র শাসন-যন্ত্রকে দুর্নীতিগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারই ফলে কৃষির উন্নতির নামে যাহাও বা খরচ হয় তাহারও যথাযোগ্য সুবিধা হইতে সাধারণ কৃষকরা বঞ্চিত হয়।" (পৃ ৭) "আইনের দেওয়া সুযোগ হইতে কৃষকদের বঞ্চনা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়াছে।" (পৃ ৭)

আরো বলা হয়েছে : দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস সরকার দেশের ও কৃষির পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাকে কাজে না লাগিয়ে কৃষি সংকটকে ঘনীভূত করে তুলেছে। তার অন্যতম প্রধান কারণ সরকারী নীতি অনুসারে "জাতীয় অর্থনীতিতে একচেটিয়া ধনিক গোষ্ঠীর শক্তিবৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। একচেটিয়া ধনিকরাই দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। গ্রামের বাজার পর্যন্ত ইহাদের করায়ত্ত। ইহাদের অনুপ্রবেশ এখানে আরো গভীর হইয়াছে। সরকারের নীতি ইহাদেরই স্বার্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত।" (ঐ, পৃ ৭-৮)

"এই একচেটিয়া ধনিক শক্তির প্রাধান্য এবং তাহার সঙ্গে বিদেশী পুঁজির শোষণ ও সামন্তবাদের অবশেষ, এইগুলির ফলেই জাতীয় পুনর্গঠনের পথে বাধা সৃষ্টি হইয়াছে এবং কৃষি-সংকট ঘনীভূত হইতেছে।" (পৃ ১১)

"এই অবস্থায় ঘনীভূত কৃষিসংকট গোটা পশ্চিমবংগকে বিপর্যয়ের মুখে আনিয়া ফেলিয়াছে। খাদ্যোৎপাদনে ঘাটতি এবং উৎপন্ন খাদ্যের উপর মুষ্টিমেয় সামন্তবাদী চক্র ও ফাটকাবাজদের অধিকতর দখল খাদ্যসংকটকে তীব্রতর করিয়াছে।…সেইজন্যই কৃষি সংকটকে রোধ করা এবং কৃষির দ্রুত পুনর্গঠনের ও কৃষকদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সংগ্রাম করা আজ অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।" (পৃ ১০)

গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন ও ভূমি-সংস্কার

জাতীয় পুনর্গঠন ও শিল্পায়নের সাথে কৃষির পুনর্গঠন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলে এই নতুন পরিস্থিতিতে কৃষক সভার মূল শ্লোগান হল : "দেশের গণ-

তান্ত্রিক পুনর্গঠনের অংগ হিসাবে কৃষির পুনর্গঠনের ও অবাধ বিকাশের জন্য সংগ্রাম।"

বনগাঁ ঘোষণায় এই লক্ষ্য সাধনের জন্য যেসব মৌলিক ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়েও এক সামগ্রিক দাবির কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়, কৃষির পুনর্গঠনের জন্য সবচেয়ে প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভূমি-সংস্কার। সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রধান দাবির প্রশ্নও তোলা হয়েছিল।

দাবিগুলির ভিত্তিতে সামগ্রিক আন্দোলনের জন্যও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। সরকারের জন-বিরোধী নীতিই সংকটের মূল কারণ বলে এই নীতিকে পরাস্ত করার জন্য তার স্বরূপ প্রকাশ করা, তার বিরুদ্ধে ব্যাপকতম ঐক্য ও শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করা এবং কৃষক সভার বিকল্প নীতির ভিত্তিতে প্রচার অভিযান চালানো ছিল এর প্রথম নির্দেশ। দ্বিতীয় নির্দেশ ছিল সরকারের কৃষিসংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলিকে, সে যতই সীমাবদ্ধ হ'ক, কৃষকের স্বার্থে যথাসম্ভব ব্যবহার করা ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের দ্বারা সেগুলিকে উন্নত করার জন্য আন্দোলন চালানো। তৃতীয় নির্দেশ ছিল কৃষকের দৈনন্দিন জীবনের সহিত জড়িত প্রত্যেক বিষয়ে গঠনমূলক কাজ সংগঠিত করার উপর জোর দেওয়া। (কাকদ্বীপ রিপোর্ট, পৃ ৪)

বনগাঁ সম্মেলনের পূবে ভূমিসংস্কার আইন সম্পর্কে অনেক সংশোধনের কথা বলা হলেও কৃষক সভা এই আইনকে কৃষক স্বার্থের পক্ষে যতটা সহায়ক হবে মনে করেছিল, বনগাঁ সম্মেলনে এই আইনের কার্যকারিতা বিচার করে সে ধারণা কিছু পরিবর্তন করা হয়। যেমন, এখন পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি জোর দেওয়া হল জোতের সর্বোচ্চ সীমা ব্যক্তির পরিবর্তে পরিবার ভিত্তিতে নির্ধারণ করার উপর। কিন্তু এখনো "প্রকৃত" ভূমি সংস্কারের কথা বলা হয়নি যা পরবর্তী সম্মেলনে (কাকদ্বীপ, ১৯৬০) বলা হয়েছিল। অবশ্য নৎটিয়া প্রস্তাবেও (১৯৫৪) তা বলা হয়েছিল অনেকটা সাধারণভাবে।

এই ঘোষণায় আর একটি প্রশ্ন তোলা হয় এই যে কৃষির পুনর্গঠন সমস্যার সমাধান ভারতীয় অর্থব্যবস্থার "ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে" হবে না, তাই "কৃষক সভার লক্ষ্য হইল অধনতান্ত্রিক সমবায় কৃষি অর্থনীতির বিকাশ।" (বনগাঁ ঘোষণা পৃ ১৫)। ভারতীয় অর্থব্যবস্থার গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে এ লক্ষ্যের সামঞ্জস্য বিধান করতে যাওয়া ছিল বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিপন্থী। মনে হয় তখন সোবিয়েত কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রভাবে

অনেক সমাজবাদী দেশে ও কমিউনিস্ট পার্টিতে সন্থ-স্বাধীন দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে অধনতান্ত্রিক পথের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলছিল, কৃষক সভার এই সিদ্ধান্তের মূলেও ছিল তার প্রভাব।

দলিলের রাজনীতিক গুরুত্ব

"সমস্ত স্তরের কৃষকদের ব্যাপকতম একতা এবং গ্রাম্য জনগণের সর্বাংগীন একতা"র (পৃ ১৭) উপর এই বিবৃতিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আন্দলনের সাফল্যের পক্ষে এই একতা অবশ্যই যথেষ্ট সহায়ক ও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু শ্রেণী স্বার্থের দিক থেকে বিভিন্ন স্তরের কৃষকদের ও অন্যান্য গ্রাম্য জনগণের অবস্থান বিচার করে এই প্রয়োজনের কথা বলা হয়নি। তাই মনে হয় কৃষক সভার এই দলিলে সেই সকল স্তর সম্বন্ধে শ্রেণীগত মূল্যায়নের দিকে নজর না দিয়েই কেবল সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক জনগণের ঐক্যের মতো এই একতার প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

অথচ তার পূর্বে বড়া-কমলাপুর সম্মেলনের (১৯৫৫) "কৃষক ঐক্যের আহ্বান" প্রস্তাবে বলা হয়েছিল: "কৃষক সভায় মূল ঘোষিত লক্ষ্য হইল কৃষি ব্যবস্থায় সামন্ত প্রথার অবসান, সমস্ত শোষণ ব্যবস্থা হইতে সকল কৃষকের মুক্তি এবং সামগ্রিকভাবে দেশের গণতান্ত্রিক পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদনের ও কৃষক সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য প্রয়োজন কৃষক সমাজের সর্বাপেক্ষা সংগ্রামী অংশ খেতমজুর ও গরিব কৃষকের উপর নির্ভর করিয়া সকল স্তরের কৃষককে ঐক্যবদ্ধ করা, অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সহিত তাহাদের মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা এবং নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে কৃষকদের সংগ্রাম পরিচালনা করা।" (বড়া-কমলাপুর রিপোর্ট, পৃ ৪৩)

মোটের উপর এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে কৃষক সভার আন্দোলন পূর্বের কয়েক বছরে যে তার রাজনীতিক গুরুত্ব হারিয়ে অনেক পরিমাণে অর্থনীতিক পর্যায়ে গিয়ে পড়েছিল, বনগাঁ সম্মেলনের এই দলিল তাই থেকে তাকে তুলে আনবার একটা উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। ইতিমধ্যে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলির ও তার প্রয়োগ ব্যবস্থার কিছু মূল্যায়ন করবার সুযোগ হয়েছিল এবং কংগ্রেস সরকারের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কেও, শুধু কৃষক সভার নয়, সাধারণ মানুষের ধারণাও অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় ঘোষণাটির অবশ্য যথেষ্ট মূল্য ও গুরুত্ব ছিল।

চোদ্দ

বনগাঁ সম্মেলনে প্রাদেশিক কৃষক সভা যে সব সিদ্ধান্ত ও কাজের প্রোগ্রাম গ্রহণ করে সে অনুসারে কাজ আরম্ভ করতে দেরি হয়। এজন্য পুরনো কাজের ধারার মধ্যে যে পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল তাকে কাজের মধ্যে প্রতিফলিত করতে বিলম্ব ঘটা অস্বাভাবিক ছিল না। তবে এদিকে নেতৃত্বের নজর ছিল না বলা যায় না।

ষোড়শ সম্মেলন ঃ কাকদ্বীপ

সভার ষোড়শ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আড়াই বছর পরে, ১৫-১৭ এপ্রিল ১৯৬০ তারিখে, ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপে। এই সম্মেলনে সম্পাদকের যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল তাতে এই আড়াই বছরের আন্দোলনের কিছু বিবরণ ছিল।

জমিদারী দখল আইন ও ভূমি সংস্কার আইন এবং তার প্রয়োগ সম্বন্ধে কৃষক সভা অবশ্য কোন সময়েই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি। তাহলেও আশা করেছিল যে আইনের মৌলিক দোষত্রুটি ও ফাঁক সত্ত্বেও তার দ্বারা কৃষকেদের কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে আশা নির্মূল হয়ে গেল।

সম্পাদকের রিপোর্টে এই দুই আইন সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "গত দুই বৎসরের প্রয়োগের মধ্য দিয়া ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে এগুলির ব্যর্থতা আরো পরিস্ফুট হইয়াছে। শুধু ব্যর্থতাই নহে, ভূমি ব্যবস্থাকে উহা আরো জটিল করিয়াছে ও ভবিষ্যৎ প্রতিকার ব্যবস্থাকে আরো দুরূহ করিয়াছে।" (কাকদ্বীপ সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট, পৃ ৫)

ঋণ সমস্যা সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "ঋণের সমস্যা ও দাদনের জলুম এই দুই বছরে আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে।" (পৃ ১০) সরকারী ও সমবায় ঋণ সামান্যই পাওয়া যায়। তাই কৃষকদের প্রধানত নির্ভর করতে হয় মহাজন ও ব্যবসাদারদের উপর। তাই পাট, রবিশস্য ও ধানের জন্য পর্যন্ত মাঠের

ফসল বাজার দরের তুলনায় অনেক কম দরে বিক্রী করার শর্তে দাদনী ঋণের টাকা নিতে তারা বাধ্য হয়। "বিশেষ মারাত্মক হইল, ঋণের জন্য জমি কম দামে বিক্রী কোবালা করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই ইহা এক বিপজ্জনক সাধারণ নিয়মে পরিণত হইতেছে।...শুধু গরিব কৃষকই নহে, অনেক মাঝারি কৃষককেও, বিশেষত বন্যা এলাকায়, ইহার কবলে পড়িতে হইতেছে।...ফলে গরিব কৃষকরা আরো দ্রুত জমি হারাইতেছে। খাদ্য সংকটের কারণে চাষের মরসুমে ধানের দর বেশি হওয়ায় জোতদারদের থেকে কৃষকের ধান কর্জ পাওয়া কমে গেছে। "এই সবের ফলে চাষের কাজে কৃষকের সংগতিই শুধু কমিতেছে না, কৃষি উৎপাদনও ব্যাহত হইতেছে।" (পৃ ১০-১১)

"ভূমি সংস্কার ও ঋণের ক্ষেত্রে এই সরকারী নীতির অনিবার্য পরিণতি হিসাবে শুধু কৃষকদের মধ্যেই দুঃস্থতা বাড়ে নাই, ইহা কৃষি ব্যবস্থার মধ্যেও বিশৃংখলা বৃদ্ধি করিয়াছে ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে আঘাত করিতেছে। (পৃ ১১)

জোতদার-মজুতদার-মহাজন চক্র

সার সরবরাহ ও সেচ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা আলোচনা করে বলা হয়েছে: "স্বল্প ব্যয়ে ব্যাপক এলাকায় সেচ ব্যবস্থা প্রসারিত করিতে হইলে ছোট ছোট সেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।" (পৃ ১৬)

খাদ্য সংকটের আলোচনা প্রসঙ্গে রিপোর্টে বলা হয়েছে: "সরকারের নীতি প্রত্যক্ষভাবেই মজুতদারদের সাহায্য করিতেছে এবং এ বৎসরে তাহা চরমে উঠিয়াছে।" (পৃ ১৮) "মজুতদারদের কার্যকলাপ বন্ধ করিবার একমাত্র সুষ্ঠু পথ হইল খাদ্যশস্যের...রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রচলন।...খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটিও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের কথা স্বীকার করিয়াছেন।" তাসত্ত্বেও মজুতদারদের কারবার আরো ফলাও করার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে তাদের কোটি কোটি টাকা ঋণ দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে। (পৃ ১৯)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চালকলগুলি থেকে মাত্র ৮০ হাজার টন চাল সংগ্রহ করে (১৯৫৯), বাকি চাল মজুতদারদের হাতে ছেড়ে দিয়ে খাদ্য সঙ্কটকে আরো তীব্র হতে সাহায্য করে। তখন সরকার মজুতদারদের আড়াল করার উদ্দেশ্যে সঙ্কটের জন্য কৃষকদের মজুতদারীর অপবাদ দেয় এবং মজুত বিরোধী সংগ্রাম করলে মজুতদারদেরই স্বার্থে জনগণের উপর বর্বর দমন চালায়। (পৃ ১৯)

এ বছরের খাদ্য আন্দোলনে (৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯) কলকাতা ও হাওড়ায় পুলিসের হাতে ৮০ জন মানুষ নিহত হয়েছিলেন।

গ্রামাঞ্চলে খেতমজুর ও বর্গাদারদের উপর মজুরী দাসত্ব ও ভূমিদাসত্বের চাপ বাড়ছে। তাদের উপর জোতদারী আক্রমণ, পুলিসী জুলুম ও কোর্ট কাছারির হয়রানী ব্যবস্থা চলছে। জোতদার-মহাজনদের শক্তি আরো বাড়ছে। জোতদাররা ক্রমশ মহাজনী ও মজুতদারী ব্যবসার সাথেও যুক্ত হচ্ছে। দাদনের মারফত শহর ও গঞ্জের মজুতদারী-ব্যবসায়ী চক্রের প্রবেশ গ্রাম্য জীবনে আরো গভীর হচ্ছে। "এক কথায়, জোতদারী, মহাজনী ও মজুতদারী চক্র একটি ঘনিষ্ঠ চক্র হিসাবে সংহত হইতেছে। ...ধনী কৃষকদের মধ্য হইতে ক্ষুদ্র একটি স্তর বাজারের মজুতদারী আবহাওয়ায় নিজেরাও ক্রমশ দাদন ও ব্যবসার মারফত উপরোক্ত চক্রের নিকটবর্তী হইতেছে। এই পটভূমিকায় কৃষির জন্য সরকার বিভিন্ন খাতে যেটুকু খরচ করে তাও প্রধানত এই চক্রেরই কবলে যায় "এবং কিছু দুর্নীতির গহ্বরে চলিয়া যায়। ...আইন, বিচার, পুলিস ও দুর্নীতিপূর্ণ আমলা বাহিনীর কার্যকলাপ আরো নগ্নভাবে কায়েমী স্বার্থের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে।...কিন্তু সরকার উল্টা পথেই চলিয়াছেন। ফলে কৃষি সঙ্কট ও খাদ্যে ঘাটতি ও খাদ্য সঙ্কট আরো তীব্র হইতেছে।" (পৃ ২০-২১)

সমবায় কৃষি সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে খাদ্য, ঋণ প্রভৃতি সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কিছু না করে, "বিশেষত ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থা না করিয়া বর্তমান সামাজিক-অর্থনীতিক পটভূমিকায় সত্যকার সমবায় চাষ অগ্রসর হইতে পারে না এবং তাহাতে জোতদার ও ধনীদেরই অধিকার বেশি হইবে।" ভূমি সংস্কার সমস্যা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "শুধুমাত্র আইনকানুনের সাহায্যে ইহার সমাধানের পথে আগানো যায় না।" (পৃ ২২)

আন্দোলনের অগ্রগতি

শুধু কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কেই নয়, সামগ্রিকভাবে সরকারী নীতি যে কায়েমী স্বার্থের দিকেই চলছে সে সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়েছে: "সরকারী নীতির ফলে পুষ্ট জোতদার-মহাজন-মজুতদার চক্র, একচেটিয়া পুঁজি ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ঘনীভূত সংকটের পটভূমিকায় আরো সাহসের সহিত প্রতি-আক্রমণ শুরু করিয়াছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য, ভূমি সংস্কার প্রভৃতি যে ব্যবস্থাগুলি একান্ত প্রয়োজন সেইগুলির বিরুদ্ধেই ইহারা

কেন্দ্রীভূত আক্রমণ চালাইতেছে।···শাসক পার্টির মধ্যেই ইহার প্রবল প্রভাব আছে এবং তাহাই উপরোক্ত বিষয়ে সরকারী ঘোষণাগুলিকে বানচাল করিয়াছে। এখন ইহারা আরো খোলাখুলি আক্রমণ চালাইতেছে। শাসক পার্টির ভিতরের ও বাহিরের এই চাপে সরকার কায়েমী স্বার্থের সহিত মিতালি বজায় রাখার জন্য ধাপে ধাপে পশ্চাদপসরণ করিতেছেন। এই পরিস্থিতিতে কৃষির প্রকৃত অগ্রগতির জন্য সংগ্রাম আরো কঠোর হইয়াছে। কিন্তু কঠিন হইলেও এই সংগ্রাম সংগঠিত করা আমাদের জরুরী ও প্রধান কর্তব্য—শুধু কৃষকের স্বার্থে নহে, সমগ্র দেশের স্বার্থে।" (পৃ ৪-৫)

আন্দোলন সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়েছে বনগাঁ সম্মেলনের পর "কৃষক সভা এই সময়ে বড় বড সংগ্রাম সংগঠিত করিয়াছে। খাদ্য-সংকটের প্রতি-রোধে, বেনামী উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধারের জন্য, ন্যস্ত জমি বন্দোবস্তের জন্য, ক্যানাল করের প্রতিবাদে ও অন্যান্য বিষয়ে·· এইসব সংগ্রামে কৃষকরা অনেক বেশি দমন নীতি সহ্য করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।" (পৃ ২৫)

১৯৫৭ সনের শেষ দিকে ভাগ ও উচ্ছেদের প্রশ্ন ছাড়াও উদ্বৃত্ত লুকানো জমি উদ্ধারের জন্য ও ন্যস্ত (ভেস্টেড) জমি বন্দোবস্তের জন্য সংগঠিত ও সক্রিয় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং প্রচার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫৯ সনের জুন মাসে হাটগোবিন্দপুরে (বর্ধমান) প্রাদেশিক কৃষক কমিটির সভায় বিভিন্ন বিষয়ে সামগ্রিক আন্দোলনের প্রোগ্রাম নেওয়া হয়। তাতে খাদ্য সরবরাহ, সংগ্রহ ও উৎপাদন, ভূমি সংস্কারের বিভিন্ন দাবি, ক্যানাল কর, ন্যায্য দর, খেতমজুর সংগঠন ইত্যাদি বিষয়কে একত্র আন্দোলনের মধ্যে আনার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু তখনি সেভাবে আন্দোলন করা যায়নি। বেনামি জমি উদ্ধার ও উদ্বৃত্ত জমি দখলের আন্দোলন চলে।

কর্তৃপক্ষের হাতে আইনের অমর্যাদা

বর্গাদারদের দাবির—উদ্বৃত্ত বা বেনামী জমির ধান বর্গাদারদের অধিকারে তোলার দাবির—আন্দোলন বড বড জোতদারদের বিরুদ্ধে শুরু করা হয় এবং তা কতকগুলি জেলায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রাদেশিক কেন্দ্র থেকে এই আন্দোলনকে আগের তুলনায় ভালোভাবে পরিচালনা ও সাহায্য করা হয়। সেই সঙ্গে ডেপুটেশন, আলোচনা ইত্যাদি মারফত সরকারের উপর চাপও দেওয়া হয় যাতে সরকারী বিধান ও নির্দেশ সংশোধন করা হয়। তার ফলে ১৯৫৮-র এপ্রিলে সরকার নির্দেশ দেয় যে জমিদারী দখল আইনের

৫(ক) ধারা মতে কোন জমি তদন্তাধীন হলেই ভাগ কোর্ট ভাগ বা উচ্ছেদের মামলা স্থগিত রাখবে। ঐ বছরের শেষে আর এক সরকারী নির্দেশে বলা হয় যে কোন জমি তদন্তাধীন হলেই ভাগচাষীকে তার প্রাপ্য ফসলের ৬০ ভাগ দিয়ে ৪০ ভাগ ট্রেজারিতে জমা রাখতে হবে।

এমনি আরো কিছু সুবিধাজনক নির্দেশ আদায় করা যায়। ডিসেম্বর ১৯৫৮-র এক নির্দেশে বলা হয়, সরকারের ভেস্টেড বা ন্যস্ত জমিগুলি দখলকার বর্গাদারদের নিকট অস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। (পৃ ২৯-৩০)

এই ধরনের দাবি কিছু কিছু আদায় হবার পর কোন কোন কংগ্রেসী মন্ত্রীর সাহায্যে জোতদার ও পুলিশ মিলিতভাবে আন্দোলনের উপর হামলা করে। কৃষকদের উপর গুণ্ডার আক্রমণও চলে। শাসন বিভাগের কর্মচারীরা, কোন কোন জেলার কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে কৃষকদের অধিকার, ধানের ভাগ দিয়ে রসিদ পাবার অধিকার পর্যন্ত, অস্বীকার করে(কোচবিহার)। আদালতের রায়ও যেতে থাকে কৃষকদের বিরুদ্ধে। অসংখ্য কৃষকের বিরুদ্ধে চুরি, লুট প্রভৃতির মিথ্যা অভিযোগে মামলা দায়ের করে তাদের হয়রান করা হয়। (পৃ ৩০) ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং প্রভৃতির জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা আইন অগ্রাহ্য করে প্রকাশ্য ইস্তেহার দিয়ে ঘোষণা করে যে ৫(ক) ধারা মতে তদন্তাধীন হলেও বর্গাদাররা তথাকথিত মালিকদের ভাগ দিতে বাধ্য। (পৃ ৩০)

এইসব দমন ও বেআইনী ব্যবস্থা সত্ত্বেও আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার বিঘা বেনামী জমি উদ্ধার করা গেছে, ন্যস্ত জমি বর্গাদারদের বন্দোবস্ত দেওয়ানো হয়েছে। আর জোতদারদের বেআইনী কাজে সরকারী সাহায্য দেখে কৃষকরা আরো অনেকে বুঝেছে সরকারের শ্রেণী স্বার্থ জোতদারদেরই পক্ষে, কৃষক দরদটা মৌখিক ভাঁওতা মাত্র।

আন্দোলনের গুণগত উন্নতি

উদ্বৃত্ত ও বেনামী জমি সম্বন্ধে কৃষকদের দাবিকে শহরের লোকের চোখে তুলে ধরবার জন্য কৃষক সভা ১১ মার্চ ১৯৫৮ তারিখে কলকাতায় এক মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। তাতে ২৪ পরগনা ও অন্য কয়েকটি জেলা থেকে ৬ হাজার কৃষক যোগদান করে। শহরের লোক নিয়ে জমায়েত হয় মোট ৩০ হাজারের।

খাদ্যের আন্দোলনে কৃষক সভাকে বিশেষভাবে জেলাগুলিতে উদ্যোগ

নিতে হয় ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সনে। কিন্তু বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলি নিয়ে গঠিত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি প্রধানত কলকাতায় এবং প্রাদেশিকভাবেও এই আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ করত বলে কৃষক সভা সেই কৌশল সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছিল এবং তা করতে গিয়ে সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতেও বাধ্য হয়েছিল। তাতে কৃষক সভার আন্দোলনের তীব্রতা কমে গিয়েছিল। যদিও প্রতিরোধ কমিটির দাবিগুলি প্রথমে কৃষক সভাই স্থির করেছিল এবং প্রচারও করেছিল, তাহলেও প্রতিরোধ কমিটির কৌশল অনুসারে তা প্রয়োগ করতে হয়েছিল বলেই দাবিগুলি যথেষ্ট সার্থক হতে পারেনি। (পৃ ৩৬-৩৭)

১৯৫৮ সনের খাদ্য আন্দোলনে প্রতিরোধ কমিটি প্রথম থেকেই খুব ইতস্ততভাব দেখতে থাকে। তাই কৃষক সভা উদ্যোগ নিয়ে ৯ মার্চ কলকাতায় এক খাদ্য সম্মেলনের আয়োজন করে এবং ১৮ মার্চ বিধান-মণ্ডলী অভিমুখে কৃষক ও শহরবাসীদের মিলিত অভিযান সংগঠিত করে। মে মাসে কলকাতায় কৃষকদের পদযাত্রা, একদিনের জন্য কলকাতায় আইন অমান্য ও জেলায় জেলায় আইন অমান্যের কর্মসূচীও গ্রহণ করে।

তখন প্রতিরোধ কমিটি তার দাবি পূরণের জন্য সরকারকে এক চরমপত্র দেয় এবং সেই অনুসারে কৃষক সভা পদযাত্রার তারিখ নির্ধারণ করে ১১ মে। পরে দাবি পূরণ সম্বন্ধে সরকারের প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় প্রতিরোধ কমিটি চরমপত্র প্রত্যাহার করে। ফলে কৃষক অভিযাত্রীদের আইন অমান্য বন্ধ করতে হয়, যদিও তা কৃষক সভার আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়। নদীয়া জেলায় কিন্তু খাদ্যের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হওয়ায় একমাস ধরে আইন অমান্য করা হয় এবং প্রায় এক হাজার লোক জেলে যান। এই আন্দোলনের ফলে জেলার দাবি আংশিকভাবে আদায় হয়।

১৯৫৯ সনের প্রথম দিকে কৃষক সভা নিজ উদ্যোগে খাদ্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়। কমিউনিস্ট পার্টি এই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে। কয়েকটি জেলায় আইন অমান্য শুরু হয়। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি ১৭ জুলাই সারা বাংলায় সংগ্রামের ডাক দেয়। আন্দোলন তীব্র ও ব্যাপক হয়ে ওঠে। সরকারও হিংস্র দমনব্যবস্থা চালায়। জেলাগুলিতে যে ১৫ হাজার মানুষ জেলে যান তার অধিকাংশই ছিলেন কৃষক সভার কর্মী ও সমর্থক। এই আন্দোলন গণ-সংগ্রামকে উচ্চতর পর্যায়ে তুলেছিল। পরে আগস্টের শেষে কলকাতায় যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল সেজন্য খাদ্যমন্ত্রীর অপসারণের দাবি তোলা হয়েছিল।

এই খাদ্য আন্দোলনের ফলে যতটুকু রেশন, রিলিফ, ঋণ প্রভৃতি আদায় হয়েছিল তার বন্টন সম্বন্ধেও এবার কৃষক কর্মীরা পূর্বের তুলনায় বেশি হস্তক্ষেপ করতে পেরেছিলেন। অন্যান্য দাবির আন্দোলনেও কৃষক সভা পূর্বের চেয়ে সক্রিয় হয়েছিল।

এই বছর (১৯৫৯) ভারত-চীন সীমান্ত প্রশ্ন নিয়ে যে গোলযোগ দেখা দেয় সে সম্বন্ধেও কৃষক সভার বিরুদ্ধে কুৎসা ও বিদ্বেষ প্রচার করা হয়। প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের শক্তিগুলি কৃষক আন্দোলনকে দুর্বল করবার জন্য হ্যাণ্ডবিল প্রচার করে ও অন্যান্য উপায়ে নানা রকম চেষ্টা করতে থাকে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য এবং চীনের সহিত শান্তিপূর্ণ মীমাংসার দাবিকে জোরদার করার জন্য কৃষক সভাকে বিশেষভাবে প্রচারে নামতে হয়। কেরালায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে একত্র করে কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে জঘন্য গণতন্ত্র-বিরোধী হামলা চালানো হয় কিন্তু তার দ্বারা মন্ত্রীসভার পতন ঘটানো সম্ভব হয় না। তাই শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি মারফত তাকে নিতান্ত অগণতান্ত্রিক ও সংবিধান-বিরোধী কায়দায় কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার বরখাস্ত করে দেয়। তখন তার বিরুদ্ধেও পশ্চিমবাংলার কৃষক সভা ব্যাপকভাবে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম চালায়। (পৃ ৪৪)

কৃষক সভার শ্রেণী ভিত্তি সম্বন্ধে রিপোর্টে বনগাঁ ঘোষণার উল্লেখ করে বলা হয় যে সভার কয়েকটি মূল বক্তব্য হল এই: (১) খেতমজুর, বর্গাদার ও গরিব কৃষকদের মধ্যে কৃষক সভার ভিত্তি দৃঢ় করা; (২) মাঝারি কৃষকদের অধিকতর সংখ্যায় কৃষক সভার মধ্যে আনা; (৩) কৃষকদের বিভিন্ন স্তরের দাবি নিয়ে আন্দোলন করা; (৪) কৃষক ও খেতমজুরদের মধ্যে এবং ছোট ছোট মালিক ও বর্গাদারদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে মূলত সামঞ্জস্য বিধান ও বোঝাপড়ার কৌশল অবলম্বন করা।

"কৃষক আন্দোলনে যদি গরিব কৃষকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে হয় তাহলে তাহাদের চেতনা শুধু অর্থনীতিক স্তরে থাকিলে চলিবে না, রাজনীতিক চেতনায় তাহাদের সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন।" (শেষাংশ, পৃ ১)

খেতমজুরদের সংগঠন সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাদের "কৃষক সভার মধ্যে যৌথভাবে অন্তর্ভুক্ত পৃথক ইউনিয়নে সংগঠিত করা সমীচীন এবং এই ইউনিয়ন রেজিস্ট্রি করা ভালো। এজন্য এক গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রত্যেক জেলায় পাঠানো

হইয়াছে। কিন্তু এ ব্যাপারে মেদিনীপুর ও কিছুটা বর্ধমান জেলায় ছাড়া আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই।" (পৃ ২)

প্রকৃত ভূমি সংস্কার

কাকদ্বীপ সম্মেলনে "প্রকৃত ভূমি সংস্কার" প্রস্তাবে ভূমি সংস্কার আইন ও তার প্রয়োগ এবং কৃষক সভার কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় "ভূমি সংস্কার মূলত বানচাল করিয়া দেওয়ারই জঘন্য চক্রান্ত চলিয়াছে। [কাকদ্বীপ সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃঃ ২০]··· উন্নয়নের নামে প্রচুর সরকারী অর্থব্যয় ও গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের প্রতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও কৃষির উন্নতির পরিবর্তে বরং ক্রমেই অবনতি ঘটিতেছে। [পৃ ২১] ··· চাই জমিদারী-জোতদারী প্রথার সম্পূর্ণ অবসান ও কৃষককে জমির পূর্ণ মালিক করা।" (পৃ ২২)

আরো : "কৃষক সভার বহু প্রচেষ্টার পর সরকার সমস্ত ন্যস্ত জমির দখল তাড়াতাড়ি লওয়ার ও সমস্ত দখলী জমি চাষীদের অস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছে।" (পৃ ৩১)

"শুধু চাষের জমি নয়, আবাদযোগ্য পতিত জমিও, শুধু ন্যস্ত জমি নয়, পূর্ব হইতেই সরকারের হাতে যে খাস পতিত আছে, যে আবাদযোগ্য পতিত জমির মোট পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ একর, তাহাও বেশির ভাগ আবাদে আনার এবং স্থানীয় খেতমজুর ও অন্যান্য ভূমিহীন কৃষক ও বাস্তহারা কৃষকদের মধ্যে বিলি করার কোনই সামগ্রিক পরিকল্পনা নাই। যেসব ক্ষেত্রে স্থানীয় ভূমিহীনরা উদ্যোগী হইয়া এরূপ জমি দখল করিয়া চাষ করিয়াছে, তাহাদেরও স্বীকার করা ও সাহায্য দেওয়ার পরিবর্তে তাহাদের বিরুদ্ধে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের দাবি সমর্থন করিয়া নানাভাবে পুলিস জুলুম চালানো ও মামলা মোকদ্দমা করা হইতেছে। (পৃ ৩৩)

"জোতদারী শোষণ লোপ ও ভূমিহীনদের জমির মালিক করা—যাহা ভূমি সংস্কারের মূল বিষয়—তাহা তো দূরের কথা, এমন কি অপরের জমিতে চাষ করার ও ন্যায্য ভাগ পাওয়ার নিরাপত্তাটুকুও চাষীদের দেওয়া হয় নাই।" (পৃ ৩৪) "মোটের উপর ইহাই ভূমি সংস্কারের পরিণতি।···এই 'ভূমি সংস্কার' ব্যাপক কৃষক সমাজের মধ্যে কোনও উৎসাহ জাগায় নাই, বরং নৈরাশ্য সৃষ্টি করিয়াছে।" (পৃ ৩৭) "কংগ্রেস সরকার ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারেন নাই।···কিন্তু জমিদার-জোতদারদের

সহিত ঘনিষ্ঠতার দরুণ এবং শাসন বজায় রাখিতে তাহাদের উপর রাজনীতিক নির্ভরশীলতার দরুন তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব সমধিক উৎসুক এবং দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে উদাসীন।" (পৃ ৩৭-৩৮)

"এই সম্মেলন তাই সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছে, এরূপ অনিশ্চয়তা ও অরাজকতা, এরূপ বেদনাদায়ক মন্থরগতি ও অচলাবস্থা, কৃষকদের এরূপ আশাভঙ্গ, ভূমি সংস্কারের নামে এরূপ বঞ্চনা, এরূপ অবিচার ও অত্যাচার কিছুতেই দীর্ঘকাল চলিতে পারেনা ও চলিতে দেওয়া যায় না।…এই সম্মেলন ভূমি সংক্রান্ত আইন কানুনকে ঢালিয়া সাজার জন্য নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখিতেছে (পৃ ৩৮)। এই সব প্রস্তাবের মধ্যে বলা হয় ঐ সমস্ত আইন বাতিল করে নতুন আইন করা হ'ক।

প্রস্তাবের মুল দাবী ও কাজের ডাক

এই প্রস্তাবের মুল কথা হল, "জমিদার-জোতদারদের জমি হস্তান্তর বাতিল করিয়া ও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিয়া তাহাদের স্বনাম-বেনাম, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সমস্ত চাষের জমি ও চাষযোগ্য জমি গ্রহণ করা হ'ক। যে ভাগচাষী বা খেতমজুররা উহা চাষ করিতেছে তাহাদের সীমাবদ্ধ অগ্রাধিকার দিয়া যত বেশি সম্ভব ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে যত শীঘ্র সম্ভব সেই সমস্ত জমি কৃষকদেরই তত্ত্বাবধানে বণ্টনের সহজ ও পরিষ্কার ব্যবস্থা করা হ'ক। জমিদার-জোতদাররা শিল্প, ব্যবসা, চাকরি প্রভৃতিতে যাক। কৃষক জমির মালিক হইয়া কৃষির উন্নতি করুক।" (পৃ ৩৮-৩৯)

"সমস্ত প্রজাকে এবং ভবিষ্যতে যাহারা জমি পাইবে তাহাদেরও জমির পূর্ণ মালিকানা দেওয়া হ'ক।" (৪৩)

"…এই সম্মেলন সমস্ত কৃষক কর্মী, কমিটি ও কৃষক সাধারণকে ডাক দিতেছে : এখনই সমস্ত উচ্ছেদ বন্ধ করার আইন চাই, উচ্ছেদ করা চলবে না। দখল রেখে চাষ কর। সরকারে ন্যস্ত চাষের জমি এবং আবাদযোগ্য পতিত জমি কৃষকদের কমিটি মারফত ভাগচাষী ও খেতমজুরদের মধ্যে বণ্টন কর।…'সমবায়কে' অগ্রাধিকার দেওয়া চলবে না।…" (পৃ ৪৮-৪৯)

সেই সঙ্গে ডাক দেওয়া হয় "রাজ্যব্যাপী সংগ্রাম গড়িয়া তুলিতে এবং তাহার সমর্থনে গণতান্ত্রিক জনমত সংগঠিত করিতে …।" (৪৯)

নীল বিদ্রোহের শতবার্ষিকী

এছাড়া সম্মেলনে খাদ্য ও রিলিফ, ঋণ, দর, সেচ ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে

অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। নীল বিদ্রোহের শতবার্ষিকী পালনের জন্য ও রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর মানবতাবোধকে কৃষক সমাজের নিকট নিয়ে যাবার জন্য দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বন্দী মুক্তির জন্য, বিশেষ করে কাকদ্বীপ ও অন্যান্য দীর্ঘ-মিয়াদী বন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব ও দমন নীতির প্রতিবাদে প্রস্তাব গৃহীত হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের আলোচনার জন্য আসন্ন নেহরু-চাউ বৈঠকের সাফল্য কামনা করা হয়।

শোক প্রস্তাবে চারটি অংশ থাকে: ১৯৫৯ সনের আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে খাদ্য আন্দোলনে কলকাতায় ও হাওড়ায় পুলিসের লাঠি ও গুলিতে যে অন্তত ৮০ জন শহীদ হন তাঁদের স্মৃতির প্রতি এবং কৃষক আন্দোলনের শহীদ ও অন্যান্য মৃত কর্মীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তাছাড়া মোহম্মদ ইয়াকুবের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। কমরেড ইয়াকুব ছিলেন একজন কৃষক এবং ত্রিপুরা জেলার (পূর্ব পাকিস্তান) কৃষক আন্দোলনের প্রাচীন কর্মী ও প্রধান নেতা এবং প্রাদেশিক কৃষক কমিটির প্রাক্তন মেম্বর। দীর্ঘকাল সরকারী নির্যাতন ও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি কৃষক আন্দোলনে কাজ করে গেছেন। ২৩ জানুয়ারী ১৯৬০ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

কাকদ্বীপ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ভবানী সেন। সম্মেলনের কাজ পরিচালনার জন্য ন জনকে নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন গণসংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিনন্দন বাণীগুলি পড়া হয়। ১৭ই এপ্রিল কৃষক সমাবেশে সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি এ. কে. গোপালন ও সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটির তরফ থেকে কমরেড মোহম্মদ ইসমাইল অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা করেন।

সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন ৪০০ প্রতিনিধি (পুরুষ ৩৯১, নারী ৯), দর্শক ২৫৮ (পুরুষ ২৪৭, নারী ১১) এবং মিত্র প্রতিনিধি ১০। পরবর্তী সারা ভারত সম্মেলনের জন্য পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধি ৭১ এবং সারা ভারত কৃষক কমিটির মেম্বর ১৪ জন নির্বাচিত হন। নতুন প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয় কর্মকর্তা সহ মোট ৫১ জন এবং কাউন্সিল ১৫ জন মেম্বর নিয়ে।

নীল বিদ্রোহের বিভিন্ন ঘটনার চিত্র নিয়ে এক পোস্টার প্রদর্শনার ব্যবস্থা হয়।

সম্মেলনের সমগ্র এলাকাটির নাম দেওয়া হয় "অহল্যা নগর"—১৯৪৮ ডিসেম্বরে কাকদ্বীপ এলাকার চন্দনপিড়িতে পুলিসের গুলিতে নিহত কৃষক নারী শহীদ অহল্যার নামে। অন্য তিন জন কৃষক নারী শহীদের নামে হয় সরোজিনী-বাতাসী-উত্তমী তোরণ এবং মৃত কৃষক ও শ্রমিক নেতা নিত্যানন্দ চৌধুরীর নামে নিত্যানন্দ তোরণ।

প্রতিনিধি সম্মেলন শেষ হবার পূর্বে সম্মেলনের মধ্যে এক মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটে। শহীদ ভূমি কাকদ্বীপের শহীদ ও দীর্ঘমিয়াদী রাজনীতিক বন্দীদের পরিবারদের মধ্যে থেকে কয়েকজন আসেন প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানাতে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শহীদ অহল্যার পুত্র রতিকান্ত, অহল্যার সংগ্রাম-সঙ্গিনী বৃদ্ধা সুবর্ণময়ী গিরি (পুলিসের গুলিতে যাঁর ডান হাতটি জখম হওয়ায় কেটে বাদ দিতে হয়েছিল), এবং শহীদ গজেন ভুঁইয়ার স্ত্রী কাদম্বিনী, শহীদ অশ্বিনী ও সরোজিনীর সহোদর অনুকূল ও ভূপতি (পুলিস জুলুমে ভূপতির দুটি চোখই নষ্ট হয়ে যায়)। আর ছিলেন বীর বন্দীদের স্ত্রী, পুত্র, ভাই অনেকে।

সম্মেলনে নির্বাচিত প্রাদেশিক কৃষক কমিটি ও কাউন্সিলের কর্মকর্তারা ছিলেন: সভাপতি—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও সহ-সভাপতি—আবদুল্লাহ রসুল, অজিত বসু ও সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী; সম্পাদক—হরেকৃষ্ণ কোঙার; সহ-সম্পাদক—শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, সুনীল সেন ও অজিত গাংগুলি; কোষাধ্যক্ষ—বগলা গুহ।

পনের

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় গঠরা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গঠরা, বল্লুক, পুতপুতিয়া, কলাগেছিয়া, পূর্বচিলকা ইত্যাদি অনেকগুলি গ্রামে কৃষকরা ১৯৩৯ সন থেকে জমিদারদের (বর্ধমান রাজ ইত্যাদি) খাজনা বন্ধ রেখেছিলেন। এই বিষয় নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন চলে আসছিল। খাজনার দায়ে প্রজাদের জমি নিলামেরও আদেশ হয়েছিল বারবার, নিলামও হয়েছিল, কিন্তু কৃষকদের ঐক্য ও সংঘ শক্তির জোরে কৃষকদেরই হাতে জমির দখল রাখা হয়েছিল, নানা রকম প্রলোভন ও পুলিসী সন্ত্রাস সত্ত্বেও তাদের দমন করতে পারা যায়নি। সরকার জমিদারী দখল করার পরও খাজনা বন্ধ থেকেছে। কৃষকরা কিছু ন্যায্য দাবি আদায় করতে পারলে খাজনা ধর্মঘট বন্ধ করতে প্রস্তুত, কিন্তু সরকার তাতে রাজি নয়। খাজনা বন্ধ ও অন্যান্য গণআন্দোলনে বল্লুক গ্রামের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, তাই স্থানীয় লোকে তাকে আখ্যা দিয়েছিল বিদ্রোহীনগর।

সপ্তদশ সম্মেলন ঃ বল্লুক

প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন বা তার রজত জয়ন্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই বল্লুক গ্রামে, ১৮—৩১ মে ১৯৬১ তারিখে। সভাপতিত্ব করেন বিশ্বনাথ মুখার্জি। সম্মেলনের কাজ পরিচালনার জন্য পাঁচজনের একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। প্রতিনিধি, দর্শক ও মিত্র প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল ৫৬৯। এবার প্রাথমিক মেম্বর সংখ্যা ছিল ১,৪০,০৮৩। প্রাদেশিক কৃষক কমিটির সম্পাদকের ছাপানো রিপোর্ট পূর্বের মতো এবারও প্রতিনিধিদের দেওয়া হয় এবং তার আলোচনা হয়।

এই অঞ্চলে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের মূলে কৃষকদের দাবি ছিল :

* অবিলম্বে খাজনার হার কমিয়ে অর্ধেক করা, হাজাশুখার খাজনা ছাড় আইনে বাধ্যতামূলক করা, এক বিঘা পর্যন্ত বাস্তুভিটার খাজনা ছাড়ের যে

বিধি ভূমি সংস্কার আইনে আছে তা বিনা শর্তে কার্যকর করা, নিলাম ও খাস করা জমিতে প্রজাদের প্রজাস্বত্ব স্বীকার করা, সমস্ত সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করা, ইত্যাদি। এই দাবিগুলি বিশেষভাবে ঐসব গ্রামের প্রজাদের দাবী হলেও সাধারণভাবে কৃষক আন্দোলনেরও দাবি।

প্রতিনিধি সম্মেলনে সারা ভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক জগজিৎ সিং লায়ালপুরী উপস্থিত ছিলেন ও বক্তৃতা করেছিলেন। ৩১ মে অন্তত ৫০ হাজার কৃষকের জমায়েতেও তিনি এবং ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ বক্তৃতা করেন।

এই সম্মেলন উপলক্ষে ২৯ মে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। ৩০শে শান্তি সমাবেশ ও মহিলা সমাবেশ হয়। সোবিয়েত দেশে মহাকাশ-যানের সাফল্য ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্মেলনের চারদিনই চলে। তাছাড়া পিপলস রিলিফ কমিটির মেডিকেল স্কোয়াড় সম্মেলনের চারদিন অসুস্থদের চিকিৎসা করেন।

সংকট ও সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র

সম্পাদকের রিপোর্টে কাকদ্বীপে সম্মেলনের মতো জমির আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনের বিবরণ দেওয়া হয়। তাতে দেখানো হয় সংকট আরো তীব্র হচ্ছে, সরকার প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দিকে বেশি বেশি ঝুঁকছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে আইনগত কাজের দায়িত্ব পর্যন্ত এড়িয়ে গিয়ে কৃষক স্বার্থের বিরোধিতা করছে।

বলা হয়ঃ "জোতদারী-মহাজনী শোষণ ও বিদেশী পুঁজির লুণ্ঠনের অবসান, প্রকৃত ভূমি সংস্কার, একচেটিয়া পুঁজির শোষণ বন্ধ, দ্রুত শিল্পায়ন, সমবায় ও সরকারী ঋণের ব্যাপক প্রসার, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য, সেচ, সার প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক উন্নতি, জনগণের সক্রিয় উদ্যোগ অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের বদলে প্রকৃত গণতন্ত্র—এই সব কিছুই হইল সামগ্রিকভাবে দেশের ও কৃষির মৌলিক পুনর্গঠনের প্রকৃত পথ।" (সম্পাদকের রিপোর্ট, পৃ ৫)।

"পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের জীবনের সমস্যা ও সংকট এত গভীর ও জটিল হইয়াছে যে এই মৌলিক সমাধানের লক্ষ্য কৃষকদের সামনে তুলিয়া ধরা ও এ বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ভরসা সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন।" (পৃ ৫)

"সমবায় ও পঞ্চায়েতের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে আমলা-

তান্ত্রিক বাধা ও সরকারের দলীয় পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে।" (পৃ ১২)

আন্দোলনের পক্ষে বাধা সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়: "সরকার ও কায়েমী স্বার্থের ক্রমবর্ধমান বাধা, দমন নীতি ও আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের ফলে বিভিন্ন দাবির আন্দোলনগুলি পৃথক পৃথক ভাবে এমন জটিল অবস্থায় গিয়া ঠেকিতেছে যে এক এক এলাকায় এক এক বিষয় লইয়া সক্রিয় আন্দোলনের উপর জোর দিতে হইলেও সর্বত্র বিভিন্ন দাবি লইয়া এক ব্যাপক ক্যাম্পেন সৃষ্টি করিতে না পারিলে এই জটিল অবস্থা হইতে বাহির হওয়া দুষ্কর হইতেছে।" (পৃ ১৪) "তাই সংগঠিত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আন্দোলনের উপরই প্রধানত নির্ভর করা প্রয়োজন।" (পৃ ১৫)

তিন বছরের আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে দেখা যায় সরকারের হাতে যেখানে ১ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত ও ন্যস্ত আবাদী জমি এসেছিল, এখন রাজস্ব মন্ত্রীর হিসাবে তার পরিমাণ হয়েছে ২ লক্ষ ৬৮ হাজার একর। এর মধ্যে ৪২ হাজার একর উদ্ধার করা বেনামী জমি। (পৃ ২০) উদ্বৃত্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার পক্ষে একটা বাধা হল বড় বড় জোতদাররা অন্যায়ভাবে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে ইনজাংশন জারি করিয়ে জমি আটকে রাখছে এবং সরকারও নিজের ঘোষিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাদের সেই সুযোগ দিচ্ছে। (পৃ ২১)

শ্রেণীদাবির ভিত্তিতে ব্যাপকতম ঐক্য

আন্দোলন সম্বন্ধে আরো বলা হয়: "কৃষি সংকট ও কৃষক জীবনের সংকট যে রূপ হইয়াছে, বিশেষভাবে গরিব মেহনতী কৃষকরা যে ভাবে ইহার চাপে মার খাইতেছে, তাহাতে ব্যাপকতম ঐক্যের ভিত্তিতে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন করিতে না পারিলে বিচ্ছিন্নভাবে কোন আংশিক দাবির আন্দোলনকে বা কৃষকদের কোন পৃথক অংশের আন্দোলনকে রক্ষা করা ও অগ্রসর করা ক্রমশই দুঃসাধ্য হইতেছে।" (পৃ ৪৬) ভাগচাষী ও খেতমজুরদের উপর শোষণের মাত্রা বাড়াবার ফলে "কৃষকদের মধ্যে আভ্যন্তরিক বিভেদের ঝোঁকও বাড়িতেছে।" কায়েমী স্বার্থ নানা কৌশলে বিভেদ সৃষ্টির ও বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করছে। "এই অবস্থায় কৃষক ঐক্য গঠনের সংগ্রাম আরো জটিল হইয়াছে।" (পৃ ৪৭)

তাই সম্পাদকের বক্তব্য হল: "কৃষক আন্দোলনের প্রধান সংগ্রামী

শক্তি হিসাবে খেতমজুর, ভাগচাষী ও গরিব কৃষকদের উপর বিশেষ জোর দিয়া তাহাদের সংগঠিত করা ও তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আন্দোলন করা ; দ্বিতীয়, কৃষকদের অন্যান্য অংশের সমস্যা ও দাবির প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া···। তৃতীয়ত, জমি আছে এমন কৃষক ও অকৃষক মালিকদের সহিত ভাগচাষী ও খেতমজুরদের বিরোধের প্রশ্নগুলিকে মূলত আলাপ আলোচনা ও মীমাংসার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমাধান করা।" (পৃ ৪৭-৪৮)

ঐক্য সম্বন্ধে পরে আরো বলা হয় "···ব্যাপক কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করিতে হইলে একদিকে যেমন দৃঢ়তার সহিত শ্রেণীগত দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন করিতে হইবে,···তেমনি কংগ্রেসের সমর্থক বা প্রভাবাধীন কৃষকদের মিলিত আন্দোলনে টানার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন।" (পৃ ৪৯)

জন-বিরোধী কর নীতি

সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়। তার মধ্যে ভূমি সংস্কারও থাকে। তাতে আন্দোলনের ও দাবির কথা ছাড়া শোষক শ্রেণীদের অত্যাচার ও সে সম্বন্ধে সরকারী মনোভাবের সমালোচনা করা হয়। বলা হয়: "চাষীদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে হাজার হাজার (৪১,৮০০) একর জমি ইতিমধ্যে উদ্ধার হওয়া সত্ত্বেও চাষীদের সাহায্য করার পরিবর্তে সেই আন্দোলনকেই দমন করবার উদ্দেশ্যে সরকার নানারূপ নির্যাতন চালাইতেছেন। ···পুলিসের এই আচরণে উৎসাহিত হইয়া জোতদাররা চাষীদের উপর বহু ক্ষেত্রে গুণ্ডার আক্রমণ চালাইয়াছে। মহিষাদলের [মেদিনীপুর জেলা] গ্রামে উদ্বৃত্ত জমির মালিক চাষীকে গুলি করিয়া খুন করিয়াছে। হাসনাবাদে [২৪ পরগনা জেলা] সীমান্ত পুলিস নিজেই ঘুষ খাইয়া চাষীকে গুলি করিয়া মারিয়াছে। মালদহে উন্মত্ত পুলিসী তাণ্ডবের পর চাষীদেরই বিরুদ্ধে মামলা সাজানো হইয়াছে। পুলিস প্রায় সর্বত্রই জোতদারদের কেনা গোলামের মতো ব্যবহার করিয়াছে।" (সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ ১৪-১৫)

ট্যাক্স বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এক প্রস্তাবে বলা হয় যে এ বছর (১৯৬১-৬২) ভারত সরকার জনগণের উপর ৫৭ কোটি টাকা ট্যাক্স বৃদ্ধি করেছে পরোক্ষ কর হিসাবে, আর প্রত্যক্ষ কর বাড়িয়েছে মাত্র ৩ কোটি টাকা। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সরকার ক্রমবর্ধিত হারে পরোক্ষ কর বাড়িয়ে আসছে।

"১৯৪৮-৪৯ সনে পরোক্ষ করের পরিমাণ যেখানে ছিল ৫০ কোটি ৬৫ লক্ষ, সেখানে উহা বাড়িতে বাড়িতে ১৯৬১-৬২ সনের বাজেটে হইয়াছে ৪৬১ কোটি এবং গত বৎসর পর্যন্ত এই কয় বৎসরে গবরমেণ্ট পরোক্ষ কর বাবত জনগণের নিকট হইতে আদায় করিয়াছেন ১২৬৮ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। এই সংখ্যা হইতে সরকারের জনবিরোধী ট্যাক্স নীতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।" (সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ ৩২)

এই অন্যায় ট্যাক্স বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অধিবেশনে (ত্রিচুর, এপ্রিল ১৯৬১) যে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এই সম্মেলন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আন্দোলনের আহ্বান দেয়। (ঐ, ৩৩)

পান চাষীদের দাবি নিয়ে আর একটি প্রস্তাব পাস হয়। তাতে অন্যান্য দাবির মধ্যে বিশেষভাবে পানের উপর বিক্রয় কর প্রত্যাহারের দাবি জোর দিয়ে তোলা হয়।

হাট তোলার জুলুম ও হাটের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব পাস হয়। ১৯৩৯-৪০ সনে ও পরে এই বিষয় নিয়ে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল এবং তার সুফলও পাওয়া গিয়েছিল। এখন আবার সেই পুরোন ধরনের জুলুম চলতে থাকে বলে এই প্রস্তাব।

সম্মেলনে প্রাদেশিক কৃষক কমিটি গঠিত হয় ৬৫ জন নির্বাচিত মেম্বর নিয়ে। তার মধ্যে থেকে ৯০ জন কর্মকর্তা সমেত ১৯ জনের কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। কর্মকর্তারা আগের বছর যাঁরা যে সব পদে ছিলেন এবারও তাঁরাই তেমনি থাকেন।

পাট চাষীদের দাবি ও সম্মেলন

বল্লুক সম্মেলনের পর বছর (১৯৬২) প্রাদেশিক সম্মেলন হয় নি। ১৯৬২তে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কৃষক সভার কর্মীরা অনেকেই নানা ভাবে জড়িত ছিলেন।

কাঁচা পাটের দর পড়ে যাওয়ার ফলে পাট চাষীর উপর যে কঠোর আঘাত এসেছিল তাকে প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে পাট চাষীদের সংগঠিত করার প্রয়োজন কৃষক সভা বেশ কয়েক বছর থেকেই অনুভব করছিল। সেজন্য চটকল শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি সমর্থন করে এবং তাদের স্বার্থের সাথে পাট উৎপাদকদের স্বার্থকে মিলিয়ে দিয়ে উভয়কে একটি সংগ্রামী মোর্চায়

আরবারও চেষ্টা কৃষক সভা করতে থাকে। সেই উদ্দেশ্যে হুগলি জেলার তারকেশ্বরে একটা প্রতিনিধি সম্মেলনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৯৬২ সনে পশ্চিমবঙ্গ পাট চাষী সম্মেলন ডাকা হয়েছিল (১৪-১৫ সেপ্টেম্বর) মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর গ্রামে। এই উপলক্ষে বিরাট কৃষক সমাবেশ হয় এবং যে প্রতিনিধি সম্মেলন হয় তাতে পশ্চিমবাংলার পাট উৎপাদক জেলাগুলি থেকে এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলা থেকেও প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার মধ্যে এই দাবিগুলি ছিল: পাটের সর্বনিম্ন দর ৪৫ টাকা ধার্য করা, পাট সরকারী গুদামে জমা রেখে দরের একটা বড় অংশ যাতে বিক্রীর পূর্বেই কৃষক পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা, দাদনী প্রথা বন্ধ করার জন্য পাট চাষীদের অল্প সুদে যথেষ্ট ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক ব্যাপকভাবে পাট খরিদের ব্যবস্থা করা, এবং চটকল শ্রমিকদের জন্য চাকরীর নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরী ও বোনাস প্রভৃতি বিষয়ের সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য বেতন বোর্ডের সুপারিশ প্রকাশ ও চালু করা। সেই সঙ্গে এই সকল দাবি আদায়ের জন্য ব্যাপক আন্দোলনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জনগণের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ

ঐ বছরের (১৯৬২) শেষ দিকে এক নতুন ও অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অক্টোবর মাসে চীনের সহিত ভারতের সীমান্ত বিরোধ সশস্ত্র সংঘর্ষের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। তাকে অবলম্বন করে শাসক শ্রেণীগুলি বাংলার কৃষক সভার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে দেয়। ২৬ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। ভারত প্রতিরক্ষা আইন ও নিয়মাবলী (ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া—ডি. আই.—অ্যাকট ও রুলস) জারি হয়। তার ফলে এই আইনের বলে ও জরুরী অবস্থার সুযোগে সংবিধানে স্বীকৃত নাগরিকদের কতকগুলি মৌলিক অধিকার সরকার হরণ করে নেয়। বহু কৃষক কর্মী ও নেতাকে বিনা বিচারে ও বিনা কৈফিয়তে অনির্দিষ্ট কালের জন্য জেলে আটক রাখা হয়। দেশময় উগ্র জাতীয়তাবাদের নামে একটা বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করা ও অরাজকতার ভাব এনে ফেলা হয়। আটক বন্দীরা ছাড়া আরো শত শত কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগে মামলা দায়ের করে হয়রান করা হতে থাকে। অনেক কর্মী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়াবার জন্য গা ঢাকা দিয়ে বহু অসুবিধার মধ্যে থেকে কাজ চালাতে

থাকেন। এই আইনের সর্বাগ্রাসী ক্ষমতা সকলকেই একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়। অনেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

ডি. আই. রুলস অনুসারে কৃষক কমিটি ও কাউন্সিলের অনেক মেম্বর ও কর্মকর্তা আটক থাকেন। ১৯৬২-র ২১ নবেম্বরে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়, যদিও তার পূর্বেই সীমান্ত সংঘর্ষ থেমে গিয়েছিল, চীন এক তরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে দিয়েছিল।

সরকার ও কংগ্রেস এই আইন বিশেষভাবে প্রয়োগ করেছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীদের উপর। সেজন্য এই মিথ্যা অজুহাত দেখিয়েছিল যে তাঁরা এই সীমান্ত বিরোধে চীনের পক্ষের চর ও দালাল এবং দেশদ্রোহীর কাজ করছেন। সরকার এই মিথ্যা অজুহাতেই কমিউনিস্ট পার্টির নামে সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত রকম কুৎসা ও অপবাদ রচনা করতে থাকে, মিথ্যা প্রচারের জোয়ার বইয়ে দেয়। পার্টির কর্মীদের দেশদ্রোহী বলে অপবাদ দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে হামলার জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচার যন্ত্র মারফত দেশপ্রেমের ধুয়া তুলে ও প্ররোচনা দিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদ জাগিয়ে তোলে, বিভিন্ন কমিউনিস্ট-বিরোধী পার্টিকে এবং সমাজ-বিরোধী শক্তিগুলিকে কার্যত কমিউনিস্টদের উপর হামলার জন্য উস্কানি দিতে থাকে। তার বিষময় ফল প্রথমে কিছুদিন ফলেছিল বটে কিন্তু ব্যাপক জনগণ কোথাও কংগ্রেসী সরকারের এই কমিউনিষ্ট-বিরোধী জিগিরে সাড়া দেয়নি। যারা প্রথমে সাড়া দিয়েছিল তারাও অল্পকালের মধ্যেই সরকারের আসল উদ্দেশ্য ধরে ফেলে।

কৃষক সভার অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মী যেহেতু ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিরও কর্মী, সেই কারণে সরকারী এবং কংগ্রেসী ও অন্যান্য উগ্রপন্থীদের হামলাটা তাঁদের উপর যেমন তেমনি এবং কৃষক সভার উপরও এসে পড়ে। আসলে এ ছিল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়ার শ্রেণীগত প্রত্যক্ষ আক্রমণ।

সরকারী হামলার সুযোগ

১৯৪৮ সনে যখন কমিউনিস্ট পার্টির উপর কংগ্রেস সরকারের আক্রমণ হয় তখনো একই কারণে কৃষক সভার ও তার কর্মী ও নেতাদের উপরও হামলা হয়। কিন্তু তখন সে আক্রমণ ছিল শুধু সরকারী তরফ থেকে। এবারকার আক্রমণ ছিল তার থেকে অনেক পরিমাণে ভিন্ন ধরনের, শুধু প্রশাসনিক নয়, সামাজিক ধরনের।

তখন অন্তত বছর তিনেক ধরে যে সরকারী হামলা চলেছিল তার পক্ষে একটা সময়ে সরকারের অন্তত কিছু অজুহাত ছিল, কারণ তখন একটা তোড়-ফোড় ধরনের আন্দোলনের মধ্যে বহু কমিউনিস্ট কর্মী জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এবার তেমন কোন ঘটনাই ঘটেনি, তার কোন লক্ষণ বা কারণও দেখা দেয়নি। আর তখন আক্রমণ কেবল সরকারী তরফ থেকেই হয়েছিল, সমাজ-বিরোধী বা উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে সেজন্য উস্কানি দেওয়া হয়নি, তারা নমেওনি কমিউনিস্ট বিরোধিতার ময়দানে।

সরকার অবশ্য কৃষক সভার দিক থেকে একটা দুর্বলতার সুযোগ পেয়েছিল যা ১৯৪৮এর যুগে পায়নি। ভারত-চীন সম্পর্ক নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। এই মতবিরোধ স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় অক্টোবর (১৯৬২) সংঘর্ষের সময়ে। সরকার তার সুযোগ নিতে ভুল করেনি। দুটি পরস্পর-বিরোধী মতের একটিকে প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে প্রধানত অন্য মতটির সমর্থকদের উপর সরকারী হামলা চলে এবং সেই হামলার সমর্থনে প্রথম মতের কোন কোন বিশিষ্ট প্রবক্তার বক্তব্যও উদ্ধৃত করা হয়।

এই কৌশলে সরকার পার্টির দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করে। রাজনীতিক বিরোধটা তীব্র হতে থাকে। এক পক্ষ বাইরে থেকে তার বক্তব্য প্রচার করতে পারে, অন্য পক্ষ সরকারী হামলার কারণে তার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। পার্টি কার্যত দু ভাগ হয়ে পড়ে, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হয় আরো পরে। এই ভেদ-বিরোধ স্বভাবতই প্রতিফলিত হয় কৃষক সভার মধ্যেও। কৃষক সভা দুর্বল হয়ে পড়ে। সে সুযোগে সরকার তাকে আক্রমণ করে।

এই অবস্থা বেশি দিন চলেনি। জেলের বাইরে কমিউনিস্ট ও কৃষক কর্মীদের উদ্যোগে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন কয়েক মাসের মধ্যেই আরম্ভ হয়ে যায়। সরকারের কমিউনিস্ট-বিরোধী মুখোশ ও গণতন্ত্র-বিরোধী উদ্দেশ্য ক্রমেই লোক চক্ষে ধরা পড়ে যেতে থাকে। তার ফলে ১৯৬৩র শেষ দিকে ও ১৯৬৪র প্রথম দিকে আটক বন্দীরা মুক্ত হন, তখনকার মতো গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরিক বিরোধের নিষ্পত্তি মিলনের মধ্যে না হয়ে ভাঙ্গনের মধ্যেই হল—পার্টি বিভক্ত হয়ে গেল। কিন্তু সে নিষ্পত্তিও সম্পূর্ণ

হতে-না-হতেই আবার হামলা এল একটা পার্টির উপর, বিশেষ করে বাংলাদেশে যেখানে সেই পার্টির কর্মীর সংখ্যাই ছিল খুব বেশি। ১৯৬৪র শেষ দিকে সরকার এই পার্টির কর্মী ও নেতাদের আবার কুখ্যাত ডি. আই. রুলস অনুসারে গ্রেপ্তার করে আটক রাখলে। এবার বিশেষ করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একই দিনে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হল। নতুন ভাবে কৃষক আন্দোলনের কাজকর্ম যতটা আরম্ভ করার সম্ভাবনা ছিল তাও আবার ব্যাহত হল। আবার আন্দোলন চালিয়ে তাঁদের মুক্ত করতে দেরি হল, প্রায় দেড় বছর লেগে গেল। তাঁরা মুক্তি পেলেন ১৯৬৬ সনের মে মাসে।

ষোল

পাঁচ বছরের মধ্যে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের কোন অধিবেশন হতে পারেনি। আবার ১৯৬৭ সনে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন। তাই সারা রাজ্যের পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে আবার অগ্রসর হবার উদ্দেশ্যে ৮ই জুলাই ১৯৬৬ তারিখে প্রাদেশিক কৃষক কমিটি অল্প দিনের মধ্যেই পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অষ্টাদশ সম্মেলন ঃ সাতগেছিয়া

১৪ থেকে ১৬ অক্টোবর ১৯৬৬ তারিখে সভার অষ্টাদশ অধিবেশন হবে স্থির হয়। সেই অনুসারে ঐ সময়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান জেলার সদর মহকুমার সাতগেছিয়া গ্রামে, যদিও খাদ্য সংকট ও অন্যান্য কারণে সেটা নিতান্ত অসময়ই ছিল। তখন আবার বর্ধমানে দমন-পীড়নও চলছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে গেলেও দুই পার্টির কর্মীরা তখনো কৃষক সভার মধ্যে মিলিতভাবেই কাজ করছিলেন। সম্মেলনেও দুই পক্ষের প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন, আলোচনায় শরিক হয়েছিলেন। দুই পক্ষ একমত হয়ে কমিটি ও কাউন্সিল নির্বাচন করেছিলেন, তাতে ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। ৫৭ জনের কমিটি ও ১৯ জনের কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। সভাপতি ও সম্পাদক সমেত আগের কমিটির কর্মকর্তারা প্রায় সকলেই নতুন কমিটিরও কর্মকর্তা নির্বাচিত হন।

সাতগেছিয়া সম্মেলনের সময় (১৯৬৬) মেম্বর সংখ্যা ছিল ১,১৪,৯৮৫। আগের বছর (১৯৬৫) মেম্বর ছিল ৫৩,৪৫২। সব জেলা থেকে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪৯৪। দর্শক ছিলেন ১০৫, আর বিভিন্ন গণ-সংগঠন থেকে মিত্র প্রতিনিধি ১৮। প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ছিলেন বিনয় কোঙার। ১২ জনের স্টিয়ারিং কমিটি সম্মেলন পরিচালনা করে। সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি এ. কে. গোপালন প্রতিনিধি সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান এবং পরে কৃষক সমাবেশেও বক্তৃতা করেন।

সভাপতিত্ব করেন বিশ্বনাথ মুখার্জি। সম্মেলন আরম্ভ করবার পূর্বে আনুষ্ঠানিক ভাবে যখন পতাকা অভিবাদন হয় তখন কৃষক সভার লাল পতাকা উত্তোলন করেন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ।

কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ, সারা ভারত সভার সাধারণ সম্পাদক জগজিৎ সিং লায়ালপুরী, পিপ্লস রিলিফ কমিটি, প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও সংযুক্ত গণ-শিল্পী সংস্থা যে অভিনন্দন বাণী পাঠান তা সম্মেলনে পড়ে দেওয়া হয়। সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা কমিটির তরফ থেকেও অভিনন্দন জানানো হয়।

পি. আর. সি-র মেডিকেল স্কোয়াড অন্যান্য বারের মতো এবারেও অসুস্থ প্রতিনিধিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। গণনাট্য সংঘ ও গণ-শিল্পী সংস্থার কয়েকজন শিল্পী অনেকগুলি গান গেয়ে শোনান।

অধিবেশন শুরু হবার পূর্বে সম্পাদকের রিপোর্ট এবং খসড়া প্রস্তাবগুলির ছাপানো কপি সমস্ত প্রতিনিধিকে দেওয়া হয়।

কৃষি সংকট জাতীয় সংকটে পরিণত

সম্পাদক কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার তাঁর রিপোর্টে বল্লুক থেকে সাড়ে পাঁচ বছরের পরিস্থিতি আলোচনা করেন। পূর্বেকার রিপোর্টগুলির তুলনায় এবারকার রিপোর্টের রাজনীতিক চরিত্র বেশি পরিস্ফুট ছিল। তিনি বলেন, এই সময়ে "দেশের জনসাধারণের, কৃষির ও সামগ্রিক অর্থনীতিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটিয়াছে। বর্তমানে অবস্থা খুবই সংকটজনক। কৃষি-সংকট আজ জাতীয় সংকটে পরিণত হইয়াছে।" (সম্পাদকের রিপোর্ট, পৃ ৩).

"সরকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ তীব্রতর করিয়াছে, পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করিয়াছে···এবং পুলিসী ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে আরো নিষ্ঠুর দমন-নীতি চালাইতেছে। কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও জরুরী অবস্থা ও ভারত রক্ষা আইন বজায় রাখা হইতেছে। একদিকে জনগণের ন্যায়সংগত দাবি-দাওয়ার প্রতি উপেক্ষা, অন্যদিকে গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিসী আক্রমণ —ইহাই হইয়াছে সরকারী পদ্ধতি।" (পৃ ৫)

"আমাদের দেশ কৃষি প্রধান বলিয়া আমাদের প্রয়োজন ছিল সাম্রাজ্য-বাদী, সামন্তবাদী ও একচেটিয়া শোষণের অবসানের পর পুনর্জীবিত কৃষির উপর ভিত্তি করিয়া···দ্রুত সর্বাংগীন সুষম বিকাশের ব্যবস্থা করা। কিন্তু

তাহা করিতে অস্বীকার করা হইতেছে। সামন্তবাদী শোষণ হইতে কৃষককে মুক্তি দিলে ও জমিকে মেহনতী খেতমজুর ও কৃষকদের হাতে দিলে বিপুল-সংখ্যক কৃষকের সৃজনী শক্তির রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া যাইত, কৃষি উৎপাদনে জোয়ার আসিত।" (পৃ ৭) কিন্তু শাসক শ্রেণীরা সে পথে না গিয়ে এখন "একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দ্বারা চাষে জয়েন্ট স্টক কোম্পানী গঠনের কথা ভাবিতেছে এবং সেই পথে কিছুটা অগ্রসরও হইয়াছে।" (পৃ ৯) এই উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবে ও মধ্য প্রদেশে কোন কোন ধনকুবের শিল্পপতি গোষ্ঠীকে প্রচুর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল।

সরকারী নীতির কারণে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের ও অন্যান্য মেহনতকারী মানুষের শোচনীয় অবস্থার কথা আলোচনা করবার পর রিপোর্টে বলা হয়, "সংক্ষেপে বলিতে গেলে, গত পাঁচ বৎসরে কৃষি সংকট আরো গভীর হইয়াছে। সারা দেশে ইহা গভীর জাতীয় সংকটের রূপ লইয়াছে। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র আজ গুরুতরভাবে বিপন্ন হইয়াছে।"(পৃ ১৭)

সভার কাজে গুরুতর ত্রুটি

জরুরী আইনের সুযোগ নিয়ে দমন পীড়ন চালিয়ে সরকার সমস্ত গণ-আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। তার চাপে সে সময় বছর তিনেক কৃষক আন্দোলন জোরালো হতে পারেনি। পরে যখন ১৯৬৩-৬৪ সনে কলকাতার জয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন, তাকে ভাঙবার জন্য বিস্তর পুলিস পাঠানো হয়। তাতেও বিশেষ ফল হয় না। তখন শাসক শ্রেণীদের ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে গণ-আন্দোলনকে ভাঙতে চেষ্টা করা হয়। সে সময় ২৪ পরগনার কৃষক কর্মীরা জয়া শ্রমিকদের সাহায্য করেছেন, আবার দাঙ্গার বিরুদ্ধেও কৃষক ও শ্রমিকরা মিলিতভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন। (পৃ ১৮-১৯)

১৯৬৬-র ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এপ্রিলের খাদ্য সংগ্রামে কৃষকরা ও কৃষক সভা মোটের উপর ভালোভাবে শরিক হয়েছিল। ঐ বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বরের আন্দোলনে আরো জোরদার ভূমিকা পালন করেছিল। (পৃ ১৯)

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সরকারী দমনের আঘাত যখন কৃষকদের ও কৃষক সভার উপর বিশেষভাবে পড়েছিল, তখন তার বিরুদ্ধে কৃষক সভার উচিত ছিল শক্তিশালী প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা, কিন্তু তা করা হয়নি। কৃষক সভা বন্দীমুক্তির জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু "জরুরী অবস্থা,

ভারতরক্ষা আইন ও দমন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়িয়া তোলার ব্যাপারে আমরা দুর্বলতা দেখাইয়াছি। উগ্র জাতীয়তাবাদী আবহাওয়া ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার যখন টাকার অপচয় করিয়া লাটভবনে ও অন্যত্র কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রহসন করিয়াছে, তখন বাস্তবে কৃষকদের উপর জোতদার-মহাজনদের আক্রমণ চালাইতে সাহায্য করিয়াছে।

"এমনি অবস্থায় ১৯৬৩ সনে কৃষক সভার পক্ষ হইতে দেশরক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাজ্য কনভেনশন করার সিদ্ধান্ত কার্যত সরকারকেই বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ দিয়াছে। স্বভাবতই কৃষক কর্মীরা এই সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।" (পৃ ২১)

মৌলিক সংগ্রাম ও তার প্রধান শক্তি

আন্দোলন সম্বন্ধে রিপোর্ট আরো বলেছে: পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুপ্রবেশের ফলে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আরও দাবির বিভিন্নতা ও জটিলতা বাড়িয়াছে। এই অবস্থায় মেহনতী কৃষকদের মধ্যে ঐক্যের যোগসূত্র স্থাপনে সাহায্য করিতে পারে মৌলিক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত।...এই সমস্ত কারণেই কৃষক আন্দোলনকে অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডী হইতে টানিয়া বাহির করা এবং মৌলিক সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতের পটভূমিকায় কৃষকদের আশু ও আংশিক দাবির আন্দোলনগুলি গড়িয়া তোলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। (পৃ ২৪)" "মনে রাখা প্রয়োজন যে আশু দাবির সংগ্রামগুলি ক্রমশ বেশি করিয়া সরকারী নীতির বিরোধিতার এবং সরকার ও জোতদার-মহাজনের আক্রমণের সম্মুখীন হইতেছে, এবং দাবি আদায় করা আরো কষ্টকর হইতেছে।" (পৃ ২৫)

"গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীভেদ বাড়িয়াছে। দেশের মৌলিক গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সংগ্রামে সমস্ত স্তরের কৃষকদের স্থান আছে। সেইজন্য কৃষক ঐক্যের প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে খেত-মজুর, বর্গাদার ও গরিব কৃষকই হইল সর্বাপেক্ষা প্রধান সংগ্রামী শক্তি। ইহাদের সচেতন ও সংগঠিত করার উপরই কৃষক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কৃষক সভার প্রাথমিক সদস্যদের মধ্যে ইহারাই সংখ্যায় বেশি।...কিন্তু ইহাও অস্বীকারও করিয়া লাভ নাই যে ইহাদের, বিশেষত খেতমজুরদের সংগঠিত ও শ্রেণীসচেতন করার দিকে

আমরা খুব কমই নজর দিয়াছি।...প্রধান কথা হইল খেতমজুর ও গরিব কৃষকদের সচেতন ও সংগঠিত করা।...এবিষয়ে আমাদের যথেষ্ট ত্রুটি ও দুর্বলতা আছে এবং ইহা কৃষক আন্দোলনকে পিছনে টানিয়া রাখার অন্যতম কারণ। এ দুর্বলতা আমাদের সত্বর দূর করিতে হইবে এবং সমগ্র কৃষক আন্দোলনকে গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া তোলার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সচেতনভাবে কাজ করিতে হইবে।" (পৃ ২৭)

মার্কিণ চক্রান্ত সম্বন্ধে হুশিয়ারি

স্বাধীনতার পর বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদের বিশেষত মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বিস্তারের নূতন কৌশল ও চক্রান্ত সম্বন্ধে আমরা সম্যক অবহিত ছিলাম না। ফলে আমাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রচার ও আন্দোলন দুর্বল হইয়াছে। এখন যখন গোটা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তখন...তাহার বিপদ সম্বন্ধে কৃষক-সাধারণকে সচেতন করা বিশেষ কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" (পৃ ২৮)

পরে বলা হয়েছে, "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বর্তমানে এসিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" এই সংগ্রামের সমর্থনে প্রবল জনমত গড়ে তোলা কর্তব্য। (পৃ ২৮) ভিয়েতনামের জনগণের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নমুনা-সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় কৃষক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুসারে কৃষক সভা "ভিয়েতনাম সপ্তাহে" (২৪-৩১ আগস্ট ১৯৬৬) পাঁচ হাজার ব্যাজ বিক্রী করে ২৫০ টাকা পাঠিয়েছিল। অন্যান্য রাজ্যের টাকার সংগে এই টাকা দিল্লীতে ভিয়েতনামী কনসালকে দেওয়া হয়।

আরো বলা হয়: "শহর ও শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণীর সহিত আমাদের সৌভ্রাত্রমূলক যোগাযোগকে বাড়াইয়া তুলিতে হইবে এবং কৃষক আন্দোলনের প্রতি তাহাদের আগ্রহ ও সমর্থনকে বৃদ্ধি করিতে হইবে। অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির (ছাত্র, কর্মচারী, শিক্ষক) সহিতও আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে।" (পৃ ৩১)

শেষ দিকে সারা ভারত কৃষক সভা সম্পর্কে বলা হয়: "আমাদের রাজ্যের কৃষক সভা তার জন্মের প্রথম হইতেই সারা ভারত কৃষক সভার শাখা হিসাবে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত আছে। প্রাদেশিক কৃষক সভা সব সময় সারা ভারত কৃষক সভার নির্বাচিত কমিটি ও কেন্দ্রীয় কৃষক কাউন্সিলের

প্রতি যথোচিত মর্যাদা দেখাইয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের সিদ্ধান্তগুলিকে রাজ্যের বাস্তব অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া কার্যকর করার চেষ্টা করিয়াছে। আমরা নিশ্চয়ই সংগঠনের এই স্বাভাবিক নিয়মকে নিষ্ঠা সহকারে মানিয়া চলিব এবং তাহার মধ্য দিয়া সংগঠনের ঐক্যকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে সাহায্য করিব।" (পৃ ৩৩)

সম্পাদকের মন্তব্যের উপর ভোট

সম্পাদকের রিপোর্ট আলোচনার সময় বিশেষভাবে দুটো বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। ক্যানাল কর সম্বন্ধে একটি মন্তব্য সংশোধন করা হয়। অন্য বিষয়টি ছিল দেশরক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১৯৬৩ সনে কৃষক সভার পক্ষ থেকে রাজ্য কৃষক কনভেনশন করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সম্পাদকের মন্তব্য। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্মেলনে মতামত প্রকাশ করবার পূর্বে তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তদন্ত করা হ'ক বলে বিশ্বনাথ মুখার্জি এক প্রস্তাব আনেন কিন্তু সম্পাদক তাতে রাজি না হওয়ায় বিষয়টি ভোটে দেওয়া হয় এবং তদন্ত দাবির প্রস্তাবটি বিপুল ভোটে বাতিল হয়ে যায়। সম্পাদকের রিপোর্টের কোন বক্তব্য সম্বন্ধে এ-ধরনের ভোট গ্রহণ কৃষক সভার জীবনে এই প্রথম।

সম্মেলনে যেসকল প্রস্তাব পেশ করা হয় তার মধ্যে ভূমি সংস্কার, খাদ্য-সঙ্কট, ফসলের দর ও খেতমজুর সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলিকে আলোচনার জন্য চারটি কমিশন করে তার পরিচালনার ভার দেওয়া হয় যথাক্রমে কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জি, রসুল, বগলা গুহ ও সুনীল সেনের উপর। প্রতিনিধিরা ইচ্ছামতো যেকোন কমিশনে যোগদান করতে পারেন। এ-ধরনের কমিশন গঠন পূর্বেও কোন কোন সম্মেলনে করা হয়েছিল, যেমন বাগনানে। তাতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে আলোচনা শেষ করার সুবিধা ছিল।

কমিশনের আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সংশোধনী সমেত এইসব প্রস্তাব পূর্ণ প্রতিনিধি সম্মেলনে হাজির করা হয় এবং তার মতই চূড়ান্ত মত বলে গৃহীত হয়। অন্যান্য প্রস্তাব পৃথকভাবে সম্মেলনে আলোচিত ও গৃহীত হয়।

"ভিয়েৎনাম জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের সমর্থনে" একটি প্রস্তাব কিছু সংশোধনের পরে গৃহীত হয়। "ভারত-চীন বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা" প্রস্তাবে বলা হয়: "১৯৬২ সনের অক্টোবর মাসে ভারত-চীন সীমানা সংঘর্ষের সময় হইতে চীনের সহিত ভারতের বিরোধ তীব্র হইয়া ওঠে এবং গত চার বৎসরের মধ্যে নূতন কোন সংঘর্ষ না বাধিলেও সে বিরোধের অবসান ঘটে

নাই, এসিয়ার দুই বৃহত্তম রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কেও কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই। ভারতের রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত গত বৎসরেই এক প্রকাশ্য সভায় চীনের সহিত বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার উপর জোর দিয়াছিলেন এবং এবার ১৫ আগস্টের বাণীতেও তিনি সে প্রয়োজনের পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। সম্মেলনের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে চীনের সহিত সীমানা বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য ভারত সরকারের উদ্যোগী হইয়া সরাসরি আলোচনার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।" (সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ ৭২)

দমনতন্ত্রের বিরোধিতা

"সরকারী দমন ব্যবস্থার প্রতিরোধ" প্রস্তাবে বলা হয়: "গত কয়েক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার সমস্ত কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করিবার জন্য যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ক্রমশ এক পরিকল্পিত ও সংগঠিত দমনতন্ত্রের রূপ ধারণ করিতেছে। এই দমনতন্ত্রের মধ্যে দেখা যায় পুলিসের উৎপীড়ন ও সন্ত্রাস, মিলিটারীর তাণ্ডব, মিথ্যা প্রচার, কুৎসা রটনা, পুলিস লেলাইয়া বা মিথ্যা মামলায় জড়াইয়া মানুষকে হয়রান করা, এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে গলা টিপিয়া মারার, এমন কি সমাজ-বিরোধী গুণ্ডাদলের সাহায্য লওয়ার এবং সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার উস্কানি দেওয়ার অভূতপূর্ব জঘন্য ব্যবস্থা। (ঐ, পৃ ৬৮)

"শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সম্বন্ধে সরকারের আক্রোশ ও দমনের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি। বড় বড় জোতদারদের ও শিল্পপতিদের শোষণ ও মুনাফার স্বার্থে কৃষক ও শ্রমিকদের শোষণ-বিরোধী বাঁচার আন্দোলন দমন করিবার জন্য সরকার সকল সময়েই উন্মুখ। ...মেহনতকারী জনগণের জীবনযাত্রার কঠোরতা দিন দিন যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, সরকারী দমনের ঘটাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে। ...জনগণের আন্দোলনগুলিকে...দমন করিবার জন্য সরকার অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রপতির ঘোষিত জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়া...কালাকানুনগুলিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন।" (ঐ, পৃ ৬৯)

"গত বৎসর ভারত-পাক যুদ্ধের অজুহাতে বহু কংগ্রেসী মুসলমান সমেত হাজার হাজার মুসলিম নাগরিককে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখিয়া ও তাঁহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া এবং সম্প্রদায়গতভাবে তাঁহাদের প্রতি

বৈষম্যমূলক আচরণ করিয়া সরকার জরুরী অবস্থার ও আইনের অপব্যবহার করিয়াছেন।" (ঐ, পৃ ৬৯)

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬র খাদ্য আন্দোলনে কলকাতা ও পশ্চিম বাংলার বহু অঞ্চলে সরকারী হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিয়ে প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে "এই আন্দোলন উপলক্ষে দুই মাসের মধ্যে কৃষক সভার বহু কর্মী ও নেতা সমেত হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা, বিনা বিচারে আটক করা, জেলের মধ্যে নানাভাবে পীড়ন করা, ঘরবাড়ি তল্লাশী ও জিনিসপত্র নষ্ট করা, নারী ও শিশু নির্বিশেষে সকলকে মারপিট করা, লাঠি, কাঁদানে গ্যাস ও গুলি চালানো—এই সমস্ত ঘৃণ্য ও বর্বর উপায়ই তাঁহারা কাজে লাগাইয়াছেন।··· বিরোধী পক্ষের বহু মেম্বরকে জেলে আটক রাখিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে ও বিভিন্ন বিধানমণ্ডলীতে সরকার কুৎসা প্রচারেরর বন্যা বহাইয়াছেন অথচ তাঁহাদের জবাব দিবার সুযোগটি পর্যন্ত হরণ করিয়াছেন।··· কৃষক সম্মেলন এই সরকারী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে।" (ঐ, পৃ ৭০)

"সম্মেলন দাবি করিতেছে: অবিলম্বে জরুরী অবস্থা তুলিয়া লইতে হইবে···এবং সমস্ত সরকারী দমন ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা কায়েম করিতে হইবে।" (পৃ ৭১)

সর্বভারতীয় মোর্চা গঠনের পথে

"সংগ্রামী জনগণকে অভিনন্দন" প্রস্তাবে বলা হয়, "সম্প্রতিকালে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এবং বিশেষ করিয়া পশ্চিম বাংলায় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতি ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমাজের বিভিন্ন মেহনতকারী শ্রেণী ও স্তরের বিক্ষুব্ধ জনগণ তাঁহাদের ন্যায় সঙ্গত দাবির সংগ্রামে যেভাবে যোগদান করিয়াছেন, তাহা বাংলার কৃষক সমাজকে যথেষ্ট উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের এই অষ্টাদশ অধিবেশন তাঁহাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছে। সম্মেলন এই সমস্ত জনগণের দাবি সমর্থন করিতেছে ও এই সকল দাবি পূরণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছে।

"···এই সমস্ত সংগ্রাম ক্রমশ একটি বিরাট সম্মিলিত, সামগ্রিক ও সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রামে পরিণত হইতেছে। এই সম্মেলন লক্ষ্য করিতেছে যে কৃষক ও খেতমজুরদের সংগ্রাম এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের

সহিত ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে এবং উহার সহিত কৃষক আন্দোলনের সংহতির উপর বিশেভাবে জোর দিতেছে।" (ঐ, পৃ ১২)

ভূমি সংস্কারের নামে সরকারী প্রবঞ্চনা

সাতগেছিয়া সম্মেলনে ভূমিসংস্কার সম্বন্ধে একটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে বিগত কয়েক বছরের দমনপীড়ন কাটিয়ে নতুন করে সংগ্রামের আহ্বান দেওয়া হয়। সেই সংগে কিছু নতুন মন্তব্য ও বক্তব্যও প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে পরিষ্কার বলা হয়: "কংগ্রেস নেতৃত্ব ও সরকার মুখে যত বড় বড় কথাই বলুন না কেন, আসলে তাঁরা প্রকৃত ভূমিসংস্কার করতে কিছুতেই রাজি নন। (ঐ, পৃ ১৪)···তাই ভূমি সংস্কার একটা বিরাট প্রহসনে পরিণত হয়েছে, চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, এবং এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে কংগ্রেসী সরকারের পরিবর্তে একটি প্রকৃতই কৃষক দরদী, প্রকৃতই প্রগতিশীল সরকার গঠিত না হলে এবং কৃষক জনতার আরো ব্যাপক, আরো ঐক্যবদ্ধ, আরো সুদৃঢ় সংগ্রাম না হলে প্রকৃত ভূমি সংস্কার এদেশে হবে না।" (ঐ, পৃ ১৫)

আইন ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে সরকারী নীতি ও ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করে বলা হয়: "মোটামুটি এই হল ১৯ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে জমিদারী দখল ও ভূমি সংস্কারের ফলাফল। কৃষক সমাজের প্রতি এত বড় প্রবঞ্চনার তুলনা হয় না। এবং এরই বিষময় ফল ভোগ করছে সারা জাতি···। প্রকৃত ভূমি সংস্কারের জন্য কৃষকদের সুদীর্ঘ আন্দোলন, অসংখ্য কঠোর সংগ্রাম আজ এক বৈপ্লবিক মোড়ঘোরার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।" (ঐ, পৃ ১৮)

"খাদ্য সঙ্কট" প্রস্তাবে বিস্তৃতভাবে খাদ্য পরিস্থিতি ও সরকারী নীতি বিশ্লেষণ করা হয় এবং খাদ্য সঙ্কট ও মূল্য সঙ্কট যাতে আরো গভীর না হতে পারে, যাতে সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সেজন্য আন্দোলনের আহ্বান দেওয়া হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়: "খাদ্য সঙ্কট এখন আর শুধু খাদ্য সঙ্কট নাই, জাতীয় সঙ্কটে পরিণত হইয়াছে।" (ঐ, পৃ ২৬)

"সরকারী সংগ্রহ ব্যবস্থা শুধু যে ব্যর্থ হইয়াছে তাই নয়, জনগণের স্বার্থের দিক হইতে অনিষ্টকর সাব্যস্ত হইয়াছে। এবং মজুতদার ও মুনাফাখোর-দেরই লাভবান করিয়াছে। কংগ্রেস সরকারের খাদ্যনীতির ইহাই যে

অন্যতম লক্ষ্য তাহার পরিচয় সরকারের খাদ্যনীতি ও মূল্য নীতির মধ্যে প্রতি বৎসরই পাওয়া যায়, এবারও পাওয়া গিয়াছে।" (ঐ, পৃ ২৯)

"সরকারী খাদ্য নীতির এই সমস্ত অনাচার ও উৎপীড়নের"ই "পরিণতি গত ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসের প্রচণ্ড সংগ্রাম এবং ১৫ হইতে ২১ সেপ্টেম্বরের ব্যাপক ঘেরাও আন্দোলন ও ২২-২৩ সেপ্টেম্বরের রাজ্যব্যাপী ঐতিহাসিক হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘট।" (ঐ, পৃ ৩১)

"এই খাদ্যনীতি লইয়া সরকার জনগণের বিরুদ্ধে নিজেদের দলীয় রাজনীতির খেলা চালাইতেছেন। সম্মেলন এই রাজনীতিক খেলার তীব্র নিন্দা করিতেছে।" (ঐ, পৃ ৩২)

সম্মেলন বিকল্প খাদ্যনীতি প্রস্তাব করে এবং তা গ্রহণ ও প্রয়োগ করার জন্য সরকারেব নিকট দাবি জানায়।

মার্কিন স্বার্থে ভারতের অর্থনীতি

১৯৬৬ সনের জুন মাসে ভারত সরকাব যে টাকার অবমূল্যায়ন ঘোষণা করে, সম্মেলন এক প্রস্তাবে তাব বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কারণ, প্রস্তাবে বলা হয, এই অবমূল্যাযন কবা হয়েছে "দেশের অর্থনীতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে, ...মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মহাজনদেব স্বার্থে এবং তাহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব-ব্যাংকের ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের চাপে...মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াপতিদের সহিত ভারতীয় একচেটিয়াপতিদের সহযোগিতার নীতিকে এবং সেই সঙ্গে মার্কিন পুঁজি আমদানীকে অনেক বৎসর ধরিয়া উৎসাহ দিয়া ভারত সরকার এদেশে দেশী ও বিদেশী প্রাইভেট পুঁজিবাদের বিকাশে যেভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, টাকার এই বিনিময় মূল্য হ্রাস তাহারই একটি অনিষ্টকর পরিণতি।" (ঐ, পৃ ৬২)

আরো কতকগুলি প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়।

"শহীদ স্মরণে" প্রস্তাবে বলা হয় এ-বছর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিস ও মিলিটারির লাঠি ও গুলিতে কলকাতায় ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় নূরুল ইসলাম, আনন্দ হাইত, আব্দুল জব্বার, আশীষ দাশগুপ্ত প্রমুখ অন্তত ৫০ জন শহীদ হয়েছেন।

শোক প্রস্তাবে অন্যান্যদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় কর্মীর উল্লেখ করা হয়: সারাভারত কৃষক সভার দুই প্রাক্তন সভাপতি বঙ্কিম মুখার্জি ও কার্যানন্দ শর্মা, অন্যতম সহযোগী সম্পাদক শ্যামরাও পারুলেকর,

পাঞ্জাব কৃষক সভার সভাপতি ভাগ সিং, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক কমিটির মেম্বর ও বর্ধমান জেলার কৃষক নেতা তারাপদ মোদক ও সুনীল রায়, মালদহ জেলার কৃষক নেতা ও এম. এল. এ. ধরণী সরকার এবং কৃষক নেতা আব্দুল হালিম।

সারা ভারতের এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জির অবদান অপরিসীম। তিনি ১৫ নবেম্বর ১৯৬১ তারিখে কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্স অব ওয়েলস হাসপাতালে ক্যানসার অপারেশনের পর মারা যান। ক্যানসার রোগেই মারা যান বর্ধমান জেলার তারাপদ মোদক (নবেম্বর ১৯৬৪) ও সুনীল রায় (এপ্রিল ১৯৬৪)। কমরেড কার্যানন্দ শর্মা চিকিৎসার জন্য সোবিয়েত দেশে থাকতে হঠাৎ মারা যান। ডক্টর ভাগ সিং মারা যান ১০ আগস্ট ১৯৬৬ তারিখে। কমরেড পারুলেকর ডি. আই. রুলে আটক থাকা কালে বোম্বাইয়ের জেলে ৩ আগস্ট ১৯৬৫ সনে হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা যান। কমরেড হালিমও কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেল থেকে ডি. আই. রুলে আটক বন্দী অবস্থায় থাকার পর মুক্তির মাত্র কয়েক দিন পরে ২৯ এপ্রিল ১৯৬৬ তারিখে তাঁর কলকাতার বাসায় হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা যান। মালদহ জেলার কমরেড ধরণী সরকার প্রাদেশিক কৃষক কমিটির প্রাক্তন মেম্বর ছিলেন। তিনি কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ক্যানসার অপারেশনের পর মারা যান ১৯৬৪র ফেব্রুয়ারি মাসে। এত জন বিশিষ্ট কমরেডের মৃত্যু স্বভাবতই সম্মেলনের উপর বিষাদের ছায়াপাত করে।

সতের

সাঙ্গেছিয়া সম্মেলনের পরবর্তী কালে পশ্চিম বাংলার পরিস্থিতির মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। দেশ যে অর্থনীতিক সঙ্কটের আবর্তে পড়ে ছিল তা আরো তীব্র হতে থাকে, সরকারী তরফ থেকে সঙ্কট মোচনের জন্য কোন রকম পদক্ষেপেই গ্রহণ করা হয় না, সঙ্কটের তীব্রতা রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার ফলে সাংস্কৃতিক জীবনে পর্যন্ত মার্কিন অবক্ষয়ী প্রভাব নগ্নভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। সঙ্কট একটা সামগ্রিক সামাজিক বিষয়ে পরিণত হতে থাকে এবং এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছায় যাতে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া তার কোন স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না, তার গতিরোধ করাও সম্ভব হয় না।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মিয়াদ ফুরিয়ে গেলে দেখা যায় সরকারী তরফ থেকে বড় বড় কথা ও প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। তার লক্ষ্যের দিকে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। আর চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ আরম্ভই করা যায়নি; আমেরিকা থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ না পাওযায় তার কাজ শুরু হতে পারেনি। সঙ্কটের ফলে শিল্পের উৎপাদন বাড়াবার পরিবর্তে কমিয়ে দিতে হয়েছে, বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ারকে পর্যন্ত কাজের অভাবে বেকার থাকতে হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজগুলিতে ছাত্রভর্তি কমিয়ে দিতে হয়েছে।

কৃষি উৎপাদনেও উন্নতি হয়নি। বিদেশ থেকে জাহাজ ভাড়া দিয়ে খাদ্য আমদানী অব্যাহত রাখতে হয়েছে, শিল্পের জন্য কাঁচা মালও আনতে হচ্ছে। কৃষক উচ্ছেদ ব্যাপকভাবে চলছে, মহাজনী ঋণের দায়েও কৃষক জমিছাড়া হয়ে যাচ্ছে, কংগ্রেসী সরকারগুলি জমির একচেটিয়া মালিকানা ভেঙ্গে দিয়ে গরিব কৃষকদের ও খেতমজুরদের মধ্যে জমি বিলির কথা চিন্তাও করছে না।

এমনি পরিস্থিতির মধ্যে আসে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭)। এই নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি সকলে মিলিতভাবে লড়তে না পারলেও জনগণের মধ্যে ব্যাপক কংগ্রেস-বিরোধী বিক্ষোভ থাকার ফলে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস পরাজিত হয়। পশ্চিম বাংলার বাইরেও কেরালা, মাদ্রাজ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ইত্যাদি আটটি রাজ্যেও কংগ্রেস পরাজিত হয়। এই সমস্ত রাজ্যে অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। নির্বাচনের ফলে পশ্চিম বাংলায়ও কংগ্রেস-বিরোধী চোদ্দ পার্টির যুক্তফ্রন্ট ও তার মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

সাতগেছিয়া সম্মেলনে এই নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হবে এবং একটা যুক্তফ্রন্ট সরকার কায়েম হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রাদেশিক কৃষক সভার তখনকার সভাপতি (বিশ্বনাথ মুখার্জি) ও সম্পাদকও (হরেকৃষ্ণ কোঙার) তাঁদের নিজ নিজ পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় যোগদান করেছিলেন।

কংগ্রেসের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্ট সরকার

কৃষক সভা অবশ্য এ ধারণা পোষণ করেনি যে যুক্তফ্রন্ট সরকার সংকট দূর করতে বা মৌলিক ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থা করতে পারবে। তবে এই আশা অবশ্যই করেছিল যে এই সরকারের আমলে কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতকারী জনগণ কোন কোন বিষয়ে কংগ্রেসী আমলের তুলনায় কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা পাবে এবং বিশেষ করে তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কতকটা এগিয়ে নেবার পক্ষে বাধা কম পাবে। সে সুবিধা তারা পেয়েছিল।

যুক্তফ্রন্ট সরকার স্থায়ী হয়েছিল প্রায় ন মাস কাল; ২১শে নবেম্বর (১৯৬৭) কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার রাজ্যপালের মারফত তাকে সম্পূর্ণ বেআইনভাবে বরখাস্ত করে দেয় এবং তার জায়গায় কংগ্রেসের সমর্থনে ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে আঠার জন যুক্তফ্রন্ট ত্যাগী বিশ্বাসঘাতকের মন্ত্রীসভা কায়েম করে। পরে (জানুয়ারি ১৯৬৮) এই পি. ডি. এফ. (পিপল্‌স ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট) মন্ত্রীসভায় কংগ্রেসও যোগ দেয় এবং তখন কংগ্রেস-পি. ডি. এফ. কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা কায়েম হয়।

কিন্তু বাংলার জনগণ এই বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীসভাকে বরদাস্ত করতে পারেনি। তার বিরুদ্ধে ২১ নবেম্বর থেকেই সংগ্রাম শুরু করে এবং সারা রাজ্যে

প্রচণ্ড শক্তিতে গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন চালিয়ে তাকে খতম করে দেয়। তিন মাস ধরে কলকাতায় ও রাজ্যের সর্বত্র কায়েমী স্বার্থের দালাল হিসাবে পুলিসী সন্ত্রাস চালাবার পর খুন-জখম ও দমনপীড়নের নীতির ধারক-বাহক এই সরকার ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখে বাতিল হয়ে যায় এবং পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হয়।

গণতন্ত্ররক্ষা আন্দোলনে কৃষক

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই গণতন্ত্র রক্ষা আন্দোলনে সমস্ত জেলায় এবং খাস কলকাতায় কৃষক সভার ও বিভিন্ন পার্টির নেতৃত্বে হাজার হাজার কৃষক ও অন্যান্যদের মতো আইন অমান্য করে জেলে গিয়েছিলেন।

কংগ্রেস স্বভাবতই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে তার জন্মের দিন থেকেই ভেঙ্গে দেবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল। অপেক্ষাকৃত সহজভাবে শাসন ব্যবস্থা চালাতে পারলে এই সরকারের পক্ষে জনগণের স্বার্থে যতটুকু কাজ করা সম্ভব হত তাও সে করতে পারেনি, কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি তাকে নানা উপায়ে পদে পদে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল, সেজন্য প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নিয়ে হাঙ্গামাও বাধিয়েছিল। তাসত্ত্বেও কংগ্রেস হঠে যাওয়ার ফলে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতকারী জনগণ উৎসাহিত হয়ে ব্যাপকভাবে নিজেদের ন্যায্য দাবির আন্দোলন শুরু করেছিল এবং সেই সব দাবি আদায়ের জন্য বা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিকট কিছু সুযোগ ও সাহায্যও আদায় করতে পেরেছিল। পুলিস ও শ্রমিক-কৃষকদের শ্রেণী শত্রুরা অনেক ক্ষেত্রে সে আন্দোলনকে দমন করবার কাজে কংগ্রেসী আমলের মতো বাড়াবাড়ি করতে সাহস পায়নি।

হঠকারী আন্দোলনের কুফল

যুক্তফ্রন্টের আমলের প্রথম দিকেই পশ্চিম বাংলায় কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা অনিষ্টকর ঘটনা ঘটে যায়। দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার কয়েকজন কৃষক নেতা আওযাজ তোলেন, সেখানে "সশস্ত্র আন্দোলন" মারফত "মুক্ত এলাকা" গঠন করতে হবে। এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকে ঐ মহকুমার নকসালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসীদেওয়া থানা এলাকার মধ্যে। তার মধ্যে নকসালবাড়ি বা নকসাল নামটাই প্রচারিত হয় বেশি এবং প্রচারের ফলে নকসালবাড়ি বা নকসাল শব্দটা হঠকারিতার নামান্তর হয়ে পড়ে।

এই কৃষক নেতারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন, বড় বড় জোতদারদের বেনামী ও অন্যান্য বেআইনীভাবে দখল করা জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার দাবিতে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত না করে এবং সরকারী খাস জমি দখলের দিকে নজর না দিয়ে চা বাগানের শ্রমিকরা যে সামান্য জমি নিজেরা চাষ করত সেই জমি দখল করতে গিয়েছিলেন। তাঁদের এই অন্যায় ও হঠকারী কাজের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে কৃষক স্বার্থের বিরুদ্ধে বড বড জোতদাররা সংগঠিত হয়ে গেল। তারা বহু বিভ্রান্ত কৃষককে পর্যন্ত তাদের ন্যায্য দাবির আন্দোলন থেকে সরিয়ে নিজেদের দিকে টেনে নিলে। এই হঠকারী আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে এবং তাকে নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার, অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি এবং তাদের প্রচারপত্রগুলি কৃষক সভার, কমিউনিস্ট পার্টির (মার্ক্সবাদী) এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রকাশ্য আক্রমণ চালাতে ও কুৎসা রটাতে লাগল।

কৃষক হত্যা ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

এই তথাকথিত নকসালপন্থী আন্দোলন যখন চলছিল সেই সময়, ২৩শে মে ১৯৬৭ তারিখে নকসালবাড়ি থানার বডজোত গ্রামে একদল পুলিস গেলে একজন পুলিস অফিসার সেখানে নিহত হয়। তার পরদিন নিকটবর্তী প্রসাদুজোত গ্রামে পুলিস একটি কৃষক মিছিলের উপর গুলি চালিয়ে সাতজন স্ত্রীলোক ও দুটি শিশু সমেত দশ জন কৃষককে হত্যা করে। শত শত কৃষককে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কৃষক সভার মধ্যে এবং অন্যত্রও ব্যাপক বিক্ষোভ প্রকাশ পায় ও তার নিন্দা করা হয়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার মধ্যেও বিক্ষোভ প্রকাশ পায়।

পরে মন্ত্রীসভা আলোচনা মারফত সমস্যার মীমাংসা করতে চেষ্টা করে এবং ঐ এলাকায় পুলিস পাঠানো বন্ধ করে। কৃষক সভা এই হঠকারী আন্দোলন সম্বন্ধে রাজনীতিক প্রচারের দ্বারা স্থানীয় কৃষকদের বোঝাতে থাকে যে তাদের জমির দাবি ছিল ন্যায়সংগত এবং অন্তত কিছু পরিমাণে জমি আদায়ের সম্ভাবনাও ছিল কিন্তু হঠকারী আন্দোলনের ফলে সে দাবি পূরণ না হয়ে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধেই কাজ করা হয়েছে। তাসত্ত্বেও কৃষক সভা ঐ এলাকা থেকে পুলিস সরিয়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে জমি

বণ্টনের দাবি প্রচার করেছে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা থাকতে এ বিষয়ে কিছু নজর দেওয়া হয়েছিল এবং কয়েক শ একর খাস জমি কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বণ্টনও করা হয়েছিল।

কৃষক সভার প্রচারের ফলে ঐ অঞ্চলের কৃষকরা ও কৃষক কর্মীরা অনেকেই ধীরে ধীরে নিজেদের বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠে হঠকারী পথ ছেড়ে আবার সঠিক আন্দোলনের পথে ফিরে এসেছেন। কৃষক সভা ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি এবং অনেক ট্রেড ইউনিয়ন ঐ এলাকার কৃষকদের ও তাদের নেতাদের মামলা চালাবার জন্য এবং দুঃস্থদের কিছু রিলিফ দেবার জন্য অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছিল। কতকগুলি মামলায় কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির শাস্তিও হয়ে যায় এবং সেজন্য হাইকোর্টে আপিলের ব্যবস্থাও করা হয়। পরে যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৬৯) গঠিত হবার পর এই সরকার সমস্ত মামলা তুলে নেয় ও দণ্ডিত ব্যক্তিদেরও মুক্তি দেয়।

পালটা সভা গঠন

আর একটি ঘটনা হল পালটা কৃষক সভা গঠন। গত কয়েক বছর যাবৎ সারা ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় কৃষক সভার নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে খুব বেশির ভাগই কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী।

এই কর্মীদের মধ্যে অনেকে ভারত-চীন সংঘর্ষের (অক্টোবর-নবেম্বর ১৯৬২) পর যখন ভারত রক্ষা আইনে জেলে আটক থাকতে বাধ্য হন, অন্য অনেকে তখন বিভিন্ন রাজ্যে পালটা কৃষক সভা গঠনের দিকে যেতে থাকেন। তাসত্ত্বেও, ১৯৬৪ সনে পার্টি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবার পরও কৃষক সভার কেন্দ্র বিভক্ত হয় নি। ১৯ জুলাই ১৯৬৭ তারিখে দিল্লীতে এই দুই পার্টির—কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ও দক্ষিণ কমিউনিস্ট পার্টির-কেন্দ্রীয় কৃষক নেতাদের মধ্যে এই মর্মে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে দুই পক্ষই কৃষক সভার মধ্যে এক যোগে কাজ করবে, ১৯৬১-৬২ সনে গঠিত রাজ্য কৃষক কমিটিগুলিকে মেনে নেবে এবং কেন্দ্রীয় কিসান কাউন্সিলের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সংগৃহীত প্রাথমিক সভ্যসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে পরবর্তী সারা ভারত সম্মেলনে যোগদান করবে।

কিন্তু ৩০-৩১ আগস্ট (১৯৬৭) মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় কিসান কাউন্সিলের সভায় দক্ষিণ কমিউনিস্ট মেম্বররা এই চুক্তি ভঙ্গ করে কতকগুলি অন্যায় দাবি তোলেন এবং তা অন্য পক্ষ মানতে রাজি না হওয়ায় দিল্লী ফিরে গিয়ে তাঁরা

পালটা কৃষক সভা গঠন করেন। ডিসেম্বরে (১৯৬৭) তাঁরা এক "সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের" অধিবেশনও করেন মহারাষ্ট্রের অমরাবতী শহরে। পশ্চিমবাংলাতেও তাঁরা সাতগেছিয়া সম্মেলনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অমান্য করে, প্রাদেশিক কৃষক কমিটিকে কোন কথা না জানিয়ে হঠাৎ এক পালটা সংগঠন খাড়া করেন। জুন মাসে (১৯৬৮) তার সম্মেলনও তাঁরা করেছেন বীরভূম জেলায়। কৃষক সভার নাম ও পতাকাও তাঁরা ব্যবহার করছেন।

এই ভাবে ১৯৩৬ সনে গঠিত সারা ভারত কৃষক সভাকে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট নেতারা দ্বিধা-বিভক্ত করে কৃষকদের সংগঠনকে দুর্বল করতে চেষ্টা করছেন, কৃষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন, তাদের উপর আক্রমণের জন্য তাদের শ্রেণী শত্রুদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করছেন।

সারা ভারত কৃষক সভার ঊনবিংশ অধিবেশন বসেছিল মাদ্রাজের মাদুরাই শহরে ২৬-২৮ জানুয়ারি ১৯৬৮ তারিখে। এই সম্মেলনে বিভেদপন্থীদের নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাদেশিক কৃষক কমিটি থেকে তার দক্ষিণ কমিউনিস্ট সভাপতি বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য দক্ষিণ কমিউনিস্ট কর্মকর্তা ও মেম্বর বেরিয়ে যাওয়ার ও পালটা কৃষক সভা গঠন করার ফলে ৩১ মার্চ ১৯৬৮ তারিখে প্রাদেশিক কৃষক কমিটির সভায় তার সভাপতি ও সম্পাদক পরিবর্তন করা হয়। মাদুরাই সম্মেলনে হরেকৃষ্ণ কোঙারকে সারা ভারত সভার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়েছিল বলে তিনি প্রাদেশিক কৃষক কমিটির সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন। তখন প্রাদেশিক কৃষক কমিটি তাঁকে সভাপতি ও আবদুল্লাহ রসুলকে সম্পাদক পদে নির্বাচন করে।

ঊনবিংশ সম্মেলন ঃ সোনারপুর

এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের ঊনবিংশ অধিবেশন হয় ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুরে, ৩১শে মে ও ১লা-২রা জুন ১৯৬৮ তারিখে।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসন কালে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় কৃষক আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে ওঠে। প্রধানত তার আন্দোলনের বিষয় থাকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কৃষকদের জমির দখল বজায় রাখা, বেনামী জমি

উদ্ধার ও বণ্টন করা, সরকারী খাস জমি ও ভেস্টেড জমি দখল করা, বেআইনী ও অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা জমি পুনর্দখল করা ইত্যাদি। এই আন্দোলনের ফলে সারা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় কৃষকরা মোট প্রায় আড়াই লক্ষ একর জমির দখল বজায় রাখতে বা দখল নিতে পেরেছিল। আন্দোলন সব চেয়ে জোরালো ও ব্যাপক হয়েছিল ২৪ পরগনা জেলায় এবং সোনারপুর থানা ছিল তার প্রধান কেন্দ্র।

প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন সোনারপুরে হওয়ার একটা বিশেষ কারণ ছিল এই।

৩১শে মে ১৯৬৮ বিকাল ৪ টায় সম্মেলনের কাজ আরম্ভ করা হয় সোনারপুরের সংলগ্ন রাজপুরে ছায়াবাণী সিনেমা হলে। প্রথমে আনুষ্ঠানিক পতাকা অভিবাদন উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করেন সারা ভারত কৃষক সভার অন্যতম প্রাক্তন সভাপতি কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

প্রতিনিধি সম্মেলনে সমস্ত জেলা থেকে ২,৫৫,০৫৮ জন প্রাথমিক সভ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে ৬৭৬ জন যোগ দেন। তাছাড়া ছিলেন ১০৬ জন দর্শক এবং বিভিন্ন নিমন্ত্রিত সংগঠনের পক্ষে ৮৩ জন মিত্র প্রতিনিধি। এত বেশি সংখ্যায় প্রতিনিধি এর পূর্বে কোন প্রাদেশিক সম্মেলনে দেখা যায়নি। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক কৃষক কমিটির সভাপতি হরেকৃষ্ণ কোঙার।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রভাস রায়। সম্মেলন উপলক্ষে শত শত ছেলেমেয়ে ভলন্টিয়ারের কাজ করেছিলেন।

প্রতিনিধি সম্মেলন চলে ২রা জুন দুপুর পর্যন্ত। বিকালে সোনারপুরের চাঁদমারি মাঠে লক্ষ কৃষকের সমাবেশ হয়। সেই সঙ্গে হাজার হাজার শ্রমিক ও অন্যান্য খেটে খাওয়া মানুষকে দেখা যায়। পূর্বেকার অনেক সম্মেলনের মতো এই সম্মেলনেও চিকিৎসার জন্য পিপলস রিলিফ কমিটির স্কোয়াড উপস্থিত ছিল এবং গণনাট্য সংঘের গান ও নাটক পরিবেশন করা হয়েছিল।

কৃষক-শ্রমিক মিতালি দরকার

প্রতিনিধি সম্মেলনে সম্পাদক যে ছাপান রিপোর্ট পেশ করেন তাতে আন্দোলন ও সংগঠন সম্বন্ধে পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, "এই সংকট কৃষক ও খেতমজুরদের জীবনকে এবং অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণীর জীবনকে যেভাবে বিপর্যস্ত করছে তা থেকে উদ্ধার পাবার কোন পথই

এখনো দেখা যায় না।" (সম্পাদকের রিপোর্ট, পৃ ২) "কৃষকদের জীবনে যে সংকট এসে পড়েছে তা শুধু জমিদার-জোতদার-মহাজন শ্রেণীদের সামন্ত-বাদী শোষণেরই ফল নয়, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে একচেটিয়া পুঁজিবাদী ও ব্যাংক মালিকদের শোষণ।" (ঐ, পৃ ৩) "এই সংকটের প্রতিরোধের জন্য কৃষকরা রুখে দাঁড়াচ্ছে আর তাদের উপর এসে পড়ছে সরকারী দমনের কঠোর আঘাত।...এখন আর কৃষকদের বা শ্রমিকদের অথবা শিক্ষকদের পক্ষে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালানো সফলতার গ্যারান্টি দিতে পারছে না। তাই সম্মিলিত প্রতিরোধের ঝোঁক ও প্রচেষ্টা বেড়ে যাচ্ছে।" (ঐ, পৃ ৭)

আরো বলা হয়ঃ "সংকট থেকে সারা সমাজের পরিত্রাণের একটি প্রধান উপায় হিসাবে মৌলিক ভূমি সংস্কারের দাবি মূলত কৃষকদের দাবি হলেও, বর্তমান সংকটময় সামাজিক অবস্থাব পবিবর্তনের জন্য কৃষককে ও খেত-মজুরকে তাদের সংগ্রামে অন্যান্য সংগ্রামী জনগণের সাথে মিলিতভাবে অগ্রসর হতে হবে।" (ঐ, পৃ ২১) "কৃষকদেব ও খেতমজুরদের আন্দোলনের পিছনে সমর্থন দরকার হবে বিশেষ কবে শ্রমিক শ্রেণীর—সমাজের এই দুই মূল উৎপাদক শ্রেণীর ও প্রধান সংগ্রামী শ্রেণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ মিতালি গড়ে তুলতে হবে।" (পৃ ২২)

খেতমজুবদের ভূমিকা সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়েছেঃ "মোট কথা, খেতমজুররা পৃথকভাবে নিজেদের সংগঠিত করুক অথবা সরাসরি কৃষক সভার মেম্বর হিসাবেই থাকুক, সভার ও তার আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে এই সংগ্রামীও বিপ্লবী স্তরের স্থান থাকবে সুনিশ্চিত। এখন থেকে কৃষক সভার সংগঠন ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সভার কাজ চালাতে হবে। সেজন্য খেতমজুর ও অন্যান্য গরিব কৃষকদের নিয়ে বৈঠক ও ক্লাস করে নিয়মিত আলোচনা চালানো দরকার, তাদের মধ্যে তাদের বিপ্লবী ভূমিকা সম্বন্ধে চেতনা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা প্রয়োজন।" (ঐ, পৃ ২৩)

পরবর্তী সময়ের সভার কাজের বিষয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছেঃ "বর্তমান পরিস্থিতিতে মৌলিক ভূমি সংস্কারের প্রশ্নই আমাদের সামনে সবচেয়ে প্রধান প্রশ্ন হয়ে রয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এবং মৌলিক ভূমি সংস্কারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন আশু ও আংশিক দাবির আন্দোলন হবে সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য প্রস্তুতির কাজ।" (ঐ, পৃ ৩১)

রিপোর্টের শেষ কথা এই: "অবস্থায় সংকট মুক্তির জন্য কৃষক সভাকে ব্যাপক কৃষক জনতার মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শোষক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে, শক্তিশালী সংগ্রামের উপযুক্ত শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে আর আমাদের বিলম্ব করা চলবে না।" (ঐ, পৃ ৩২)

ভিয়েতনাম মুক্তি যুদ্ধ

সম্মেলনে প্রথমে শহীদ সম্বন্ধে প্রস্তাব এবং শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। শহীদ প্রস্তাবে নকসালবাড়ি এলাকায় পুলিসের গুলিতে যে দশ জন কৃষক নিহত হন এবং পরে গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রীসভার আমলে পুলিস যে ১৭ জনকে হত্যা করে তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শোক প্রস্তাবে আন্দোলনের মৃত কর্মীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় জনাব আবুল হায়াতের নাম। তিনি ১৯৩৬ সন থেকেই কৃষক সভার কাজ করতেন, সারা ভারত কৃষক কমিটির মেম্বর ছিলেন, অনেক বছর বর্ধমান জেলা কৃষক কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের হাটগোবিন্দপুর অধিবেশনে (১৯৪৫) সভাপতি পরিষদের মেম্বর ছিলেন। ৮ই মার্চ ১৯৬৮ তারিখে ৭৯ বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এছাড়া আর দুটি প্রস্তাবে আমেরিকার নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিং-কে সাম্রাজ্যবাদী চরেরা হত্যা করায় তার নিন্দা করে এবং বলিভিয়ার (দক্ষিণ আমেরিকা) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের গেরিলা বাহিনীর নেতা ও কিউবা মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নেতা আর্নেস্তো চে গুয়েভারাকে বলিভিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল সরকার বর্বরভাবে হত্যা করায় তার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

ভিয়েৎনাম মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে একটি প্রস্তাবে সেদেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করার জন্য দাবি তোলা হয় এবং ভিয়েতনামের জনগণকে শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জানিয়ে বলা হয় এদেশের কৃষক ও জনসাধারণ তাদের এই সংগ্রামকে নিজেদের সংগ্রাম বলে মনে করে। সম্মেলন সে দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থনে এদেশের কৃষক সমাজ ও জনগণকে এগিয়ে আসতে, গ্রামে

গ্রামে তীব্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে, এবং ভারত সরকারের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানায়।

অন্যান্য গৃহীত প্রস্তাবের বিষয় ছিল : ১। ঘনীভূত সংকট ও কৃষক সভার কর্তব্য ; ২। জমির জন্য : উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ; ৩। খাদ্য ও রিলিফ ; ৪। ঋণ সমস্যা ; ৫। ফসলের দর ; ৬। সেচ ও জলনিকাশ ; ৭। খেতমজুর সমস্যা ; ৮। সরকারী দমন নীতি ; ৯। আগামী মধ্যকালীন নির্বাচন। এছাড়া শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট প্রভৃতির ও ফরাসী দেশের গণ অভ্যুত্থানের সমর্থনে এবং আরো কতকগুলি বিষযে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হযেছিল।

স্বৈরাচারী পুলিসতন্ত্রের আশংকা

সম্মেলনের প্রধান প্রস্তাব ছিল : ঘনীভূত সংকট ও কৃষক সভার কর্তব্য। বিস্তৃত আলোচনার পর এই প্রস্তাব কয়েকটি সংশোধনী সহ সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। সংকটের কিছু বিবরণ দিয়ে প্রস্তাবে বলা হয় : "এই সংকট কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, শাসক শ্রেণীর অনুসৃত শ্রেণী শোষণ নীতির এ হল অনিবার্য পরিণতি।"

"শাসক শ্রেণীগুলির নীতি শুধু যে সংকট সৃষ্টি করেছে ও তাকে তীব্রতর করেছে তাই নয়, সংকটের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক অধিকারকেও ধ্বংস করে স্বৈরাচারী পুলিসতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপদ সৃষ্টি করেছে।"

"সংকটের চূড়ান্ত সমাধানের জন্য যা প্রয়োজন তা হল ভূমি ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন, অর্থাৎ প্রকৃত ভূমি সংস্কার, সামন্তবাদী শোষণের সম্পূর্ণ অবসান এবং সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির শোষণ হতে দেশের মুক্তি। সমাজ ব্যবস্থার এই মৌলিক রূপান্তরের মূল কথাই হল কৃষি বিপ্লব। সর্বগ্রাসী সংকট অনিবার্যভাবেই এই কর্তব্য সাধনের লক্ষ্যকে সামনে হাজির করেছে। সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ পুঁজির এবং জোতদারী-মহাজনী-মজুতদারী শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী শাসনের অবসান ঘটাতে না পারলে দেশকে বিপদ হতে বাঁচানো যাবে না এবং শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতম বিকাশ ছাড়া তা কার্যকরী করা সম্ভব হবে না। পরিস্থিতি আজ এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে হয় জনসাধারণ ব্যাপক সংগঠিত শক্তি নিয়ে সংকটের মোকাবিলা করবে, আশু দাবির সংগ্রাম পরিচালনা করবে, অথবা ক্রমবর্ধমান সংকট ও স্বৈরতন্ত্র তাদের

গ্রাস করবে। এই পরিস্থিতিতে সম্মেলন সমগ্র অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হবার এবং মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে আজকের আন্দোলন গড়ে তোলবার জন্য সমস্ত কৃষক সমাজ ও কৃষক কর্মীদের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।"

এই সম্পর্কে কৃষক সভার কাজ কী হবে তা ব্যাখ্যা করে প্রস্তাবে বলা হয়েছে: তীব্রতর সংকট ও শ্রেণী সংগ্রামের পটভূমিকায় দমননীতির মুখে এই সব দায়িত্ব পালন করতে হলে সর্বস্তরের কৃষকদের সংগঠনকে এবং কৃষক ও খেতমজুরদের সাংগঠনিক চেতনাকে বাড়াতে হবে।"

প্রস্তাবের শেষে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কৃষকের ভূমিকার উল্লেখ করে বলা হয়েছে: "আজকের গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য সম্মেলন কৃষক সমাজের সমস্ত অংশকে, বিশেষত গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের এবং কৃষক কর্মীদের আহ্বান জানাচ্ছে।"

পতাকা পরিবর্তনের সুপারিশ

মধ্যকালীন নির্বাচন সম্পর্কে "সম্মেলন মনে করে বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিম বাংলার আগামী মধ্যকালীন নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করবার ও যুক্তফ্রন্টকে জয়ী করবার জন্য কৃষক সভার চেষ্টা করা উচিত; এবং সেজন্য তাকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এই নির্বাচনী লড়াইয়ে কৃষকদের দাবিদাওয়ার আন্দোলনের ভিত্তিতে ব্যাপক কৃষক জনতাকে সংগঠিতভাবে নামানো প্রয়োজন, যুক্তফ্রন্টের পক্ষে কেন তাদের দাঁড়ান উচিত তা বোঝানো দরকার। এখনি কৃষকদের একথাও বোঝাতে হবে যে আগামী মধ্যকালীন নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলেও কৃষকদের দাবি ও সাধারণভাবে জনগণের গণতান্ত্রিক দাবি আদায়ের পথে অনেক বাধা থাকবে। ভারতীয় সংবিধান কৃষক স্বার্থের চেয়ে শোষক শ্রেণীদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে বেশি অনুকূল এবং সংবিধানের প্রয়োগও হয় প্রধানত শোষক স্বার্থের দিকে নজর রেখে।...তাই যুক্তফ্রন্টের নীতি যতই উৎকৃষ্ট হ'ক, এই নীতিকে কাজে পরিণত করার পথে তাকে পদে পদে বাধা দেওয়া হবে।"

দমননীতি বিরোধী প্রস্তাবের শেষে বলা হয়েছে: "সম্মেলন কৃষক ও গণতান্ত্রিক মানুষকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে বর্তমানে জনগণের বাঁচার আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন এক সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তাই দমননীতির মুখে আন্দোলনকে রক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য সম্মেলন সমস্ত কৃষক ও কৃষক কর্মীদের আহ্বান জানাইতেছে।"

কৃষক সভার পতাকা পরিবর্তন সম্বন্ধে সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটির বয়ান ছিল এই :

"সারা ভারত কৃষক সভার রক্ত পতাকা প্রথমে ছিল কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত লাল পতাকা। পরে ১৯৫৬ সনের নবেম্বর মাসে সভার বনগাঁ অধিবেশনে, কংগ্রেসী কৃষকরা এই পতাকায় হাতুড়ি চিহ্ন থাকায় সভায় যোগদান করতে আপত্তি করে এই যুক্তিতে, হাতুড়ি চিহ্ন তুলে দেবার সিদ্ধান্ত হয়। তখন থেকে পতাকায় শুধু কাস্তে চিহ্নই থেকেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে বাস্তবে কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্ন কাস্তে চিহ্নের মতোই কারো পক্ষে কৃষক সভায় যোগদানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সুতরাং বনগাঁয়ের যুক্তি ঠিক নয়।

"পক্ষান্তরে বর্তমান অর্থনীতিক ও সামাজিক সংকটের কালে সংকট থেকে মুক্তিলাভের জন্য কৃষক সমাজের একক সংগ্রাম যখন সফল হতে পারে না, যখন অন্যান্য মেহনতকারী শ্রেণীর ও বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে মিলিত সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন কৃষক সভার পতাকায় কাস্তে ও হাতুড়ির মিলিত চিহ্ন থাকার গুরুত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

"তাই এই সম্মেলন সারা ভারত কৃষক সভার কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করছে যেন আগামী সারা ভারত সম্মেলনে কৃষক সভার বর্তমান পতাকার পরিবর্তে তার প্রথম যুগের কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত পতাকা আবার গৃহীত হয়।"

গরিব কৃষকদের সংখ্যা ও অনুপাত বৃদ্ধি

সোনারপুর সম্মেলনে ৫১ জন মেম্বর নিয়ে নতুন প্রাদেশিক কৃষক কমিটি নির্বাচিত হয়, তার মধ্যে কর্মকর্তা ন'জন। এই ৫১ জনের মধ্যে ন'জন কর্মকর্তা সমেত এই ১৫ জনকে নিয়ে প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল নির্বাচিত হয় : সভাপতি—হরেকৃষ্ণ কোঙার ; সহ-সভাপতি—সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী ; প্রভাস রায় ও শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ; সম্পাদক—মুহম্মদ আব্দুল্লাহ্ রসুল ; সহ-সম্পাদক—শান্তিময় ঘোষ, পরিতোষ চ্যাটার্জি ও জয়কেশ মুখার্জি ; কোষাধ্যক্ষ—বগলা গুহ ; মেম্বর—সরোজ মুখার্জি, বিনয় কোঙার, মদন দাস, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, সুবোধ চৌধুরী ও বিনোদ দাস।

এই সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাই যে পূর্বেকার যে কোন সম্মেলনের তুলনায় বেশি ছিল তাই নয়, প্রতিনিধিদের শ্রেণী পরিচয়ও

পূর্বের তুলনায় বেশ ভিন্ন ধরনের ছিল। পূর্বে যেখানে বড় ও মাঝারি কৃষকদের থেকে বেশি প্রতিনিধি আসত, এবার সেখানে এসেছিল বেশি গরিবদের মধ্যে থেকে। হিসাব নিয়ে দেখা গিয়েছিল প্রতিনিধিদের শ্রেণী পরিচয় ছিল এই: মোট ৬৭৬ প্রতিনিধির মধ্যে খেতমজুর ৭১, ভাগচাষী বা বর্গাদার ও অন্যান্য গরিব চাষী ২২৮, অকৃষি গ্রাম্য মজুর ২০ (এই তিনে মিলে ৩১৯ বা মোট সংখ্যার শতকরা ৪৭); মাঝারি চাষী ১১৫, ধনী চাষী ৩১, মধ্যবিত্ত (কৃষক কর্মী প্রভৃতি) ২০৪, অন্যান্য ৭। এর মধ্যে ১০৩ জন সারাক্ষণের কর্মী। সমস্ত মজুর ও কৃষক প্রতিনিধিদের মিলিত সংখ্যা ৪৬৫ বা শতকরা প্রায় ৬৯। মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন মাত্র তিন জন।

প্রতিনিধিদের আলোচনার মধ্যে এবার কৃষক সভার লক্ষ্য, আন্দোলন ও সংগঠন সম্বন্ধে একটা নতুন চিন্তা ও চেতনাব আভাষ দেখা যায় এবং নতুন উৎসাহ প্রকাশ পায়।

আঠার

বিংশ সম্মেলন ঃ কাঁথি

বিংশ সম্মেলনের অধিবেশন বসেছিল মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি শহরে গত ৬ই থেকে ৮ই জুন, ১৯৬৯ (২৩শে থেকে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬). তারিখে, সোনারপুর সম্মেলনের এক বছর পরে। এই এক বছরে প্রাদেশিক কৃষক সভার অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সমগ্র দেশের সাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে অর্থনীতিক সংকট আরো বেশি তীব্র হয়েছে এবং এই সংকট ক্রমেই রাজনীতিক পর্যায়ে যাচ্ছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের শ্রেণী সংগ্রাম আরো তীব্র হয়েছে, তাদের শ্রেণী চেতনা গভীরতর হয়েছে, এবং সে চেতনা ক্রমেই অর্থনীতিক পর্যায় থেকে রাজনীতিক পর্যায়ে উঠছে। জমির সংগ্রাম সোনারপুরের সময় যতখানি অগ্রসর হয়েছিল তার থেকে পেছিয়ে যায়নি, বরং আরো ব্যাপক ও তীব্র হয়েছে। ক্রমেই ব্যাপকতর হচ্ছে এবং এই সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণীর ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শ্রেণীর সংগ্রামের সাথে মিলে সাধারণ গণতান্ত্রিক অভিযানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হচ্ছে।

জমির লড়াইয়ের প্রধান সংগ্রামী শরিক জমিহীন ও প্রায়-জমিহীন খেতমজুর ও গরিব কৃষকরা। তাদের মধ্যে জমি পাবার আকাঙ্ক্ষার সাথে সাথে এই মনোভাবও ক্রমেই প্রসার লাভ করছে যে এই সংগ্রাম মারফত শুধু কিছু জমি পাওয়াই তাদের লক্ষ্য নয়, এ সংগ্রাম তাদের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা বৃদ্ধি করে এবং সামগ্রিক ভূমিব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থাকে স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করে প্রকৃত জনগণের গণতান্ত্রিক সমাজের দিকে এগিয়ে নেবার সংগ্রাম। এই শ্রেণী সংগ্রাম ও রাজনীতিক চেতনা ব্যাপকতা লাভ করায় কৃষক সভার মধ্যে তারাই এখন প্রধান শক্তি হিসাবে কায়েম হয়ে পড়ছে। কৃষক সভার সংগঠনকেও তারা আরো ব্যাপক ও শক্তিশালী বিপ্লবী সংগঠনে পরিণত করছে। একই কারণে অবস্থার তাগিদে কোন কোন জেলায়

ও অনেক এলাকায় কৃষক সভার উদ্যোগেই পৃথক খেতমজুর সমিতিও গড়ে উঠেছে ও উঠছে।

অর্থনীতিক সংকটের বোঝা অন্যান্য মেহনতকারী মানুষের সঙ্গে কৃষক ও খেতমজুরদের উপর যত বেশি পরিমাণে এসে পড়ছে, তাদের জীবন ও জীবিকার উপর যত বেশি কঠোর আঘাত হানছে, ততই তারা তাকে প্রতিরোধ করবার জন্য সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসছে, আর তাই দেখে আতংকিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিও ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের আন্দোলন ও সংগঠনকে ভাঙবার জন্য জাল বিস্তার করতে চেষ্টা করছে। তাই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত সংগ্রামী গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে মিলে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক ও খেতমজুররা নিজেদের সংগ্রাম ও সংগঠনকে আরো জোরদার করে তুলছে।

মধ্যকালীন নির্বাচনের তাৎপর্য

এই পরিপ্রেক্ষিতে এসেছিল মধ্যকালীন নির্বাচন। প্রথমে নির্বাচনের জন্য দিন ধার্য হয়েছিল ১৭ই নবেম্বর (১৯৬৮)। কিন্তু কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পরাজয়ের আশঙ্কা থাকায় তাদের চাপের দরুন সেই তারিখ পিছিয়ে দিয়ে স্থির করা হয় ৯ই ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) তারিখে নির্বাচন হবে। কিন্তু নির্বাচনে কংগ্রেসের ও অন্যান্য যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী পার্টিগুলির বিপর্যয় ঘটে যায়। কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৭ সনে যে স্বেচ্ছাচারিতা করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করেছিল, তার সমুচিত প্রতিশোধ গ্রহণ করে পশ্চিমবাংলার জাগ্রত জনগণ। এ বিষয়ে গরিব কৃষক ও খেতমজুররা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি শ্রেণী-সচেতন হয়ে কংগ্রেসকে বর্জন করে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন জানিয়েছিল। পূর্বে এতখানি পারত না।

এই বছরের আরো একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে কৃষক সভা কৃষক ভলন্টিয়ার বা কৃষক বাহিনী গঠনের কাজেও হাত দিয়েছে। স্থায়ী ও নিয়মিত ভলন্টিয়ার বাহিনী গঠনের কাজও কোন কোন জেলায় শুরু করা হয়েছে। শুধু সম্মেলনের সময় বা এমনি কোন বিশেষ উপলক্ষে ভলন্টিয়ার সংগ্রহ ও সংগঠনের কাজ বরাবরই করা হয়েছিল কিন্তু স্থায়ী বাহিনী গঠনের প্রচেষ্টা অনেক বছর পরে আবার এখন শুরু হয়েছে। গলায় কাস্তে হাতুড়ি চিহ্নিত লাল রুমালের ব্যাজ এই বাহিনীর একটা বৈশিষ্ট্য।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিধানসভার মোট ২৮০টি নির্বাচিত মেম্বরের মধ্যে

পেয়েছে ২১৮টি, আর কংগ্রেস ৫৫টি। সেই কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে লোকচক্ষে হেয় ও দুর্বল প্রতিপন্ন করবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্র টিটাগড়ে ও তেলেনীপাড়ায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শ্রেণীর সঙ্গে কৃষকরা রুখে দাঁড়িয়েছিল।

অভূতপূর্ব প্রতিনিধি সমাবেশ

সম্মেলনের অধিবেশন হয় কাঁথি শহরের বীরেন্দ্র শাসমল হলে। তাতে সমস্ত জেলা থেকে প্রতিনিধি যোগ দেন মোট ১৫৩৫ জন। তাছাড়া কয়েকটি জেলা থেকে দর্শক উপস্থিত থাকেন ১৯ জন। কিছু মিত্র প্রতিনিধিও ছিলেন। প্রভাত কুমার কলেজের বাড়িগুলিতে প্রতিনিধিদের জন্য রান্না-খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এত বেশি সংখ্যায় প্রতিনিধি পূর্বেকার কোন সম্মেলনে উপস্থিত থাকেননি।

৬ই জুন বিকালে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা অভিবাদন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করার পর প্রাদেশিক কৃষক কমিটির সভাপতি কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারের সভাপতিত্বে প্রতিনিধি সম্মেলন আরম্ভ হয়। সম্মেলনের কাজ পরিচালনার জন্য একটা পরিচালক (স্টিয়ারিং) কমিটি এবং প্রতি-নিধিদের শ্রেণীগত ও অন্যান্য পরিচয়ের হিসাব নেবার জন্য পরিচিতি (ক্রিডেনশ্যালস) কমিটি গঠন করা হয়। প্রস্তুতি কমিটির পক্ষে প্রথমে সকলকে অভ্যর্থনা করেন কমরেড সুকুমার সেনগুপ্ত। সভাপতি প্রথমে শহীদ ও শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও তা গৃহীত হয়।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল সম্পাদকের রিপোর্ট এবং কতকগুলি খসড়া প্রস্তাব। সবই ছাপিয়ে প্রতিনিধিদের কাঁথি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া হয়েছিল। এবার প্রস্তাবের সংখ্যা ছিল পূর্বের চেয়ে অনেক কম। স্থানীয় সমস্যা বা ছোটখাটো বিষয়ে কোন প্রস্তাব পেশ করা হয়নি এবং সমস্ত প্রস্তাবই প্রাদেশিক কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিনিধিদের তরফ থেকে যে কয়েকটি প্রস্তাব আলোচনার জন্য দেওয়া হয়েছিল সে সবই নব-নির্বাচিত কমিটির আলোচনার জন্য রাখা হয়েছিল।

প্রস্তাবগুলির বিষয় ছিল এই: শহীদ ও শোক প্রস্তাব ছাড়া ভিয়েত-নামের মুক্তিযুদ্ধ, নূতন পরিস্থিতিতে কৃষক সভার কর্তব্য, ভূমিসংস্কার ও জমির সংগ্রাম, খাদ্য সমস্যা, সেচ ঋণ ও ফসলের দর, খেতমজুর সমস্যা, যুক্তফ্রন্ট সরকার ও কৃষক সভার দায়িত্ব, চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রস্তাব, এবং

গণতান্ত্রিক আন্দোলন। কোষাধ্যক্ষ বগলা গুহ প্রাদেশিক কৃষক কমিটির ১৯৬৮ সনের আয়ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব দাখিল করেন এবং তা গৃহীত হয়। শেষে পরবর্তী সময়ের জন্য নতুন প্রাদেশিক কৃষক কমিটি ও কাউন্সিল এবং তার কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়।

গণতান্ত্রিক অভিযানের অংশ

আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে প্রথমে সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। ছাপা রিপোর্ট পড়ে দেবার পর তা আলোচনা করা হয়। অন্ততঃ কুড়ি জন প্রতিনিধি আলোচনা করবার পর কিছু সংশোধন করে রিপোর্টের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য গ্রহণের ও রিপোর্টকে নথিভুক্ত করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। সম্পাদকের রিপোর্টের প্রধান বক্তব্য ছিল এই: সোনারপুর সম্মেলনের পরবর্তী এক বছরে কৃষকদের জমি উদ্ধার ও বণ্টনের এবং ফসল রক্ষার ও অন্যান্য দাবির আন্দোলন কৃষক সভার নেতৃত্বে ব্যাপকতর ও তীব্রতর হয়েছে। অর্থনীতিক ও রাজনীতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক শ্রেণীর ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে মিলে কৃষকদের সংগ্রাম দেশের সামগ্রিক গণতান্ত্রিক অভিযানের একটা বিশিষ্ট অংশে পরিণত হয়েছে। এই সংগ্রামের দুর্বার গতিকে স্তব্ধ করা যাবে না।

মধ্যকালীন নির্বাচনের পূর্বে রাষ্ট্রপতির প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকালে কৃষকদের এই আন্দোলনকে দমন করবার জন্য বড় বড় জোতদারদের সঙ্গে পুলিসের যে চক্রান্ত চলেছিল, যে অমানুষিক অত্যাচার, গুণ্ডাবাজি ও বর্বরতা চালানো হয়েছিল তাকে ব্যর্থ করেই আন্দোলন দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল, এবং তা সামন্তবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলির এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের আতংকের কারণ হয়ে পড়েছিল।

ভলণ্টিয়ার সংগঠনের গুরুত্ব

১৯৬৮ সনে কৃষকদের আমন ফসল জোর করে কেটে নেবার জন্য যখন জোতদার ও পুলিসের হামলা শুরু হয় তখন প্রাদেশিক কৃষক কমিটির উদ্যোগে চারটি কৃষক সংগঠনের—প্রাদেশিক কৃষক সভা, দক্ষিণপন্থী কৃষক সভা, সংযুক্ত কৃষক সভা এবং কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের—তরফ থেকে কৃষকদের ফসল রক্ষা আন্দোলনের সমর্থনে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ তারিখে কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক গণতান্ত্রিক কননেশন আহ্বান

করা হয়। তাতে সমস্ত জেলা থেকে বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি ছাড়া প্রাদেশিক স্তরের ট্রেড ইউনিয়ন, কর্মচারী সংঘ, রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি, ১২ই জুলাই কমিটি। ছাত্র, যুবক, মহিলা, শিক্ষক, বাস্তুহারা প্রভৃতি সংগঠনের এবং বহু শ্রমিক ইউনিয়নের ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের মোট ১২৬৪ জন প্রতিনিধি যোগদান ও কৃষকদের দাবির সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তার ফলে একদিকে হামলাবাজ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলি পিছু হঠে এবং অন্যদিকে সংগ্রামী কৃষকদের আন্দোলনে মদদ যোগানো হয়।

রিপোর্টে দেখানো হয় যে কৃষক সভার আন্দোলন ও সংগঠনের মধ্যে ক্রমেই খেতমজুর ও গরিব কৃষকদের প্রাধান্য বেড়ে যাচ্ছে এবং তাদের রাজনীতিক চেতনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষক সভার গতি জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সভার আন্দোলন ও সংগঠনের যেসব দুর্বলতা আছে তাকে কাটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সভার নেতৃত্বকে আরো জোরদার ও শ্রেণী-সচেতন করে তোলা, ব্যাপক ভিত্তিতে ভলন্টিয়ার সংগঠন বা কৃষক বাহিনী গড়ে তোলা, সর্বত্র রাজনীতিক তালিম দিয়ে অভিজ্ঞ কর্মী বা কাডার তৈরির কাজের উপর জোর দেওয়া।

সভা কৃষক, খেতমজুর ও অন্যান্য জনগণের স্বার্থে প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার এবং পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবার ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তাকে শক্তিশালী করবার উপর জোব দেয়, রিপোর্টে একথাও ঘোষণা করা হয়। আরো বলা হয় যে কৃষক আন্দোলন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য যেমন ব্যাপক ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা দরকার, তেমনি দরকার এই আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে পাবার উদ্দেশ্যে কৃষক সভার পক্ষে এই সরকারের হাতকে আরো মজবুত করে তোলা। সভা সেকাজ সাধ্যমতো করছে।

জমি উদ্ধার ও বণ্টন

কাঁথি সম্মেলনের পূর্বের বছরে কৃষক সভার নেতৃত্বে যেসব আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে তার মধ্যে প্রধান বিষয়গুলি এই: উচ্ছেদ বন্ধ করা, সরকারী খাস জমি বণ্টন করা, বড বড জোতদারদের বেনামী জমি উদ্ধার ও বণ্টন করা, ভাগচাষী ও রাইয়তচাষী উচ্ছেদ করে যেসব জমি মেছোঘেরির অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয়েছিল সেই সব জমি উদ্ধার ও বণ্টন করা, বাস্তুহীনদের জন্য

বাস্তুজমি আদায়ের চেষ্টা করা। এসব বিষয়ে ১৯৬৭ সনের যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে যে চেষ্টা শুরু করা হয়েছিল, ১৯৬৯ সনেও তা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং পূর্বের চেয়ে জোরদার হয়েছে।

সম্মেলনের সময় পর্যন্ত যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভূমিহীন ও প্রায়-ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে প্রায় সাড়ে সাত লাখ বিঘা খাস জমি বণ্টন করেছিল। ১৯৬৯ সনে কৃষকদের নিজ উদ্যোগেই প্রায় দেড় লাখ বিঘা বিলি করা হয়েছে। এই সময়ে (মার্চ-এপ্রিল-মে ১৯৬৯) ২৪ পরগনা জেলায় মেছোঘেরির জমি উদ্ধার করে কৃষক সভা মারফত বণ্টন করা হয়েছিল প্রায় ৫৬ হাজার বিঘা।

সম্পাদকের রিপোর্ট থেকে এইসব বিষয়ে কয়েকটা উদ্ধৃতি দেওয়া হল : "যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বিভিন্ন নীতির সুযোগ গ্রহণ কৃষক সভা অবশ্যই করবে এবং তা করা হচ্ছেও। কিন্তু এই সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় নিতে হলে শুধু যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মর্জির ও কাজের উপর নির্ভর করে, বসে থাকলে চলবে না। যুক্তফ্রণ্ট গণ-আন্দোলনের দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে কতকগুলি ভালো নীতি গ্রহণ করেছে বলে আপনা থেকেই সেসব নীতি কাজে পরিণত হয়ে যাবে না, তাকে কাজে পরিণত করতে হলে সর্বত্র সংগঠিত শক্তি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।"

জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে

"কৃষক আন্দোলনকে প্রকৃত ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণত করবার জন্য কৃষক সংগঠনকে যথার্থ বিপ্লবী চরিত্রের সংগঠনে পরিণত করবার জন্য, সেই আন্দোলন ও সংগঠনকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অগ্রসর করে নিয়ে যাবার জন্য কৃষক সভার ও তার কর্মীদের ষোল আনা সুযোগ গ্রহণ করাই হবে এখন প্রধান কাজ। এই কাজেই আমরা যুক্তফ্রণ্ট থেকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেতে পারি এবং যুক্তফ্রণ্ট সম্বন্ধে সে বিষয়েই আমাদের সবচেয়ে বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য চাই কর্মীদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি, সংগ্রামী মনোভাব ও উদ্যোগ।"

"গত এক বছরের মধ্যে দেশের জনগণের এবং বিশেষ করে কৃষক ও খেতমজুরদের জীবনে সংকটের তীব্রতা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, জমি ও ফসলের লড়াই যে পর্যায়ে উঠেছে, কৃষকদের সংগ্রামী চেতনার সাথে সাথে কৃষক সভার প্রসার ও সাংগঠনিক শক্তি যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বিবেচনা

করলে আমরা নিশ্চয়ই ভরসা করে বলতে পারি যে আগামী দিনে কৃষকদের চেতনা, আন্দোলন ও সংগঠনের অগ্রগতি অনেক বেশি বাড়িয়ে তোলা যাবে, কৃষক সভার কথা পশ্চিম বাংলায় গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে।

"দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগ্রামী কৃষক ও জনগণের অগ্রগতি দেখে আতংকিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি মরিয়া হয়ে নিজেদের চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে, প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীগুলি সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী ও একচেটিয়াপতিদের স্বার্থে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির উপর আঘাত হানতে চেষ্টা করছে, তার প্রতিরোধ করবার জন্য বিপ্লবী চেতনা নিয়ে কৃষক ও খেতমজুরদের আরো সংগঠিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য সংগ্রামী জনগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভূমি বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্লবের পথ এবং জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ধরে তাদের এগিয়ে যেতে হবে। তীব্র সংকটের মধ্যে এবং এই রাজ্যে যুক্তফ্রণ্ট সরকার থাকায় দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি আজ এই বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল। এই সুযোগকে আমাদের ষোলআনা কাজে লাগাতে হবে।"

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারের পথরোধ

প্রস্তাবগুলির মধ্যে দুটি প্রস্তাব বেশি সময় দিয়ে আলোচনা করা হয়: বর্তমান পরিস্থিতিতে কৃষক সভার কর্তব্য এবং ভূমি-সংস্কার ও জমির সংগ্রাম।

প্রথমটিতে সারা দেশের জনগণের জীবনে যে অর্থনীতিক ও রাজনীতিক সংকট তীব্রতর হয়ে উঠছে তার প্রতিরোধের প্রয়োজনের উপর জোর দিয়ে বলা হয় যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভার অস্তিত্ব যেমন গণ-আন্দোলনকে সাহায্য করবে, তেমনি এই সরকারকে তার দায়িত্ব পালন করবার জন্য তার পক্ষেও গণ-উদ্যোগ ও গণ-সংগ্রামের সক্রিয় সাহায্য প্রয়োজন হবে। কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ও অন্যায় হস্তক্ষেপ এবং আমলাতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থার শ্রেণী-চরিত্র যুক্তফ্রণ্ট সরকারের কাজে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করছে ও করবে। কেন্দ্রের হাতে রাজনীতিক ও আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকায় এবং প্রতিক্রিয়াশীল শোষক শ্রেণীদের দ্বারা সেই কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়ায় দেশের গণতান্ত্রিক বিকাশ এবং সংহতি পর্যন্ত বাধা পাচ্ছে। তাই রাজ্য সরকারগুলির জন্য অধিকতর আর্থিক ও রাজনীতিক ক্ষমতা একান্ত প্রয়োজন। সেই ক্ষমতা আদায়ের জন্য এবং স্বৈরাচারী শাসন কায়েম

করার দিকে কেন্দ্রের গতিরোধ করার জন্য গণতান্ত্রিক সংগ্রামের দ্বারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে শক্তিশালী করা কৃষক আন্দোলনের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন।

এই প্রস্তাবে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে: বর্তমান অবস্থার উপযোগী কৃষক আন্দোলনকে বিকশিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কৃষক কর্মীদের এবং গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের দ্রুত শিক্ষিত করতে হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব রক্ষা করা, কেন্দ্রের স্বৈরাচারী ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা ও রাজ্যগুলিকে অধিকতর ক্ষমতা দেবার জন্য সংগ্রাম করার বৈপ্লবিক তাৎপর্য সম্বন্ধে কৃষকদের সচেতন করতে হবে এবং কেন্দ্রের ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিব সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে শামিল হতে হবে। জমি, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে নতুন ও পুরোন আইনগুলিকে কাজে লাগিয়ে কৃষক আন্দোলনকে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে ও গভীরতর করতে হবে।

জমির আন্দোলনই কেন্দ্রীয় আন্দোলন

কৃষক আন্দোলনকে প্রধানত পরিচালনা করতে হবে বৃহৎ জোতদার-মজুতদার-মহাজন চক্রের বিরুদ্ধে, সতর্ক থাকতে হবে সমস্ত প্ররোচনা ও বিভেদ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির প্রভাবাধীন কৃষকদের মধ্যে বিরোধ সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হবে, বিভেদ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কৃষকদের সচেতন করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি বাড়াতে হবে, জমির আন্দোলনকে কেন্দ্রীয় আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করে অন্যান্য দাবির আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের প্রধান ভিত্তি হিসাবে গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের রাজনীতিক চেতনা ও সংগঠনকে আরো মজবুত করার উপর জোর দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যে অন্যান্য কৃষকদের দাবিদাওয়াকে এবং কৃষক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে দেখা বা উপেক্ষা করা না হয়। রাজনীতিক শিক্ষা দিয়ে সচেতনভাবে নতুন কর্মী তোয়ের করা—বিশেষত গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের মধ্যে থেকে, ধারাবাহিকভাবে কৃষক সভার সভ্য সংগ্রহ করা, বিভিন্ন স্তরের কমিটিগুলিকে সক্রিয় করা ও তাদের কাজে উপর থেকে সাহায্য করা, কর্মী মিটিং ও শিক্ষা ব্যবস্থা মারফত কর্মীদের নেতৃত্ব দেবার উপযোগী করে গড়ে তোলা—এ সব কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রকৃত ও মৌলিক ভূমি সংস্কার

ভূমি সংস্কার প্রস্তাবে কৃষকের স্বার্থে প্রকৃত ও মৌলিক ভূমি সংস্কার করে এবং জমির একচেটিয়া মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সেই জমি কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিলি করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে মৌলিক ভূমি সংস্কারকে বিদেশী ও দেশী একচেটিয়া পুঁজির শোষণের অবসান ঘটানোর কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। দ্রুত শিল্প বিকাশের সঙ্গে মৌলিক ভূমি সংস্কারের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। দ্রুত শিল্পবিকাশ ছাড়া জমির উপর চাপ কমানো যাবে না ; অকৃষক মধ্যবিত্ত ও ছোট মালিকদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা ছাডা প্রকৃত কৃষকদের হাতে জমি দেবার নীতি পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারে না। "এক কথায় দেশের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর ছাড়া অর্থাৎ জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাডা মৌলিক ভূমি সংস্কার ও কৃষকের পূর্ণ মুক্তি হতে পারে না।"

বেনামী জমি উদ্ধার ও কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের আন্দোলন সম্বন্ধে প্রস্তাবে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে যে কোন কোন রাজনীতিক পার্টি এ বিষয়ে যুক্ত আন্দোলনের বদলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং তা নিয়ে কোথাও কোথাও অবাঞ্ছিত সংঘাতেরও সৃষ্টি হয়েছে। কৃষক সভা এই বিভেদ পন্থা থেকে বিরত হবাব জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেছে এবং সভার কর্মীদের কোন বিভেদের প্ররোচনার ফাঁদে পা না দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

●

প্রস্তাবে বর্তমান ভূমিসংক্রান্ত আইনের সংশোধনের জন্য দাবি করা হয়েছে : (১) জোতের সর্বোচ্চ সীমাকে পরিবার ভিত্তিতে ধার্য করা ; (২) বাগানবাড়ি, দেবোত্তর প্রভৃতির ব্যাতিক্রম বাতিল করা ; (৩) বেনামী ধরার বিধানকে শক্তিশালী করা ; (৪) চা বাগানের জমি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করা ; (৫) ভূমিসংস্কার বিষয়কে দেওয়ানী আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত করা ; (৬) বর্গাদাবদের পুরুষানুক্রমে চাষের অধিকার দেওয়া এবং অকৃষক ছোট মালিকদের সংসারের প্রয়োজনে নিজ চাষের জন্য জমি ফেরত নেবার অধিকার সাপেক্ষে বর্গাদারদের উচ্ছেদ বন্ধ করা ; (৭) যাদের পরিবারে মোট তিন একর বা তার কম জমি আছে তাদের খাজনা থেকে খাজনা রেহাই দেওয়া এবং ১০ একরের বেশি জোতের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান

হারে ধার্য করা ; এবং (৮) প্রত্যেক পরিবারের জন্য মোট জোতের হিসাব সহ রেকর্ড বই করা।

নকসালপন্থী প্রভাবে ভাটা

সোনারপুর সম্মেলনের পর কৃষক সভার যে মেম্বর সংগ্রহ করা হয় তার সংখ্যা ছিল ৪,০৬,২৯৫। পনরটি জেলাতেই মেম্বর সংগ্রহ করা হয়েছিল। জেলা হিসাবে সবচেয়ে বেশি মেম্বর হয় ২৪ পরগনায়—৯০,৪০৮, আর সব চেয়ে কম দার্জিলিং-এ—৩০৪৮।

তবে দার্জিলিং জেলার পাহাড় অঞ্চলে এখন কৃষক সভার সংগঠন নাই এবং শিলিগুড়ি মহকুমার নকসালবাড়ি এলাকার কৃষকদের আবার হঠকারী-দের প্রভাব থেকে কৃষক সভায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার নকসালপন্থীদের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা তুলে নিলে জেল থেকে মুক্ত হয়ে আসবার পর তাদের অন্যতম নেতা কামাখ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো অনেকে কৃষক সভার কাজে যোগ দেন এবং তিনি নিজে প্রতিনিধি হিসাবে কাঁথি সম্মেলনে হাজির হয়ে হঠকারীদের ভ্রান্ত নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে অনেক কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন।

এই সমস্ত প্রাথমিক সভ্যদের প্রতিনিধি হিসাবে যে ১৫৩৫ জন সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মোটামুটি শতকরা ৩৬ জন ছিলেন খেত-মজুর ও গরিব কৃষক এবং ২২ জন মাঝারি কৃষক। মধ্যবিত্ত কৃষক কর্মীদের সংখ্যাও ছিল শতকরা ৩৬। ধনী কৃষক ও অন্যান্য মিলে ছিল শতকরা ছ জন। প্রতিনিধিদের মধ্যে মহিলা ছিলেন ১২ জন।

প্রতিনিধি সম্মেলনে গঠনতন্ত্রের একটা নিয়ম সংশোধন করা হয়। নিয়ম ছিল প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে প্রতি ২০০ প্রাথমিক মেম্বরে একজন। তাতে সংগৃহীত মেম্বর সংখ্যা খুব বেশি হলে সম্মেলনের পক্ষে প্রতিনিধি সংখ্যা অত্যধিক হয়ে পড়তে পারে। সেই কারণে প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলকে সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের পূর্বে অনুপাতটা ধার্য করে প্রচার করবার জন্য অধিকার দিয়ে এই সংশোধনী গ্রহণ করা হয়।

যে নতুন প্রাদেশিক কৃষক কমিটি ও কাউন্সিল নির্বাচন করা হয় তাতে মেম্বর নেওয়া হয় যথাক্রমে ৫১-র স্থলে ৫৭ এবং ১৫-র স্থলে ১৭। একজন সহকারী সম্পাদক পরিবর্তন করা ছাড়া বাকি সব কর্মকর্তা যাঁরা ছিলেন

তাঁরাই নির্বাচিত হন।

প্রস্তাবগুলি সবই প্রায় সর্বসম্মতিতে পাস হয়। ছোটখাটো সংশোধনী নিয়ে দুই এক ক্ষেত্রে মাত্র ভোটের প্রয়োজন হয়। সংশোধনী আসেও কম।

ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার ইংগিত

সোনারপুর সম্মেলনে কৃষক সভার পতাকা পরিবর্তনের জন্য যে সুপারিশ করা হয়েছিল তা সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে এখনো গৃহীত না হলেও (সম্মেলনের অধিবেশনই তারপর হয়নি) কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত লাল পতাকাই এই সম্মেলনে ব্যবহার করা হয়েছিল। এ নিয়ে কোন প্রশ্নও কোন প্রতিনিধি তোলেননি। তার মানে পরিবর্তনটা সকলে মেনেই নিয়েছে।

৮ই জুন বিকালে যে কৃষক সমাবেশ হয়েছিল তাতে বিস্তর মিছিল এসে যোগদান করেছিল। কাঁথি এলাকা অল্পকাল পূর্বেও কৃষক সভার খুব ভালো সংগঠিত এলাকা ছিল না। তাহলেও জমায়েত বেশ বড়ই হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেন হরেকৃষ্ণ কোঙার।

এই সমাবেশে যাঁরা বক্তৃতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কৃষক সভার হরেকৃষ্ণ কোঙার ও আবদুল্লাহ রসুল ছাড়া প্রমোদ দাশগুপ্ত ও জ্যোতি বসুও ছিলেন। প্রতিনিধি সম্মেলনে যুক্তফ্রন্টের অন্তত চারজন মন্ত্রী যোগদান করেছিলেন—সভাপতি ও সম্পাদক বাদে প্রভাস রায় ও গোলাম ইয়াজদানী।

কাঁথি সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল অভূতপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলি ও আলোচনার মান ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত রাজনীতিক স্তরের। গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ভবিষ্যৎ পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিত ছিল।

উনিশ

শেষের কথা

এই হল প্রাদেশিক কৃষক সভার প্রথম চৌত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তার সংগ্রামী জীবনের মোটামুটি বিবরণ, সারা ভারত কৃষক সভার অংশ বা শাখা হিসাবে বাংলাদেশে তার জীবনের ধারা ও গতিপথের পরিচয় এবং তার কাজের খতিয়ান।

১৯৩৬ সনে যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা সংগঠিত হয় তখন। বিশ্ব অর্থনীতিক সংকটের প্রচণ্ড আঘাতে বাংলার কৃষকের জীবন বিপর্যস্ত, সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার ট্যাক্সের ভারে নিষ্পিষ্ট, সামন্তবাদী জমিদারী-মহাজনী শোষণ ও জুলুমের চাপে জর্জরিত। এই সমস্ত শোষণ-পীড়নের ফলে একদিকে যেমন অভাব ও দারিদ্র্যের জ্বালায় কৃষক জীবন পংগু হয়ে পড়ছিল, তেমনি অন্যদিকে কৃষি উৎপাদন বিধ্বস্ত হচ্ছিল, আর তার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব সমগ্র জাতীয় জীবনের উপর বিস্তার করছিল এক নিদারুণ হতাশার ছায়া।

জমিদার-মহাজন শ্রেণীও শান্তিতে ছিল না। যথেষ্ট খাজনা আদায় না হওয়ায় বহু জমিদারী লাটে ওঠার অবস্থায় এসে পড়ছিল, অনেকগুলি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে গিয়েছিল। মহাজনরাও সুদের টাকা আদায় করতে পারছিল না। সর্বত্র একটা চাপা বিক্ষোভ থমথমে ভাব সৃষ্টি করে দিয়েছিল। অনেকেই ভাবতে আরম্ভ করেছিল এই অবস্থা আর বেশি কাল চলতে পারে না, একটা বিহিত-ব্যবস্থা না হলে জীবন অচল হয়ে পড়বে।

সংগঠনের আহ্বান ও সাড়া

এই পরিস্থিতির মধ্যে কৃষক সভা সমগ্র কৃষক সমাজকে ডাক দিয়ে বললে, এই অবস্থা আর চলতে পারে না, এ অবস্থা পরিবর্তন করতে হবে, তার জন্য জোট বেঁধে প্রস্তুত হও! কৃষক সমাজও যেন এই আহ্বানের জন্য উন্মুখ হয়েই ছিল; সাড়া দিতে বিলম্ব করলে না। প্রথমে অবশ্য অনেকের মনে

একটা সংকোচ ও সংশয় ছিল—প্রতাপশালী জমিদার-মহাজনদের মোকাবিলা করতে কি পারবে তারা ? লাঠিয়াল-পুলিসের অত্যাচার কি তারা বরদাস্ত করতে পারবে ? সে সংশয় কাটিয়ে দিতে কৃষক সভাকে বেশি সময় ব্যয় করতে হয়নি।

কৃষক সভার আহ্বান এমন ব্যাপক ও জোরদার ছিল এমন বাস্তববাদী ও আন্তরিক ছিল যে সাধারণভাবে কৃষকরা সহজেই নিঃসংশয় হয়ে তাতে সাড়া দিতে পেরেছিল। কৃষক সভা অল্পকালের প্রচারের দ্বারা তাদের মনে প্রত্যয় জাগাতে পেরেছিল যে এ ডাক মামুলি ডাক নয়, তাদের অন্তর যে ডাক চায় সেই ডাক।

কৃষক সভা তাদের শোষণ ও উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করবার জন্য কেবল মৌখিক আহ্বানই জানায়নি, বলেছিল এই কাজ করতে হবে তাদেরই, তাদের নিজেদেরই সংগঠিত শক্তির জোরে। আর বলেছিল তাদের আন্দোলন ও সংগঠনের কাজে সভা তাদের সাহায্য করবে, নেতৃত্ব দেবে। সভা তাদের প্রথমেই দিয়েছিল ভাষা, সৃষ্টি করে দিয়েছিল কথা বলবার সুযোগ ও অধিকার। এই সুযোগ ও অধিকার থেকে কৃষক সমাজ এতকাল বঞ্চিত ছিল, এখন তারা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কথা বলতে আরম্ভ করলে, নিজেদের অভাব অভিযোগকে ভাষা দিতে শিখলে, তাদের দাবির আওয়াজ তুলতে লাগল। জমিদারী পীড়নের আতংক থেকে নিজেদের তারা মুক্ত করতে অগ্রসর হল।

কৃষক সভা তাদের বুঝিয়ে দিলে তাদের প্রকৃত অবস্থা কী, সমাজের ও দেশের পক্ষে তাদের বাঁচবার ও কাজ করবার নিশ্চিত অধিকার কত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ, আর শোষণ-পীড়নের ব্যবস্থা সমাজ-জীবনের অগ্রগতির পক্ষে কত অন্যায় ও কত অনিষ্টকর। আরো বলে দিলে এই ব্যবস্থাকে সমূলে উৎখাত করে, পরিবর্তন করে সমাজের অগ্রগতির পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে, এবং কৃষকদেরই গ্রহণ করতে হবে তার দায়িত্ব। তার ফলে কৃষকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ল।

বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করতে হবে, মহাজনের পাওনা আদায় স্থগিত রাখতে হবে—এ দাবি সর্বত্রই কৃষকদের উৎসাহিত করলে, তাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগালে, তারা আন্দোলন আরম্ভ করে দলে দলে তাতে যোগ দিতে লাগল। তারা চিনে নিলে কারা তাদের শত্রু আর

কারা মিত্র, বুঝে নিলে শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম করতে হবে আর কী ভাবে সে সংগ্রাম চালাতে হবে।

কৃষক সভা তাদের শিখিয়েছিল অর্থনীতিক জীবনের উন্নতির জন্য তাদের কোন্ কোন্ দাবি নিয়ে লড়তে হবে, কোন্ কোন্ দাবিকে আশু দাবি বলে গণ্য করতে হবে, আর সেই সব দাবির লড়াইয়ে কারা কতখানি শরিক হবে এবং কারা কতটা সাহায্য দেবে। এই ভাবে ব্যবস্থা হয়েছিল তাদের মধ্যে শ্রেণী চরিত্র বোঝাবার ও শ্রেণী চেতনা জাগাবার। আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তারা ক্রমেই শ্রেণী-সচেতন হয়ে উঠেছিল।

রাজনীতিক মুক্তির চেতনা

সভা তাদের আরো শিখিয়েছিল যে শুধু আশু দাবির লড়াই বা শুধু অর্থনীতিক দাবির সংগ্রাম তাদের শ্রেণী শোষণ ও সামাজিক নির্যাতন থেকে মুক্ত করতে পারবে না. সেজন্য রাজনীতিক মুক্তিরও প্রয়োজন এবং তার জন্যও তাদের লড়তে হবে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ থেকে দেশের অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর মতো কৃষকদেরও মুক্তি দরকার এবং সে মুক্তি আসতে পারে জাতীয় স্বাধীনতার পথে। শ্রেণী হিসাবে কৃষকদের চূড়ান্ত মুক্তি আসবে ভূমি বিপ্লব ও কৃষি বিপ্লব মারফত। সেই বিপ্লবই কৃষকদের লক্ষ্য এবং সেই বিপ্লব ছাড়া প্রকৃত জাতীয় মুক্তি আসতে পারে না।

কৃষক সভা এই সমস্ত নীতি ও শিক্ষা প্রচার করেছিল কেবল কৃষকদের মধ্যেই নয়, গ্রামাঞ্চলের সমস্ত মেহনতকারী মানুষের মধ্যে—গ্রামের কারিগর ও কুটির শিল্পীদের মধ্যে, দোকানদারদের মধ্যে, শিক্ষকদের ও চিকিৎসকদের মধ্যে। তাই কারিগর, দোকানদার, শিক্ষক প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ দাবি নিয়েও কৃষক সভা আন্দোলন করেছে। আর কৃষকদের একটা বড় অংশ ছিল জমিহীন বা প্রায়-জমিহীন লক্ষ লক্ষ খেতমজুর ও অন্যান্য গ্রাম্য মজুর। তাদের আন্দোলন কৃষক সভার আন্দোলনের বাইরে ছিল না। সভা তার আন্দোলনের মধ্যে গরিব ও অভাবী গ্রাম্য কারিগর শ্রেণীর ও ভদ্রলোক শ্রেণীর কথাও কখনো ভুলে থাকেনি, তাদের অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতির জন্যও পথ দেখিয়েছে, আন্দোলন করেছে।

বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা খাদ্য সঙ্কট যখন কৃষক ও অন্যান্য গ্রামবাসীদের জীবনকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করেছে, কৃষক সভা তখনি তাদের মধ্যে হাজির হয়েছে সাধ্যমতো রিলিফ বা সাহায্য নিয়ে, তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব

করবার চেষ্টা করেছে। সভা রিলিফ সংগঠন করেছে স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাহায্যেই, তাদেরও সংগঠনের মধ্যে এনেই। সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে এই চেতনা জাগাতে চেষ্টা করেছে যে বিপদের সময় তাদের সাহায্য দেওয়া হয় কারো দয়ার দান হিসাবে নয়, সমাজের কাছ থেকে এ সাহায্য তাদের পাওনা সমাজ জীবনের প্রয়োজনে ও তাদের সামাজিক অধিকারের বলে।

গণতন্ত্র ও সমাজবাদের চেতনা

সভা কৃষকদের শিক্ষা দিয়েছে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বা ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সাব্যস্ত করতে। সভা, সমিতি ও সংগঠনের অধিকার তাদের অন্য সকলের অধিকারের সমান, সে অধিকার তাদের সাব্যস্ত করতে হবে শ্রেণীশত্রুর দালাল ও গুণ্ডাদের অত্যাচার থেকে এবং পুলিসী জুলুম ও হয়রানী থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। সেজন্য সভার নেতৃত্বে কৃষকদের লড়তে হয়েছে, লড়াইয়ে জিততে হয়েছে। লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে কৃষকদের রাজনীতিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষকদের রাজনীতিক চেতনা-বৃদ্ধি ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। সভা তাদের শিক্ষা দিয়েছিল যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে রাজনীতিক পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে, কৃষক-মজুর রাজ কায়েম করতে না পারলে ভূমি বিপ্লব ও কৃষি বিপ্লব সমাধা করা যাবে না এবং সেই পরিবর্তনই শেষ পর্যন্ত তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে সমাজবাদী ব্যবস্থার মধ্যে। বর্তমান সময়ে ভূমি সমস্যা ও কৃষি সমস্যাই যে বাংলার ও ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় সমস্যা তাও তাদের বোঝানো হয়েছিল।

এই রাজনীতিক লক্ষ্য সামনে রেখে প্রচলিত আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃষকদের আশু দাবির আন্দোলনকে জোরদার করতে শিখিয়েছিল কৃষক সভা। কৃষকরা আন্দোলন করেছিল প্রজাস্বত্ব আইন ও মহাজনী আইনের সংশোধনের জন্য, ফসলের ভাগ ও উচ্ছেদ আইনের, বিভিন্ন ধরনের কর আইনের, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইনের এবং এমনি কৃষক স্বার্থের প্রয়োজনে অন্যান্য আইনের সংশোধনের জন্য। অন্যান্য আন্দোলনের মতো এই আন্দোলনও বিভিন্ন সময়ে অল্পবিস্তর সফলতা লাভও করেছিল। অন্য সমস্ত মানুষের মতো প্রত্যেক সাবালক কৃষকের ভোটের অধিকার দাবি করতেও শিক্ষা দিয়েছিল কৃষক সভা।

আন্দোলনের সফলতার জন্য কৃষক সভা কৃষকদের শিক্ষা দিয়েছিল সংগঠনের কাজ ও তার তাৎপর্য সম্বন্ধে। কৃষকদের অনেক বড় বড় আন্দোলন পূর্বকালেও হয়েছিল কিন্তু সেজন্য স্থায়ী সংগঠন কখনো তৈরি করা হয়নি। তাই কৃষকদের সামাজিক জীবনে কৃষক সভার সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান তাদের স্থায়ী শ্রেণী সংগঠন। কৃষক সভা নিজেই তাদের শ্রেণী সংগঠন। এই সংগঠনই তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে, সংগ্রামী করেছে, শ্রেণী চেতনা ও বিপ্লবী চেতনা জাগিয়ে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছে। তাদের জীবনের এই অভিজ্ঞতা একান্তই অভিনব।

আন্তর্জাতিকতার চেতনা

জাতীয় মুক্তি ও ভূমি ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কারের মতো সমাজবাদের নীতি প্রচার করে কৃষক সভা কৃষকদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার নীতিও প্রচার করেছে। বিভিন্ন দেশের কৃষক ও অন্যান্য মেহনতকারী জনগণের স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থের যে মৌলিক শ্রেণীগত মিল আছে এবং সেজন্য তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংগ্রামী সংহতি থাকা যে প্রয়োজন, সভা তাদের একথাও শিক্ষা দিয়েছে। কৃষকদের বোঝানো হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ যে দেশেই তাদের শোষণ বজায় রেখেছে, সেখানেই কৃষক ও অন্যান্য জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে ভারতের কৃষকদের সংগ্রাম মূলত অভিন্ন। তাই ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ এদেশের কৃষকদের নিকট কেবল একটা মুখের কথাই নয়।

কৃষক সভার প্রথম কয়েক বছরে যে সকল দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন চলেছিল তার মধ্যে প্রদেশব্যাপী স্তরে ছিল প্রধানত প্রচার আন্দোলন—জমিদারী উচ্ছেদ, মহাজনী দেনা স্থগিত বা মকুব, ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত জেলাতেই প্রচারের কাজ ব্যাপকভাবে করা হয়েছিল। এই সব দাবি নিয়ে এক সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় কৃষক সভা সরাসরি সংগ্রামে নামেনি। কিন্তু এই সময়ে বিভিন্ন স্থানীয় দাবি নিয়ে সরাসরি সংগ্রাম করা হয়েছে অনেক জেলায়, অল্পবিস্তর সব জেলাতেই, এবং সেই সংগ্রাম মারফত অনেক আংশিক দাবি আদায়ও করা গেছে।

পরে ১৯৪২ এর অক্টোবরে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনা জেলায় সাইক্লোন ও সামুদ্রিক বন্যায় ধ্বংসলীলার পর এবং ১৯৪৩-৪৪এর দুর্ভিক্ষের ও মহামারীর

সময় রিলিফের কাজ প্রয়োজনমতো ও সাধ্যমতো সব জেলাতেই করা হয়েছিল। সেই সময়ে ও তার পরে খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বী হবার উদ্দেশ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তামাম বাংলার সকল জেলাতেই আন্দোলন করা হয়েছিল। সাধারণ প্রচার ছাড়া পতিত জমি উদ্ধার ও চাষ করা, খাল কাটা ও বাঁধ বাঁধা, কচুরি পানা সাফ করে ফসল রক্ষা করা ইত্যাদি নানা ধরনের কাজে কৃষক সভা উদ্যোগী হয়েছিল, জেলাগুলিতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। এ কাজ ছিল কৃষি উৎপাদনের কাজ, কৃষকদের শ্রেণীগত প্রয়োজন ও দায়িত্বের কাজ। ফসল বৃদ্ধির আন্দোলনে শত্রু শ্রেণীদের বা সরকারের বিরুদ্ধে তেমন কোন লড়াইয়ের প্রয়োজন হয়নি, যদিও নানা রকম বাধাবিঘ্ন দূর করবার জন্য সরকার ও জমিদারদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল এবং তা অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

প্রকৃত লড়াকে আন্দোলন বলতে সারা বাংলার প্রাদেশিক স্তরের প্রথম আন্দোলন ছিল ১৯৪৬-৪৭ সনের তেভাগা আন্দোলন। এ ছিল এক কঠোর ও ব্যাপক সংগ্রাম। এই সংগ্রামে কৃষকদের বহু জীবন ও প্রচুর রক্ত দিতে হয়েছিল।

স্বাধীনতা ও কংগ্রেসী শ্রেণী-শোষণ

তারপরই ১৯৪৭ সনে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পর দেশে এক নতুন রাজনীতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই পরিস্থিতিতে কৃষক সভা নতুনভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে। আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল তেভাগা। সেই দাবি নিয়ে আন্দোলন অনেক বছর ধরে চলে এসেছে।

ক্রমে অন্যান্য সাধারণ দাবির আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল: উচ্ছেদ বন্ধের দাবি, খাদ্য ও রিলিফের দাবি, কৃষিঋণের দাবি, ক্যানাল করের অতিরিক্ত হার কমাবার দাবি। সেই সঙ্গে প্রচার-আন্দোলন চালানো হয়েছিল বিশেষভাবে ভূমি সংস্কার আইনের দাবিতে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে কৃষকদের জমি দেবার জন্য আইন করার দাবিতে। কংগ্রেস সরকার অনেক গড়িমসি করে শেষ পর্যন্ত ভূমি সংস্কার আইন পাস করেছিল কিন্তু সেজন্য যে কয়েক বছর সময় নিয়েছিল তার মধ্যে ভূমি ব্যবস্থার ও কৃষি ব্যবস্থার সংকট অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছিল। ফলে কৃষক সভার ও কৃষকদের সামনে সমস্যা জটিল হয়ে উঠেছিল। এই আইন দুটির মধ্যেও অনেক ফাঁক রাখা হয়েছিল।

জটিলতা এসেছিল এই কারণে যে কংগ্রেসের শাসন ব্যবস্থা পুরোন ভূমি ব্যবস্থার মধ্যে আইনের দ্বারা কিছু পরিবর্তন ঘটালেও সামন্তবাদী শোষণকে মূলত আগের মতোই বজায় রেখেছিল, অথচ সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী শোষণের ব্যবস্থা পূর্বের চেয়ে বাড়াবার ও কঠোরতর করবার পথ করে দিয়েছিল, সেজন্য শোষক শ্রেণীকে সরকারী সাহায্য দিয়ে পুষ্ট করছিল। কৃষক ও কারিগরদের বেশি বেশি সংখ্যায় নিঃস্ব করে দিয়ে শোষক শ্রেণীর উপর তাদের আগের চেয়ে বেশি নির্ভরশীল করবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। তার উপর পঞ্চায়েতী শাসনব্যবস্থার নামে "নীরব বিপ্লব" ঘটিয়ে এমন এক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছিল যাতে গ্রামবাসী মুষ্টিমেয় শোষকের হাতে পঞ্চায়েতের আসল ক্ষমতা—মেহনতকারী জনগণকে অবাধে শাসন ও শোষণ করবার ক্ষমতা—ন্যস্ত রেখে শোষিত জনগণকে স্থায়ী ভাবে তাদের কর্তৃত্বে থাকতে বাধ্য করা যায়।

তখন স্বভাবতই কৃষক সভাকে লড়তে হয়েছে এই সব আইনের বিরুদ্ধে। জমিদারী দখল আইন ও ভূমি সংস্কার আইনের এমন সংশোধন দাবি করতে হয়েছে যাতে কৃষকদের অন্তত কিছু সুযোগ দেওয়া হতে পারে। উচ্ছেদ আইন পাসের জন্য এবং পরে তার সংশোধনের জন্য দাবি তোলা হয়েছে। পঞ্চায়েত আইনের মৌলিক গলদ থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য দোষ ত্রুটির সংশোধনের দাবি নিয়ে আন্দোলন করা হয়েছে। এ সবের ফলে ছোটখাটো কিছু কিছু সংশোধনও করা হয়েছিল কিন্তু মৌলিক বিষয়ে কোন সংশোধনের ব্যবস্থা হয়নি।

ভোটের অধিকার সম্বন্ধে চেতনা

এর থেকে কংগ্রেস শাসনের শ্রেণী চরিত্র প্রকট হয়ে ওঠে কৃষকদের চোখে। কৃষক সভা বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করে তাদের বুঝিয়ে দেয় যে কংগ্রেসী সরকার পুঁজিবাদী শ্রেণীর ও জমিদার-জোতদার শ্রেণীর সরকার, তাই তাদের শ্রেণী স্বার্থ বা শোষণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে কৃষকদের বা মজুরদের বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা দিতে চায় না। সেই কারণে জোতদার, মহাজন ও পুঁজিদারদের শোষণ জুলুম চূড়ান্তভাবে বন্ধ করবার জন্য এই সরকারকে ও হঠানো দরকার। এইভাবে কৃষক সভা কৃষকদের রাজনীতিক চেতনা বাড়াবার চেষ্টা করে।

ভারতীয় সংবিধান লোক সভার ও সমস্ত বিধান সভার নির্বাচনে

সাবালকের ভোটাধিকার স্বীকার করেছে। তাই প্রত্যেক নির্বাচনের সময় কৃষক সভার কর্মীরা কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন ভারতীয় সংবিধান শোষক শ্রেণীদের স্বার্থে রচিত হলেও তার গণ্ডীর মধ্যে থেকে তাদের ভোটের দ্বারা নির্বাচন মারফত কতটুকু সুবিধা আদায় করা সম্ভব এবং সেজন্য তাদের ভোট নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে কী ভাবে ব্যবহার করা উচিত। এভাবেও কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা হয়েছে।

আইনের ব্যবস্থায় কৃষকদের যেটুকু সুযোগ ও অধিকারের কথা লেখা হয়েছে ততটুকুও কিন্তু তারা সব সময়ে আদায় করতে পারেনি। প্রথমত, আইনের লেখার মধ্যে ফাঁক ও ফাঁকির ব্যবস্থা থেকে যায় বা ইচ্ছা করে রাখা হয়। আদালতে গিয়ে সেই সব ফাঁক ও ফাঁকে ধরা পড়ে যায় কিন্তু তার প্রতিকার সহজে হয় না। আবার, আইনের লেখার ও ভাষায় গলদের কারণে যতটা বাধা থাকে, বহু ক্ষেত্রে, হয়তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই বাধাকে আদালত মারফত বাড়িয়ে তোলা হয়; আইনের ব্যাখ্যা কৃষকের স্বার্থে না করে শোষকদের স্বার্থে করলেই তা হতে পারে। সাধারণত আদালতের হাকিমরা শ্রেণী স্বার্থের বিচারে কৃষকদের বা শোষিতদের পক্ষ না নিয়ে শোষকদের পক্ষ নেবে এটাই স্বাভাবিক। ভাগ কোর্টের মামলায় বিশেষভাবে এটা কৃষকদের নিকট ধরা পড়ে।

একচেটিয়া স্বার্থের রাষ্ট্র

অবশ্য কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত, ঘুষের কারবারে ভরা। সেও একটা কারণ অনেক ক্ষেত্রে কৃষকদের পক্ষে কোর্টের রায় না পাবার। যে সমাজে শোষক ও শোষিত শ্রেণীদের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সংঘাত চলে সেখানে আইন, আদালত, পুলিস ইত্যাদি সমেত গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রটাই চলে শোষক শ্রেণীদের স্বার্থে, শোষিত শ্রেণীদের প্রতিরোধ দমন করবার জন্য। কৃষক সভার এই প্রচার কৃষকদের বর্তমান রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র বুঝতে সাহায্য করেছে।

রাষ্ট্রের এই শোষক চরিত্র ক্রমশ এমন পর্যায়ে এসে পড়ে যখন বোঝা যায় যে তার উপর কর্তৃত্ব করছে একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা-শিল্প-কারখানা ও ব্যাংকের একচেটিয়া বৃহৎ মালিক গোষ্ঠী—এবং জমির একচেটিয়া মালিকরা। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মালিক-

দের সঙ্গে দেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাও ক্রমেই বাড়তে থাকে। তার ফলে কৃষকদের শোষণ শুধু জোতদার-মহাজনরাই করে না, শুধু দেশের সাধারণ পুঁজিদাররাই করে না, দেশী-বিদেশী একচেটিয়াপতিরাও তাদের শোষকে পরিণত হয় এবং তাদেরই স্বার্থে বিশেষভাবে বেড়ে যায় কৃষকদের শোষণের মাত্রা। সেই সাথে এটাও লক্ষ্য করা যায় যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাষ্ট্রের নীতি ও পরিচালন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হচ্ছে এই দেশী-বিদেশী একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে এবং তাদেরি অন্তত পরোক্ষ নির্দেশে। অর্থাৎ ভারতীয় রাষ্ট্র এবং তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্রমেই বাঁধা পড়ে যাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট।

ভারত সরকারের পাঁচসালা অর্থনীতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই সাম্রাজ্যবাদী ও মার্কিন সহযোগিতার প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকায় এবং ক্রমে সে প্রভাব দেশী একচেটিয়াপতিদের স্বার্থের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রভুত্বের পর্যায়ে উঠতে থাকায় সে প্রভাব দেশের জনগণের ও জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে খোলাখুলিভাবে। তখন জাতীয় অর্থব্যবস্থা ও পরিকল্পনা সংকটের মুখে এসে পড়ে। সে সংকট ক্রমেই তীব্রতর হয়েছে এবং তা রাজনীতিক পর্যায়ে উঠছে। এই জাতীয় সংকট দেশকে এক বিপদের মুখে এনে ফেলেছে।

এই বিপদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে কৃষকসভা কৃষকদের সচেতন করবার জন্য তার নীতি নির্ধারণ করে এবং তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে। এইভাবে সভা সাম্রাজ্যবাদীদের এবং কংগ্রেস সরকারের কৃষক-বিরোধী ও দেশের স্বাধীনতা-বিরোধী শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে কৃষকদের সচেতন ও হুশিয়ার করে দেয়।

সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী শ্রেণীচেতনা

কৃষক সভা কৃষকদের মধ্যে যে শ্রেণী চেতনা জাগিয়ে তোলে তার ফলে তারা যেমন শ্রেণীগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে, তেমনি তাদের মধ্যে থেকে সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর হতে থাকে। সাম্প্রদায়িকতার ও প্রাদেশিকতার মনোভাব কাটিয়ে দেবার এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বন্ধ করবার একমাত্র নিশ্চিত উপায় যে শ্রেণীস্বার্থের চেতনা ও শ্রেণীগত ঐক্যবোধ সেকথা সংগঠিত কৃষকরা বুঝতে পারে। সেই কারণে কৃষক সভার কোন সংগঠিত এলাকায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটেনি। বরং শ্রেণী-চেতনাহীন অসংগঠিত কৃষকদের

মধ্যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেধে গেলে সেখানকার পলাতকরা সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সংগঠিত কৃষকদের মধ্যে সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছে।

সম্মেলনের গুরুত্ব

কৃষক সভা তার সম্মেলনগুলিকে কেবল আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত না করে সব সময়েই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। সভার দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা হয়, কৃষকদের জীবন-জীবিকা ও কাজের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র কায়েম হয়, এবং কৃষকদের স্বার্থের বিরোধী শক্তিগুলি সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, সে সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ের জন্য নীতি নির্ধারণ ও পথ নির্দেশ করা হয় সম্মেলনে। কৃষকদের শত শত প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়ে কৃষক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সেখানে আলোচনা করেন, পরস্পরের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সম্মেলন উপলক্ষে এক সঙ্গে অসংখ্য কর্মীর মিলনের ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ হয়, পরস্পরকে চেনা-জানার সুবিধা পাওয়া যায়, বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে পরিচিত হবারও সুযোগ আসে। এই সকল কারণে প্রত্যেকটি সম্মেলন কৃষক সভার অগ্রগতির পক্ষে মূল্যবান ঘটনা। তাই কৃষক সভার ইতিহাসে তার সম্মেলনগুলির বিবরণের বিশেষ তাৎপর্য আছে।

কৃষক সম্মেলনগুলি শেষ হয়ে যাবার পরই সম্মেলনের পর্যালোচনার একটা রেওয়াজ চালু করেছিলেন কমিউনিস্ট কর্মীরা। রেওয়াজটা নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে চলেছিল মাত্র কয়েক বছর—১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত। তাতে যোগ দিতেন কৃষক সভায় কমিউনিস্ট পার্টির যেসমস্ত কর্মী কাজ করতেন এবং সম্মেলনে যোগ দিতেন তাঁরা। তাতে সম্মেলনের প্রস্তুতি থেকে আরম্ভ করে সিদ্ধান্ত পর্যন্ত সমস্ত রাজনীতিক ও সাংগঠনিক বিষয়ের গুণাগুণ আলোচনা ও সমালোচনা করা হত এবং গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে কার্যকর করা সম্বন্ধে পার্টির তরফ থেকে কী ধরনের সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন ও কীভাবে তার ব্যবস্থা করা হবে তাও স্থির করা হত। নীতিগত বিষয়ে সম্মেলনে যেসকল সিদ্ধান্ত পাস হত তার মধ্যে কিছু যদি পার্টির নীতির সঙ্গে না মিলত, তাহলেও সম্মেলনের সিদ্ধান্তকেই কার্যকর করবার জন্য কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হত।

এ-ধরনের পর্যালোচনা এখন আর হয় না—পার্টি বা কৃষক সভা কোন তরফ থেকেই। এই রেওয়াজটা কিন্তু এক সময়ে কৃষক সভার কাজের

পক্ষে যথেষ্ট মদদ দিয়েছিল, তার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক চরিত্রকে উন্নত করতে সাহায্য করেছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে যোগসূত্র

শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে কৃষক শ্রেণীর ঘনিষ্ঠতা থাকা স্বাভাবিক। দুই শ্রেণীই সামাজিক উৎপাদনের কাজ করে অথচ সমাজের মধ্যে এই দুই শ্রেণীই সবচেয়ে বেশি শোষিত ও নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও প্রতারিত এবং অবহেলিত। তাদেরই মধ্যে অভাব, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার অভাব সবচেয়ে বেশি। সেই কারণে অর্থ-নৈতিক শোষণ ও সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তির প্রয়োজন তাদেরই সবচেয়ে বেশি। তাই তারা অপেক্ষাকৃত সহজে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ বুঝতে পারে, শ্রেণী-সচেতন ও সংগ্রামী হয়ে ওঠে। সংগ্রামের প্রয়োজন হলেই তাদের মধ্যে লড়াকে মনোভাব সহজে জেগে ওঠে।

এই শ্রেণীগত ঘনিষ্ঠতার কারণে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনের সঙ্গে কৃষক সভার যোগসূত্র থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রাদেশিক কৃষক সভার প্রথম সম্মেলনেই ঘোষণা করা হয়েছিল: "গ্রামের কৃষক আন্দোলন ও শহরের শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে একটা যোগাযোগ আমাদের অবশ্যই স্থাপন করিতে হইবে।" প্রাদেশিক কৃষক সভা ও প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে পাটচাষী ও চটকল মজুরদের দাবি ও আন্দোলন সম্পর্কে দীর্ঘকাল একটা যোগসূত্র ও পারস্পরিক সমর্থন থেকেছে। এই দুই সংগঠন পরস্পরের সম্মেলনকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছে, অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করেছে। অনেক সময় নীতিগত ব্যাপারেও এই দুই সংগঠন পরস্পরের সাথে আলোচনা করে নীতি স্থির করেছে।

কৃষক সভা ছাত্র সংগঠন, যুব সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন, মহিলা সংগঠন ও বাস্তুহারা সংগঠনের সঙ্গেও যোগসূত্র বজায় রেখেছে, তাদের বিভিন্ন আন্দোলনে শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও সমর্থন জানিয়েছে। এক সময়ে ছাত্র-আন্দোলনের অনেক কর্মী গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কৃষকদের মধ্যে থেকে নিরক্ষর কৃষকদের শিক্ষা দিতে সাহায্য করেছিলেন, সেই সঙ্গে কৃষক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সেই শিক্ষা অভিযান এখন আর হয় না, যদিও তার প্রয়োজন কমে যায়নি, বরং বেড়েছে।

কলকাতা শহরে যখনি কোন বিশেষ উপলক্ষে হাজার হাজার কৃষকের সমাবেশ হয়েছে তখনি তাদের প্রয়োজন মতো খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে এইসব সংগঠন, বিশেষ করে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি। ব্যবস্থা কেবল আনুষ্ঠানিক ভাবেই করেনি, যথেষ্ট আগ্রহ ও হৃদ্যতার সহিত দায়িত্ব নিয়েই করেছে। তাই কৃষক সভা এই সাংগঠনিক যোগসূত্রকে যথেষ্ট মূল্য দিয়ে থাকে।

রিলিফ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে

১৯৪২-৪৩ থেকে কৃষক সভার কাজের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রিলিফের কাজ কিছু পরিমাণে জড়িত হয়ে পড়ে। ১৯৪৪ সনে প্রাদেশিক কৃষক সভা সংগীত, অভিনয় প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কাজকে কৃষক আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলে গণ্য করে এবং কৃষকদের ও গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে শিল্পী সংগ্রহ করে "কৃষ্টি-বাহিনী" গঠন করার প্রয়োজন অনুভব করে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (ইণ্ডিয়ান পিপল্‌স থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন বা সংক্ষেপে আই. পি. টি. এ.) এবং পিপল্‌স রিলিফ কমিটি (পি. আর. সি.) প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকেই এই দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কৃষক সভা বরাবরই একটা যোগসূত্র বজায় রেখে এসেছে। (পি. আর. সি. যে-পিপল্‌স সাইক্লোন রিলিফ কমিটির ওয়ারিস হিসাবে জন্মলাভ করেছিল, তার সমস্ত কাজের দায়িত্ব ছিল প্রধানত কৃষক সভার কর্মীদের উপর।) তাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয়েছে। কৃষক সভা পি. আর. সি. মারফত বিপদের সময় কৃষকদের জন্য নানাভাবে রিলিফের ব্যবস্থা করতে এবং আই. পি. টি. এ. তার সাংস্কৃতিক কাজের দ্বারা কৃষকদের রাজনীতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। তেমনি পি. আর. সি. এবং আই. পি. টি. এ.-কে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবার জন্য প্রধানত নির্ভর করতে হয়েছে কৃষক সভার ও তার কর্মীদের উপর।

খেতমজুরদের দাবি ও আন্দোলন

প্রথম দিকে কৃষক সভা ছিল প্রধানত বড় ও মাঝারি কৃষকদের সংগঠন। ক্রমে তার প্রভাব বাড়তে থাকে গরিব কৃষকদের মধ্যে—ছোট ছোট জমির মালিক, বর্গাদার, জমিহীন বা প্রায়-জমিহীন কৃষক ও খেতমজুদের মধ্যে। শ্রেণীশোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি ও সংকটের আঘাতের কঠোরতা বৃদ্ধির সঙ্গে এই সমস্ত কৃষক যত বেশি দুঃস্থ ও অভাবী হতে থাকে এবং তার প্রতিরোধের

জন্য কৃষক সভা যত বেশি সংগ্রামী হতে থাকে, ততই তাদের সঙ্গে সভার যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে কৃষক সভার প্রাথমিক মেম্বরদের মধ্যে গরিব কৃষকদের সংখ্যা ও অনুপাত বড় ও মাঝারি কৃষকদের তুলনায় অনেক বেশি। সেদিক থেকে বিচার করলে কৃষক সভাকে এখন গরিব কৃষকদের সংগঠন বলা চলে।

কিন্তু এইখানে কৃষক সভা একটা বড় দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে এসেছে। কৃষক সভা দাবি করে সে একটি সংগ্রামী ও বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান, ভূমি-বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্লব তার লক্ষ্য। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এই বিপ্লবের যে মূল শক্তি, যে শক্তির নেতৃত্ব ছাড়া এই বিপ্লবকে সফল করা সম্ভব নয়, তারা কিন্তু এখনো সংগঠন হিসাবে কৃষক সভার মধ্যে মূল বা প্রধান শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি, সভার উপর তাদের নেতৃত্ব এখনো কায়েম হয়নি, সেজন্য তাদের প্রস্তুতও করা হয়নি।

গরিব কৃষকদের মধ্যে ভাগচাষী বা বর্গাদারদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে কৃষক সভা দীর্ঘকাল ধরে রীতিমতো সংগ্রাম করে এসেছে। নীতিগতভাবে সে কাজ অবশ্য সঠিকই হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি শোষিত ও নিপীড়িত যে খেতমজুরদের স্তর তাদের দাবির আন্দোলনকে সেরকম গুরুত্ব দেয়নি। স্টেট রিলিফের কাজ বা খয়রাতী সাহায্য আদায়ের আন্দোলন কৃষক সভা অবশ্যই বছরের পর বছর করে এসেছে, তাতে অন্য অনেক গরিব কৃষকের মতো খেতমজুররাও কিছু পরিমাণে বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু খেতমজুরদের শ্রেণী স্বার্থের প্রয়োজনে রিলিফের দাবি তাদের আসল দাবি নয়।

বাংলাদেশে কৃষক সভা মনে করে খেতমজুররা সাধারণত জমিহীন বা প্রায়-জমিহীন গরিব কৃষক, জমির অভাবে মজুরের কাজ করে জীবিকার জন্য। তাই কৃষক সভা চায় অন্যান্য গরিব কৃষকদের মতো তাদের বিনামূল্যে জমি দেওয়া হ'ক এবং সেই সঙ্গে সে জমি চাষ করবার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া হ'ক। আর জমি ও চাষের সুবিধা যদি না দেওয়া হয়, তাহলে তাদের নিয়মিত কাজের ও ন্যায্য মজুরীর ব্যবস্থা করা হ'ক। দাবিগুলো সঠিক কিন্তু এই দাবি আদায়ের জন্য যে পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে তাদের আন্দোলন ও সংগঠন তৈরি করা দরকার ছিল, অন্তত বর্গাদারদের দাবি সম্বন্ধে যতটা করা হয়েছে, খেতমজুরদের ক্ষেত্রে সভা তা করেনি।

প্রথম দিকে জমি বণ্টনের দাবিও জোর দিয়ে তোলা হয়নি ; তখন জমিদারী উচ্ছেদের দাবির উপরেই জোরটা পড়েছিল।

খেতমজুর সংগঠনের প্রশ্ন

কৃষক সভা তার সম্মেলনে বার বার সিদ্ধান্ত করেছে খেতমজুরদের দাবি নিয়ে আন্দোলন ও সংগঠন করতে হবে। অবশ্য একটা প্রশ্ন অনেক সময় উঠেছে—খেতমজুরদের সংগঠন করা হবে কৃষক সভার ভিতরে, না বাইরে, পৃথক সংগঠন হিসাবে? সে সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত আছে যে, খেতমজুদের স্বার্থের দিক থেকে যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে পৃথক সংগঠন করতে হবে এবং সুবিধামতো একটা স্তরে খেতমজুরদের সেই পৃথক সংগঠনকে কৃষক সভার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। তাসত্ত্বেও যে খেতমজুরদের বিশেষ দাবি নিয়ে প্রয়োজনীয় আন্দোলন ও সংগঠন করা হয়নি তার কারণ মনে হয় কৃষক সভার নেতৃত্ব ও কর্মীদের নীতিগত দুর্বলতা, খেতমজুরদের শ্রেণীস্বার্থের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিতে তাদের মানসিক বা সামাজিক প্রতিরোধ।

সে দুর্বলতার কারণ যদি এই হয় যে কৃষক সভার নেতা ও কর্মীদের মধ্যে ভূমি বিপ্লবের সংগ্রামে খেতমজুরদের ভূমিকাকে খাটো করে দেবার ঝোঁকে আছে, তাহলে সে ঝোঁক যত সত্বর কাটিয়ে ফেলা যায় ততই মংগল। একথা ঠিক যে বাস্তব বিচারে ভাগচাষীর দাবি আদায় করার যতটা সম্ভবনা আছে, খেতমজুরদের জমি ও কাজের দাবি, বিশেষ করে কাজের দাবি আদায় করার ততটা সম্ভাবনা নাই। বর্তমান ভূমি সম্পর্ক বজায় থাকতে কাজের সম্বন্ধে সরকারের উপর চাপ দিলেও যথেষ্ট সুফল পাবার আশা নাই। তবে জমি আদায়ের আন্দোলন আরো জোরালো হলে, যথেষ্ট না হলেও বেশ কিছু পরিমাণ জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা সম্ভব, এবং ইতিমধ্যে তা করা হয়েছেও।

জমি বণ্টন একান্ত প্রয়োজন

সামাজিক অগ্রগতির কথা বিচার করলে বলতে হয় খেতমজুররা মজুর হিসাবে, সর্বহারা শ্রেণীর অংশ হিসাবে কৃষকদের তুলনায় বেশি প্রগতিশীল ও বেশি বিপ্লবী ; বিপ্লবের সম্ভাবনা তাদের মধ্যে কৃষকদের চেয়ে বেশি। তাহলে কি তাদের মজুরের অবস্থায় রেখে না দিয়ে জমি দিয়ে কৃষক করে ফেলা ভুল হবে, প্রগতি বিরোধী কাজ হবে ?

নীতিগতভাবে বলা যায় যে বাংলাদেশে বর্তমান ভূমি ব্যবস্থা ও কৃষি

ব্যবস্থা বজায় রেখে কৃষি উৎপাদনের উন্নতির জন্য বিভিন্ন স্তরের কৃষকদের উৎসাহিত করা ও তাদের সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করা কৃষক সভার লক্ষ্য বা প্রধান কাজ নয়। তার চেয়ে বড় কাজ হল ভূমি ব্যবস্থার ও কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃষকদের জমি দিয়ে যতটা সম্ভব সচ্ছল কৃষকে পরিণত করা, এবং যাদের জন্য জমি ও কৃষির সুবিধা দেওয়া সম্ভব নয় তাদের জন্য কাজ, মজুরী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যবস্থা করা, কেননা একমাত্র এই উপায়েই এই লক্ষ লক্ষ কর্মক্ষম মানুষের শ্রমশক্তিকে সামাজিক উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করে সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি করবার এবং তাদের বাঁচিয়ে রেখে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হতে পারে।

বর্তমান অবস্থায় খেতমজুরদের পক্ষে গড়ে ছ মাসের বেশি কাজ পাওয়া কঠিন, অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব, এবং উপযুক্ত মজুরী বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধার জন্য নিশ্চিত সংগত ব্যবস্থা করাও তেমনি কঠিন। কারখানা-শিল্পও সে-ভাবে বাড়তে পারছে না যাতে সেখানে গিয়ে তারা কাজ পেতে পারে। অথচ জমির বড় বড় মালিকদের হাতে এবং সরকারের হাতে যতটা আবাদী বা আবাদযোগ্য জমি আছে তা ন্যায্যভাবে বণ্টন করলে লক্ষ লক্ষ লোককে বাঁচাবার ও উৎপাদনের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা যায়। এখানে প্রগতি বা প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কাজ ও মজুরী সম্বন্ধেও যতটা ভালো ব্যবস্থা করা সম্ভব তার জন্যও অবশ্য লড়তে হবে।

কৃষক-মজদুর রাজ ও ভূমি বিপ্লব

এর জন্য শক্তিশালী আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলা এখন কৃষক সভার প্রধান কাজ হওয়া উচিত। বড় ও মাঝারি কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার কাজকে কৃষক সভা উপেক্ষা করতে পারে না। তার জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং সংগত শোষণ মুক্তির আন্দোলন করতে হবে। তার চেয়ে জোর দিয়ে আন্দোলন ও সংগঠনের কাজ করতে হবে খেতমজুর ও বর্গাদার সমেত সমস্ত গরিব কৃষকদের স্বার্থে ও তাদের দাবি নিয়ে, এবং তার মধ্যেও খেত-মজুরদের স্বার্থ এ পর্যন্ত কতকটা উপেক্ষিত থেকেছে বলে তাদের বিশেষ দাবির উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়ে। গরিব কৃষকরাই সমগ্র কৃষক সমাজের বারো আনা অংশ এবং তারাই ভূমি-বিপ্লবের প্রধান শক্তি।

ভূমি-বিপ্লব একটা মতবাদগত সমস্যা। এই বিপ্লব প্রধানত কাম্য

সর্বহারা ও আধা-সর্বহারা এবং মেহনতকারী কৃষক শ্রেণীর। তাহলে ধরা যেতে পারে দেশের অন্তত শতকরা ৮০ জনের কাম্য। কৃষক সভা অবশ্যই এই বিপ্লব চায়। কারণ তার উপর নির্ভর করে ভূমি সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন, কৃষি ব্যবস্থার দ্রুত ও অবাধ অগ্রগতি এবং দেশের প্রকৃত শিল্পায়ন। আরো নির্ভর করে দেশের সামাজিক ও অর্থনীতিক মুক্তি, সমস্ত মেহনতকারী শ্রেণীগুলির ও জনগণের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার আশ্বাস, তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মান উন্নয়ন।

সফল ও সার্থক ভূমি-বিপ্লব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসের ও সমাজবাদী ব্যবস্থার ভিত পত্তনের কাজের অগ্রদূত, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ থেকে চূড়ান্ত মুক্তির পথে নিশ্চিত ধাপ। দীর্ঘ কাল পূর্বে কৃষক সভা কৃষকদের জন্য "কিসান-মজদুর রাজ" নামে যে লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করেছিল (সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের গয়া অধিবেশন, ১৯৩৯), ভূমি বিপ্লবের লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্য অভিন্ন। কৃষক সভা নিশ্চয়ই এখন সেই লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হবে এবং সেজন্য কৃষক সমাজকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুত করতে থাকবে।

পরিশিষ্ট

১। প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের অধিবেশন

(ক) বঙ্গ বিভাগের পূর্বে তামাম বাংলায়

			প্রাথমিক মেম্বর সংখ্যা
প্রথম	পাত্রসায়ের (বাঁকুড়া)	২৭-২৮ মার্চ ১৯৩৭	১১,০৮০
দ্বিতীয়	বড়া (হুগলী)	২-৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮	৩৫,৫০০
তৃতীয়	নঘরিয়া (মালদহ)	৪-৬ মে ১৯৩৯	৫০,০০০
চতুর্থ	পাঁজিয়া (যশোহর)	৭-৬ জুন ১৯৪০	৩৪,০০০
পঞ্চম	ডোমার (রংপুর)	জুন ১৯৪২	৩৫,০০০
ষষ্ঠ	নালিতাবাড়ি (ময়মনসিং)	১০-১২ মে ১৯৪৩	১,২৪,৮৭২
সপ্তম	ফুলবাড়ি (দিনাজপুর)	২৯ ফেব্রুয়ারি-২ মার্চ ১৯৪৪	১,৭৮,৫০০
অষ্টম	হাটগোবিন্দপুর (বর্ধমান)	১৩-১৪ মার্চ ১৯৪৫	২,৫৫,০০০
নবম	মৌভোগ (খুলনা)	২১-২৪ মে ১৯৪৬	২,১৭,৩০৪
দশম	পাঁচখুরি (মেদিনীপুর)	২৭-২৮ ফেব্রুয়ারী-১মার্চ ১৯৪৭	২,০৩,৩৮২

(খ) পশ্চিমবঙ্গে

একাদশ	কুমারশা (২৪ পরগনা)	৩১ মে-১জুন ১৯৫২	৩০,০০০
দ্বাদশ	বাগনান (হাওড়া)	২১-২৪ মে ১৯৫৩	১০৮,০০০
ত্রয়োদশ	নঘরিয়া (মালদহ)	৪-৭ জুন ১৯৫৪	১৮৫,৩৫৯
চতুর্দশ	বড়া-কমলাপুর (হুগলি)	২৭-৩০ এপ্রিল ১৯৫৫	২১৯,৮৬৪
পঞ্চদশ	বনগাঁ (২৪ পরগনা)	৩০-৩১ অক্টোবর ১৯৫৭	১০১,৯৯৭
ষোড়শ	কাকদ্বীপ (২৪ পরগনা)	১৫-১৭ এপ্রিল ১৯৬০	১৪২,০২২
সপ্তদশ	বল্লুক (মেদিনীপুর)	২৮-৩১ মে ১৯৬১	১৩৯,৪৫৭
অষ্টাদশ	সাতগেছিয়া (বর্ধমান)	১৪-১৬ অক্টোবর ১৯৬৬	১১৪,৯৮৫
উনবিংশ	সোনারপুর (২৪পরগণা)	৩১ মে—১-২ জুন ১৯৬৮	২৫৫,০৫৮
বিংশ	কাঁথি (মেদিনীপুর)	৬-৮ জুন ১৯৬৯	৪০৬,২৯৫

১৯৬৬-৬৭ সনে প্রাথমিক মেম্বর সংখ্যা ছিল ৫২১,৬৯৪, এ পর্যন্ত সর্বাধিক। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনের কারণে সে বছর প্রাদেশিক সম্মেলন হয়নি।

২। প্রাদেশিক কৃষক কমিটি ঃ সভাপতি ও সম্পাদক

(ক) প্রথম (পাত্রসায়ের, ১৯৩৭) থেকে অষ্টম (হাট গোবিন্দপুর, ১৯৪৫) পর্যন্ত প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য নির্বাচিত সভাপতি পরিষদ ও সম্মেলনে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদকদের তালিকা :

সম্মেলন	সভাপতি পরিষদ	সাধারণ সম্পাদক
পাত্রসায়ের	মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, সৈয়দ আহমদ খাঁ ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	বঙ্কিম মুখার্জি
বড়া	মুজফ্‌ফর আহমদ, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বঙ্কিম মুখার্জি ও অন্য একজন	আবদুল্লাহ রসুল
নথরিয়া	ঐ	ঐ
পাঁজিয়া	মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বঙ্কিম মুখার্জি, সৈয়দ নওশের আলী, আবু হোসেন সরকার	ঐ
ডোমার	অজ্ঞাত	ঐ
নালিতাবাড়ি	মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, বঙ্কিম মুখার্জি, সৈয়দ নওশের আলী, হাজি মোহম্মদ দানেশ, প্রমথ ভৌমিক,	ঐ
ফুলবাড়ি	আবদুল্লাহ রসুল, গোপাল হালদার, মনি সিংহ	মনসুর হবিব
হাট গোবিন্দপুর	গোপাল হালদার, আবুল হায়াত, কৃষ্ণবিনোদ রায়	ঐ

(খ) নবম (মৌভোগ, ১৯৪৬) সম্মেলনের সময় থেকে সম্মেলনের জন্য সভাপতি পরিষদের পরিবর্তে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরিবর্তে সম্পাদক নির্বাচিত হন।

মৌভোগ	কৃষ্ণবিনোদ রায়	মনসুর হাবিব
পাঁচথুবি	ঐ	ঐ

কুমারশা	আবদুল্লাহ রসুল	ভূপাল পাণ্ডা
বাগনান	ঐ	হরেকৃষ্ণ কোঙার
নথরিয়া	আবদুর রাজ্জাক খাঁ	ঐ
বড়া-কমলাপুর	আবদুল্লাহ রসুল	ঐ
বনগাঁ	ঐ	ঐ
কাকদ্বীপ	ভবানী সেন	ঐ
বল্লুক	বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ
সাতগেছিয়া	ঐ	ঐ
(পরে পরিবর্তিত :	হরেকৃষ্ণ কোঙার	আবদুল্লাহ রসুল)
সোনারপুর	ঐ	ঐ
কাঁথি	ঐ	ঐ

৩। বাংলাদেশ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য

বঙ্গবিভাগের পূর্বে (সেন্সাস রিপোর্ট, ১৯৪১)

(ক) আয়তন ৭৭,৪৪২ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৬ কোটি ৩ লক্ষ ; তার মধ্যে মুসলিম শতকরা ৫৪, হিন্দু ৪২। গ্রাম ৮৪,০০০। শহরের জনসংখ্যা ৬০ লক্ষ। বার্ষিক বৃষ্টিপাত : কলকাতার পশ্চিমে ৫০—৬০ ইঞ্চি, পূর্বে ও উত্তরে ৬০—১২০ ইঞ্চি।

(খ) মোট আবাদী জমি ২ কোটি ৯০ লক্ষ একর, দোফসলী ধরলে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ। এর মধ্যে ধান চাষে নিযুক্ত ২ কোটি ৬০ লাখ, পাট চাষে ২০ থেকে ২৫ লাখ একর।

(গ) সম্পূর্ণত বা প্রধানত জমির উপর নির্ভরশীল পরিবার ৭৫ লক্ষ। তার মধ্যে ৫ একরের বেশি জমির মালিক ২০ লক্ষের কম, ১০ একরের বেশির মালিক প্রায় সাড়ে ৬ লাখ, ২ থেকে ৫ একরের মালিক প্রায় ২০ লাখ। বাকি পরিবারগুলির জোত ২ একরের কম অথবা তারা জমিহীন ; ১০ লক্ষ পরিবার বর্গাদার, ২০ লক্ষ সম্পূর্ণত বা প্রধানত খেতমজুর।

দেশ বিভাগের পর (সেন্সাস রিপোর্ট, ১৯৫১)

	ভারত	পশ্চিমবঙ্গ
(ক) আয়তন (বর্গমাইল)	১২,৬৯,৬৪০	৩০,৭৭৫

গ্রাম	৫,৬০,০০০	৩৫,০০০
জনসংখ্যা	৩৬ কোটি ১২ লাখ	২ কোটি ৪৮ লাখ
গ্রাম্য জনসংখ্যা (শতকরা)	৮৩	৭৫
মোট আবাদী জমি (একর)	২৬ কোটি ৭৫ লাখ	১ কোটি ৪ লাখ
তার মধ্যে সেচ পায় (শতকরা)	১৮	১৮
দোফসলী „	১৩	১২
জোতের গড় আয়তন (একর)	৭·৫	৪·৭

(খ) মোট জোতের ও মোট আবাদী জমির শতকরা কত অংশ বিভিন্ন আকারের (একর) জোতে আছে (মোট জোত সংখ্যার শতকরা অংশ —১ ; মোট আবাদী জমির শতকরা অংশ—২) :

	১ একর পর্যন্ত		১.১—২.৫		২.৬—৫.০		৫.১—১০.০		১০.১—২৫.০		২৫.১—৫০.০		৫০এর উপর	
	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২
ভারত	১৬.৮	১.০	২১.৩	৪.৬	২১.০	৯.৯	১৯.১	১৭.৬	১৬.২	৩২.৫	৪.২	১৯.০	১.৪	১৫.৫
পশ্চিমবঙ্গ	১৫.৯	১২	২০.৬	৭.৪	৩০.০	২৩.০	২৩.৬	৩৩.৯	৮.৭	২৫.২	৯.০	৫.৮	০.৩	৩.৫

(গ) খেতমজুররা বছরে গড়ে মোট কত দিন কাজ পায় (ভারত সরকারের সারা ভারত খেতমজুর তদন্তের রিপোর্ট, ১৯৫৪)

	দিন	দৈনিক গড় মজুরী (আনা)	
সারা ভারতে	২১৮	১৭.৫	(পুরুষ)
পশ্চিম বাংলায়	২৪৬	২৭	„

(ঘ) বাংলাদেশে ধান চালের দর (**Report of the Bengal Paddy and Rice Enquiry Committee, 1939**) :

মণ প্রতি সাধারণ চালের গড় বার্ষিক দর : ১৯০১—৩॥৶০ ; ১৯১৩ (প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পূর্বে)—৫।⁄০ ; ১৯১৯ (প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর) —৭।৵০ ; বিশ্ব অর্থনীতিক সঙ্কটের পূর্বে — ৬॥৵০ ; ঐ সঙ্কটের সময়ে ও পরে : ১৯৩১-৩২—৪⁄০ ; ১৯৩৩-৩৪—২॥৵০ ; ১৯৩৬-৩৭—৩॥০ ।

ঐ সঙ্কটের সময়ে ও পরে ফসল ওঠার মরসুমে ধানের (ও চালের) দর :

	১৯৩৪	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮
পাটনাই	১৸০ (৩৵০)	২।০ (৩৸০)	২॥০ (৪৵০)	২৲ (৩।৵০)	১৸০ (৩৵০)
মোটা	১।৵০ (২৸০)	১৸০ (৩৵০)	২৲ (৩।৵০)	১॥০ (২৸০)	১।৵০ (২॥৵০)

বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে (১৬৬৪-৭৭ এবং ১৬৭৯-৮৯)

ঢাকায় চালের দর ছিল টাকায় ৮ মণ। তার মধ্যে ১৬৭৫ সনে ছিল এক মণ চালের দাম ১ আনা ৪ পাই।

৪। জমিদারী ও ভূমিরাজস্ব সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য

(Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal, 1940-41)। বাংলার ভূমি রাজস্ব কমিশন তার রিপোর্ট দাখিল করেছিল মার্চ ১৯৪০এ।

যে সব জমিদারী মহল সরকারকে রাজস্ব দিত তাদের সংখ্যা	১,০২,৮২৫
তার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মহল	৯৪,২৩০
অল্পকাল স্থায়ী বন্দোবস্তের মহল	৪,০৫৮
সরকারী খাস মহল	৪,৫৩৭
এই সমস্ত মহল থেকে সরকারের পাওনা	৩,১৬,৮৮,৪০৮ টাকা
তার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মহলগুলি থেকে	২,৩৫,১৪,৪৩৭ টাকা
জমির খাজনা বাবত মোট আদায়	১৭,৩১,০৫,৫৩২ ,,
এর মধ্যে বঙ্গীয় সেস আইন (১৮৭২) জারি হবার পর বৃদ্ধি	৯,৫৪,২১,৯৪২ ,,

অন্য এক হিসাবে দেখা যায় (১৯৪১ এর সেন্সার রিপোর্ট):

অকৃষক জমির মালিক ৫২,১৯,৫০০: রাইয়ত ও অধীন-রাইয়ত ৮৮,৭৭,৮৫০: ভাগচাষী বা বর্গাদার ৩৭,৭৮,০০০; খেতমজুর ৬৩,৩৭,২০০; জমিদার পরিবার দেড় লক্ষ।

সমস্ত জমিদারী-তালুকদারী সম্পত্তির মোট আদায়ী ১৬.৫০ কোটি টাকা। রাজস্ব ও সেস দেবার পর ১৩ কোটি টাকা।

৫। বাংলার কৃষক আন্দোলনের শহীদ

ক। তেভাগা আন্দোলনে পুলিসের গুলিতে নিহত

দিনাজপুর জেলা

১।	সমিরুদ্দীন	চিরির বন্দর	৪ জানুয়ারি ১৯৪৭
২।	শিবরাম মাঝি	,,	,,
৩।	চিয়ার সাই শেখ	খাঁপুর	২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭
৪।	যশোদারাণী সরকার	,,	,,

৫।	কৌশল্যা কামারনী	,,	,,
৬।	গুরুচরণ বর্মণ	,,	,,
৭।	হপন মাঁড়ি	,,	,,
৮।	মাঝি সরেন	,,	,,
৯।	ডুখনা কোলকামার	,,	,,
১০।	পুরনা ,,	,,	,,
১১।	ফাগুয়া ,,	,,	,,
১২।	ভোলানাথ ,,	,,	,,
১৩।	কৈলাস ভুঁইমালী	,,	,,
১৪।	থোতো বর্মণ	,,	,,
১৫।	ভাদু ,,	,,	,,
১৬।	আলু ,,	,,	,,
১৭।	মংগল ,,	,,	,,
১৮।	শ্যামাচরণ ,,	,,	,,
১৯।	নগেন ,,	,,	,,
২০।	ভুবন ,,	,,	,,
২১।	ভবানী ,,	,,	,,
২২।	জ্ঞান	,,	,,
২৩।	নারায়ণ মুর্মু	,,	,,
২৪।	গহনুয়া মাহাতো	,,	,,
২৫।	শুকুর চাঁদ	ঠুমনিয়া	,,
২৬।	ঐ স্ত্রী	,,	,,
২৭।	মাকটু সিং	,,	,,
২৮।	নেন্দেলি সিং	,,	,,
২৯।	গজেন বর্মণ	চিরির বন্দর	,,
৩০।	ঝড়ু বর্মণ	,,	,,
৩১-৩৫।	পাঁচ জন কৃষক (মিছিল করে জনসভায় ঠাকুরগাঁও যাবার পথে পুলিসের গুলিতে নিহত)		২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭
৩৬-৩৯।	বিচারাধীন অবস্থায় জেলে মৃত চার জন কৃষক।	দিনাজপুর জেল	,,

৪০। একজন কৃষক (জোতদারদের দ্বারা নিহত) খাঁপুর ১৯৪৭

জলপাইগুড়ি জেলা

৪১-৪৫। পাঁচ জন কৃষক হাহাইপাথা, মাল, ১ মার্চ ১৯৪৭

৪৬-৫৪। ন জন কৃষক, মংগল বাড়ি হাট, মেটেলি ৪ এপ্রিল ১৯৪৭

খুলনা জেলা

৫৫। হাজারি পদ বালা, বালাবুনিয়া, শোভনা ২৩ জানুয়ারি ১৯৪৭

৫৬। হাজরা পদ মণ্ডল (জোতদারদের দ্বারা নিহত) দাকোপ

রংপুর জেলা

৫৭। তৎনারায়ণ বর্মণ " জানুয়ারি ১৯৪৭

হাওড়া জেলা

৫৮। প্রাণকৃষ্ণ মান্না (৪০) " জামিরা ৬ জানুয়ারি ১৯৪৭

২৪ পরগনা জেলা

৫৯। কার্ত্তিক কর " ১৯৪৮

৬০। যতীশ চন্দ্র হালদার " "

৬১। রবিরাম সর্দার (৩৫) বেড় মজুর ৮ মার্চ ১৯৪৭

৬২। পাগলু সর্দার " "

৬৩। চামু বিশাল (রাজবাড়ি) " "

৬৪। বৈরা সর্দার (২৭) " "

৬৫। রতিরাম সর্দার ছোট আজগড়া "

মালদহ জেলা

৬৬-৬৯। চারজন আদিবাসী কৃষক চরুল বিল ২৯ মার্চ ১৯৪৭

ময়মনসিং জেলা

৭০। রাসমণি বাহেরাতলি, সুসংথানা ৩১ জানুয়ারি ১৯৪৭

৭১। সুরেন্দ্র সরকার " "

৭২। রাজেন্দ্র সরকার " "

৭৩। সর্বেশ্বর ডালু " "

(জোতদারদের দ্বারা নিহত)

খ। ১৯৪৮-৪৯-এর কৃষক আন্দোলনের শহীদ (পুলিসের গুলিতে)

মেদিনীপুর জেলা

১।	চৈতন্য সামন্ত		১৯৪৯
২।	সুধীর নায়েক		,,
৩।	সুধীর সর্দার		,,
৪।	পঞ্চানন কৈদর		,,
৫।	ভবেশ		,,
৬।	গোলোক		,,

বীরভূম জেলা

৭।	দাশু মাঝি	ডামড়া	জুন ১৯৪৯
৮।	কুদনো মাঝি	,,	,,
৯।	হাবুল লেট	,,	,,
১০।	পনিক লেট	,,	,,

হুগলি জেলা

১১।	পাঁচুবালা দাসী	ডুবির ভেড়ি	১৯৪৯
১২।	দাসীবালা মাল	,,	,,
১৩।	পুষ্পবালা দাসী	,,	,,
১৪।	কালীবালা পাথিরা	,,	,,
১৫।	মুক্তকেশী মাঝি	,,	,,
১৬।	রাজকৃষ্ণের মা	,,	,,
১৭।	কার্ত্তিক ধাড়া	কমলাপুর	১৯৪৯
১৮।	গুইরাম মণ্ডল	,,	,,

হাওড়া জেলা

১৯।	দেবেন মালিক		
২০।	গণেশ ভুঁইয়া		
২১।	কানাই বাগ		
২২।	সাধন বাগ (৩৫)	মাসিলা	২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১
২৩।	ফটিক গলুই (৩৫)	,,	,,
২৪।	গুইরাম মুদী (৩২)	,,	

২৫।	মন্মথ কয়াল (৪২)	মাসিলা	২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯
২৬।	তারাপদ রায় (৩৩)	,,	,,
২৭।	মনোরমা রায় (১২)	,,	,,
২৮।	লক্ষ্মীময়ী রায় (৩০)	,,	,,
২৯।	হীরণ্ময়ী ব্যানার্জি (৩৪)	,,	,,
৩০।	যশোদাময়ী সাঁতরা (৯)	হাঁটাল	৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯
৩১।	সুধাময়ী সাঁতরা (৩৪)	,,	,,
৩২।	পারুলবালা সাঁতরা (৩০)		
৩৩।	মাখনবালা সাঁতরা (৪৭)	,,	,,
৩৪।	সত্যবালী দাসী (৫০)	,,	,,
৩৫।	অষ্টবালা পণ্ডিত (৪৫)	,,	,,
৩৬।	ননীবালা পাত্র (৫০)	,,	,,
৩৭।	বালিকা পাত্র (৪০)	,,	,,
৩৮।	পাঁচু বেরা (৩০)	ইসলামপুর	২৪ জুন ১৯৪৯
৩৯।	কানাই বাগ (১৫)	,,	,,
৪০।	বসন্ত রায় (২৫)	বাইনান	১৯৪৯

২৪ পরগনা জেলা

৪১।	অহল্যা দাসী	চন্দনপীড়ি	ডিসেম্বর ১৯৪৮
৪২।	উত্তমী দাসী	,,	,,
৪৩।	বাতাসী দাসী	,,	,,
৪৪।	সরোজনী দাসী	,,	,,
৪৫।	নীলকণ্ঠ ঘড়ুই		১৯৪৯
৪৬।	সুরেন মণ্ডল		,,
৪৭।	সুধীর ঘড়ুই		,,
৪৮।	অশ্বিনী দাস		,,
৪৯।	গজেন ভুঁইয়া		,,
৫০।	দেবেন ধাড়া		,,
৫১।	সুরেন মিস্ত্রি		১৯৪৯
৫২।	অমর মণ্ডল		,,
৫৩।	পূর্ণ মণ্ডল		,,

৫৪। ভবেন নস্কর ১৯৪৯

৫৫। মতি খাড়া ”

৫৬। দাশু মণ্ডল ”

বর্ধমান জেলা

৫৭। সন্তোষ রায় মাঝপুর, রায়না ১৯৪৯

৫৮। যুগল মালিক ” ” ”

৫৯। সুনীল পাল অগ্রদ্বীপ ”

৬০। সুশীল চক্রবর্তী (আটক বন্দী অবস্থায় মৃত) ১৯৫১

বাঁকুড়া জেলা

৬১-৬৫। পাঁচ জন কৃষক (পুলিসের গুলিতে) জয়পুর থানা ১৫ আগস্ট ১৯৪৯

৬৬। প্রভাত কুণ্ডু (বর্ধমান) দমদম জেলে নিহত ১৯৪৯

৬৭। সুশীল চক্রবর্তী (কলকাতা) ” ” ” ”

৬৮। প্রহ্লাদ রায়চৌধুরী (৩০) (কংগ্রেসী দ্বারা নিহত) গাজনকোল, হাওড়া ১৯৫৭

৬। খেতমজুর ও বর্গাদার

ছোট ছোট কৃষকরা অর্থনৈতিক সংকটের আঘাতের ফলে জমিহীন হয়ে পড়েছে। ভারতে তাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে তারা জমি পায় কিনা এটা হল প্রশ্ন। (পাত্রসায়ের সম্মেলনে সভাপতি পরিষদের নিবন্ধ, "ভারতের কৃষক সমস্যা", পৃ ৫৩।) বর্গাদাররা প্রায় ভূমিদাসে পরিণত হয়েছে। কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে। প্রথম স্তর হল জমিহীন কৃষক। তাদের মধ্যে পড়ে বর্গাদার ও খেতমজুররা। গ্রামবাসীদের সংগ্রামে "এই ভূমিহীন কৃষকরাই সকলের আগে আগে থাকিবে। কৃষক সংগঠনকারীদের পক্ষে উচিত হইবে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া খেতমজুরদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারকার্য চালানো।" (ময়মনসিংহ জেলা কৃষক সম্মেলনে ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ তারিখে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সভাপতির অভিভাষণ, ঐ, পৃ ৭০।)

"গরিব চাষী ও খেতমজুরদের আন্দোলনের মধ্যে আরো বেশি করিয়া টানিয়া আনা।"—প্রাদেশিক কৃষক কমিটির ইস্তেহার (নং ৫, ৮ আগস্ট ১৯৩৯) অন্যান্য কাজের মধ্যে এই কাজটির উপর জোর দিয়েছিল। (পৃ ৫)

১৯৩৯-৪০ সনে কৃষক সভার মেম্বর সংগ্রহের সময় "নিঃস্ব কৃষকদের প্রতি পূর্বের চেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল।" (পৃ ১৫) পাঁজিয়া সম্মেলনের ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত প্রস্তাবে একটা দাবি ছিল: বেকার খেতমজুরদের জমি দিতে হবে বা উপযুক্ত কাজ দিতে হবে অথবা উপযুক্ত বেকার ভাতা দিতে হবে। (পাঁজিয়া রিপোর্ট, পৃ ৪৫)

খেতমজুরের মজুরী ও কাজের সমস্যা এবং আধিয়ার সমস্যা "বাংলার কৃষক আন্দোলনের মধ্যে এই দুইটি অত্যন্ত বড় সমস্যা।" (নালিতাবাড়ি সম্মেলনে সাংগঠনিক রিপোর্ট, পৃ ৭।) ১৯৩৯-৪০ থেকে খেতমজুর বা আধিয়ার সম্বন্ধে বিশেষ কোন আন্দোলন হয়নি। কেবল খুলনা জেলায় ঘাটভোগ ইউনিয়নে ১৯৪২ সনে কৃষক সভার আন্দোলনের ফলে মজুরী বাড়ানো হয়েছিল, এবং তার ফলে খেতমজুররা কৃষক সভায় যোগ দিতে থাকে। রিপোর্টে বলা হয়: আমাদের কাজ হবে খেতমজুরদের জন্য জমি সংগ্রহ করে দেওয়া এবং বেকারী দূর করা, আর ভাগচাষীদের জন্য তেভাগা আদায় করা। (ঐ, পৃ ৪৫) আওয়াজ তোলা হয়: "আধিয়ার ও খেত-মজুরদের মধ্যে কৃষক সভার কাজ ও প্রভাব বাড়াইতে হইবে।" (ঐ, পৃ ৫৬) খাদ্য প্রস্তাবে দাবি করা হয়: "খেতমজুরের মজুরীর সর্বনিম্ন হার বাঁধিয়া দিতে হইবে।" (ঐ পৃ ৭৬) এবং সভার কাজ হিসাবে ঘোষণা করা হয়: "বিনা সালামিতে ও বিনা খাজনায় চাষের জন্য পতিত জমি সংগ্রহ করিয়া গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের মধ্যে বিতরণ করা।" (ঐ, পৃ ৭৭) তেভাগা আদায়ের জন্য বর্গাদারদের সংঘবদ্ধ করা। (ঐ, পৃ ৭৯) "ভাগচাষীদের নিকট হইতে কবুলিয়ত আদায়ের প্রথা রহিত করা।" (ঐ, পৃ ৮০)

ভূমি সমস্যার প্রকৃত সমাধান

হাটগোবিন্দপুর সম্মেলনেও খেতমজুর ও ভাগচাষী সম্বন্ধে এই ধরনের দাবি তোলা হয়। তাছাড়া, খেতমজুরদের পৃথক সংগঠন তৈরি করার পক্ষে এই সম্মেলনে প্রথম ডাক দেওয়া হয়। (সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ ৩২)

মৌভোগ সম্মেলন দাবি তুলেছিল খেতমজুরদের নিম্নতম মজুরী ধার্য করতে হবে এবং তার চেয়ে কম মজুরীতে খাটানো হলে তা আইনত দণ্ডনীয় করতে হবে। (সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ ১৯)

প্রাদেশিক কৃষক সভার সাংগঠনিক পত্রে (৬ আগস্ট ১৯৪৮) বলা হয় ১৯৪৬-৪৭ এর তেভাগা আন্দোলনের পিছনে লক্ষ লক্ষ খেতমজুরের সমর্থন

ছিল এবং জমির জন্য শত্রু পক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে তারা রক্ত ও জীবন পর্যন্ত দিয়েছিল। ভূমি সমস্যার প্রকৃত সমাধান হল কৃষককে জমি দেওয়া এবং খেতমজুর ও বর্গাদারকে জমির মালিক করা।

কুমারশা সম্মেলন খেতমজুর, গরিব চাষী ও ভাগচাষীদের কৃষিঋণ দেবার জন্যও দাবি জানায়। আরো বলে বর্গা প্রথা খতম করা ও বর্গাদারদের জমির মালিকানা দেওয়া কৃষক সভার লক্ষ্য এবং মজুর কবুলিয়ত বর্গাদারকে তার ভাগ থেকে বঞ্চিত করবার কৌশল। দাবি তোলে বর্গাদারকে আইন করে স্পষ্টভাবে তেভাগার অধিকার, নিজ খামারে ধান তোলবার অধিকার এবং ভাগ দিয়ে রসিদ পাবার অধিকার দিতে হবে, আর উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে। খেতমজুর ও বর্গাদারকে জমি দিতে হবে।

৭ই জানুয়ারি ১৯৫৩ তারিখের প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলের প্রস্তাবে খেতমজুর ও গরিব চাষীদের এবং ভূমিহীন বাস্তুহারা কৃষকদের আবাদযোগ্য পতিত জমি দেবার দাবি করা হয়। বেকারদের জন্য টেস্ট রিলিফের কাজ ছাড়া খেতমজুরদের জন্য জমি ও ন্যায্য মজুরী দাবি করা হয়, সামাজিক বাধা-নিষেধ দূর করবার কথা বলা হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খেতমজুরদের নিয়মিত সংগঠন তৈরি করতেও বলা হয়। ১৯৪৮ থেকে বর্গাদার সমস্যার উপর বরাবরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

বর্গাদারের মৌলিক অধিকার

বনগাঁ ঘোষণায় ভাগচাষীর অধিকার সম্বন্ধে বলা হয় যে তার পক্ষে ভূমি সংস্কারের কোন সুবিধা ভোগ করতে হলে ভাগচাষী হিসাবে অন্তত কয়েকটি মৌলিক অধিকার তাকে দিতে হবে : চাষের নিরাপত্তার জন্য পুরুষানুক্রমে চাষের অধিকার, ফসলের আইন-সংগত ভাগ আদায়ের জন্য নিজ খামারে ফসল তোলার ও ভাগের দরুন রসিদ পাওয়ার অধিকার, উচ্ছেদ সম্পর্কে নিজ চাষের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণে মালিকের দায়িত্ব, উচ্ছেদের পর মালিক নিজে চাষ না করলে সাবেক বর্গাদারের জমি ফেরত পাবার অধিকার, বেআইনী উচ্ছেদকে পুলিসগ্রাহ্য অপরাধ বলে গণ্য করা, প্রয়োজন হলে মালিকের অংশ সরকারে জমা দেওয়ার অধিকার, ইত্যাদি (পৃ ১৯-২০)

খেতমজুরদের সম্বন্ধে এই ঘোষণায় বলা হয়েছে যে তাদের প্রধান সমস্যা হল জমির ও কাজের সমস্যা। তার সমাধানের উপায় এক দিকে উদ্বৃত্ত জমি ও খাস পতিত জমি আবাদযোগ্য করে বাস্তুহারা সহ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে

যথাসম্ভব বেশিসংখ্যক লোককে সে জমি বণ্টন করে দেওয়া, অন্যদিকে দ্রুত শিল্পায়ন ও কৃষির উন্নয়নের দ্বারা কাজের সংস্থান করা। স্থায়ী গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা করেও কাজের সংস্থান করা দরকার। (পৃ ২২)

বড়া-কমলাপুর সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্টে (পৃ ১৭) বলা হয়েছে বেকার সমস্যা স্থায়ী সমস্যায় পরিণত হয়েছে এবং এ শুধু খেতমজুরদেরই সমস্যা নয়, অন্যান্য কৃষক, কুটীরশিল্পী ও গ্রাম্য মধ্যবিত্তদের ভিতরেও এ সমস্যা ব্যাপক হয়ে উঠেছে।

এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হিসাবে বলা হয়েছে যে কৃষক সভার মূল ঘোষিত লক্ষ্য হল সামন্ত প্রথার অবসান ও কৃষকের শোষণ-মুক্তি। সেজন্য প্রয়োজন "কৃষক সমাজের সর্বাপেক্ষা সংগ্রামী অংশ খেতমজুর ও গরিব কৃষকের উপর নির্ভর করিয়া সকল কৃষককে ঐক্যবদ্ধ করা" ও তাদের সংগ্রাম পরিচালনা করা। (সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ ৪৮)। খেতমজুর ও অন্যান্য গ্রাম্য মজুরদের শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করা সম্বন্ধে আর দ্বিধা অথবা অবহেলা করা চলে না—এ হল সম্মেলনের ডাক। (পৃ ৫২)

কাকদ্বীপ সম্মেলনের প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে "এখনো দুই একটি জেলায় সামান্যভাবে ছাড়া সাধারণত পৃথকভাবে খেতমজুরদের সংগঠিত আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে না।" (সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ ৭৫।) তাদের আন্দোলন ও সংগঠনকে জোরদার করার জন্য "সম্মেলন আগামী কয়েক মাসের মধ্যে প্রতি জেলায় খেতমজুর প্রতিনিধি ও কর্মীদের লইয়া জেলা খেতমজুর কনভেনশন করার জন্য জেলা কৃষক সমিতিকে উদ্যোগী হইতে আহ্বান জানাইতেছে।" (পৃ ৭৭)

খেতমজুর কনভেনশন

বল্লুক সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্টে পূর্বেকার সিদ্ধান্তের উপর জোর দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় জেলা খেতমজুর সমিতি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। (সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ ৫০।) তাদের আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক কৃষক সভার উদ্যোগে ৩১ অক্টোবর ১৯৬০ তারিখে বড়া-কমলাপুরে (হুগলি) এক প্রাদেশিক খেতমজুর কনভেনশন ডাকা হয়। তাতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির কোন প্রতিনিধি যোগ দিতে না পারলেও অন্য সব জেলা থেকে ১১৯ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং তার অর্ধেকের বেশিই ছিলেন খেতমজুর। এই কনভেনশন

আন্দোলন ও সংগঠন গড়তে বিশেষ সাহায্য করেছে, যদিও তারপর থেকে এদিকে সামান্যই নজর দেওয়া হয়েছে।· (পৃ ৫১)

খেতমজুর আন্দোলন ও সংগঠন সম্বন্ধে সাতগেছিয়া সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্টে কৃষক সভার ত্রুটি ও দুর্বলতা স্বীকার করে এই কাজের উপর আবার জোর দেওয়া হয়েছে। (পৃ ২৭) সেই সঙ্গে আবার ঘোষণা করা হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে কৃষকরা, বিশেষে করে গরিব ও খেতমজুরারই প্রধান বাহিনীর কাজ করবে। সেজন্য কৃষক ও খেত-মজুরদের সংগঠিত করার দায়িত্ব প্রাধানত কৃষক সভাই নিতে চায়। (পৃ ৩৩)

এই সম্মেলনে "খেতমজুরের সমস্যা ও আন্দোলন" প্রস্তাবে ১২টি দাবির তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেই সব দাবির ভিত্তিতে খেতমজুরদের সংগঠিত হতে এবং খেতমজুর সমিতি গঠন করতে আহ্বান দেওয়া হয়েছে। দাবিগুলি এই : (১) সরকারের হাতে ন্যস্ত জমি এবং আবাদযোগ্য পতিত জমি খেতমজুর সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করে গরিব কৃষক সহ খেতমজুরদের মধ্যে বণ্টন। (২) গ্রামীণ শিল্প গঠন করে তাইতে এবং উন্নয়নমূলক কাজে তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা। (৩) নিম্নতম মজুরী আইন কার্যকর করা এবং তাকে সংশোধন করে বর্তমান মূল্যমানের সঙ্গে সমতা রেখে নতুন মজুরীর হার নির্ধারণ ও কাজের ঘণ্টা নির্ধারণ। (৪) সারা বছর রেশনে চাল ও গম এবং সস্তা দরে ডাল, লবণ, কেরোসিন ও বস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা। (৫) বেকারদের জন্য বেকার ভাতা। (৬) জমিহীন খেতমজুরদের ট্যাক্স মকুব করা। (৭) বাস্তুভিটার স্বত্ব স্বীকার ও বাস্তু নিষ্কর করা। (৮) অল্প সুদে দীর্ঘমিয়াদী ঋণ। (৯) বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করে রোজ মজুরী ও মাহিন্দারদের মাহিনা নির্ধারণ। (১০) খেতমজুরদের ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ। (১১) শ্রম সমবায় গঠন ও কাজ দেবার ব্যবস্থা গ্যারান্টি করা। (১২) খেতমজুর সমিতি বা ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং মাসিক চার আনা চাঁদার বাধ্যতামূলক নিয়ম থেকে রেহাই দেওয়া। (সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ ৫৭-৫৮ ।)

সোনারপুর এবং কাঁথি সম্মেলনেও এই ধরনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্পাদকের রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে খেতমজুরদের সংগঠনের কাজ যথেষ্ট অগ্রসর হচ্ছে না। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য এই দুই সম্মেলনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।)

১৯৪৯ সনের আগস্ট মাসে কলকাতার এক "প্রাদেশিক খেতমজুর সম্মেলনের" অনুষ্ঠান হয়। এই সম্মেলন হয় অত্যন্ত অস্বাভাবিক অবস্থায়। কৃষক সভার নীতি ও সংগ্রামও সে সময়ে ঠিক স্বাভাবিক পদ্ধতিতে চলছিল না। কৃষক সভার তরফ থেকে এই সম্মেলনকে নিয়ম মাফিক ডাকাও হয়নি। তার অনেক দাবিও ছিল অবাস্তব।

৭। পাটের দর

পাট চাষ ও পাটের দরের সমস্যা সম্বন্ধে বাংলাদেশে কৃষক সভা প্রথম থেকেই তার বক্তব্য বলে এসেছে, সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, প্রচার ও আন্দোলন করেছে। পূর্বে সারা দুনিয়ার পাটের উৎপাদন ও ফসল ছিল বাংলার প্রায় একচেটিয়া সম্পদ এবং সেইভাবেই তার কারবার চলত। কৃষকরা পাট উৎপাদন করত, কলকাতা অঞ্চলের চটকলগুলিতে চট ও অন্যান্য জিনিস উৎপন্ন হয়ে বিদেশে চালান যেত, কাঁচা পাটও রপ্তানী হত। বিদেশেও, বিশেষ করে স্কটল্যাণ্ডে (ডাণ্ডি প্রভৃতি শহরে) পাটের বাজার ও চটশিল্প ছিল।

পূর্বে কলকাতার চটকলের মালিকরা ছিল প্রায় সবই বিদেশী, বিশেষ করে স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের সাহায্যে এই একচেটিয়া মালিকরা অত্যধিক হারে মুনাফা করত কিন্তু দালাল ও ফড়িয়াদের মারফত সস্তাদরে কাঁচা পাট কিনে একদিকে কৃষকদের ন্যায্য দর থেকে বঞ্চিত করত, অন্যদিকে কলের মজুরদের সস্তা মজুরীতে খাটিয়ে তাদের ও প্রতারণা করত। এই বিষয় নিয়ে এক সময়ে বাংলার কিছু-সংখ্যক কংগ্রেস নেতাও প্রচার করেছিলেন কিন্তু সংগঠিত আন্দোলনের চেষ্টা তাঁরা করেননি।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কায়েম হবার (১৯১৯) পর চটকলের মজুরদের স্বার্থ নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। পাট চাষীদের স্বার্থে আন্দোলন নিয়মিত ভাবে শুরু করে কৃষক সভা। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর দুনিয়ার বাজারে পাটের চাহিদা ও চালান বেড়ে যাওয়ায় পাট চাষীরা কয়েক বছর কিছু ভালো দর পেয়েছিল। কিন্তু ১৯২৭-২৮ এর পর, বিশেষত তামাম দুনিয়ায় অর্থনীতিক সংকটের বিধ্বংসী আঘাত আসবার পর পাটের চাহিদার সঙ্গে পাটের দর একেবারে পড়ে যায়। পাট চাষীদের অবস্থা অত্যন্ত

শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই অবস্থা কয়েক বছর চলবার পর প্রাদেশিক কৃষক সভা সংগঠন করা হয়। তখন থেকেই পাটের ন্যায্য দর ধার্য করার দাবি তোলা হয়। আরো পরে দাবি করা হয় পাটের নিম্নতম দর আইন করে ধার্য করে দিতে হবে। এ দাবি কিন্তু আজও পূরণ করা হয়নি।

সারা ভারত কৃষক কমিটিও ২৭-২৮ অক্টোবর ১৯৩৭ তারিখে তার সভায় এক প্রস্তাবে ভারত সরকার ও বাংলা সরকারের নিকট এই মর্মে দাবি জানায় যে পাটের নিম্নতম দর আইনের দ্বারা ধার্য করার ও সমস্ত উৎপন্ন পাট নিযন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা হ'ক যাতে পাট চাষীরা বেঁচে থাকতে পারে এবং পাট উৎপাদনের খরচটা অন্তত তুলে নিতে পারে। কমিটি পরেও এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

একচেটিয়াপতিদের স্বার্থ ই সরকারের লক্ষ্য

চটশিল্পের একচেটিয়া মালিকানা ইংরেজদের হাতে থাকায় ইংরেজ গবরমেণ্ট এই দাবি মেনে নেয়নি। দেশ স্বাধীন হবার পর চটকলগুলির বৃহৎ অংশ মাড়োয়ারী ও অন্যান্য দেশী শিল্পপতিদের হাতে এসে গেছে। পাটের দর ধার্য করার আইনগত ক্ষমতাও রাখা হয়েছে ভারত সরকারের হাতে, তাতে রাজ্য সরকারের ও সুপারিশ করা ছাড়া কিছু করবার অধিকার নাই। ফলে ইংরেজ আমলের মতো এখনো চাষীর স্বার্থ নির্ভর করছে এই দেশী-বিদেশী একচেটিয়া মালিকদের মর্জির ও তাদের সরকারের উপর।

১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার পর বিদেশে পাট ও চটের রপ্তানী কমে যাবে বলে কৃষক সভা ও কৃষক স্বার্থের সমর্থক অন্যান্য সংগঠনগুলি পাট চাষ কমাবার দাবি তোলে। কৃষক সভার দাবি ছিল পাট যত জমিতে উৎপাদন করা হচ্ছিল তার পরিমাণ অন্তত অর্ধেক কমানো দরকার। তখনকার কৃষক-প্রজা মন্ত্রীসভা এক-তৃতীয়াংশ কমাবার কথা বলে। এই সব প্রচারের ফলে পাটের উৎপাদন অনেক পরিমাণে হ্রাস পায় কিন্তু রপ্তানী না থাকায় তাতেও দর যথেষ্ট ওঠে না।

১৯৪৩ সনে প্রাদেশিক কৃষক কমিটি পাট চাষ ও পাটের দর সম্পর্কে একটি ইস্তাহার প্রচার করে এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারী তামাম বাংলায় "পাট দিবস" পালনের ডাক দেয় এবং সর্বত্র তা পালন করাও হয়। ইস্তাহারে বলা হয় পাটের ন্যায্য দর না পাওয়ায় বাংলার ৩০ লক্ষ পাট চাষী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; তখন পাট চাষ এলাকায় পাটের দর ছিল ১১।১২ টাকা

মণ। চটকল মালিকরা সর্বোচ দর ধার্য করেছিল গুণ অনুসারে ১৪, ১৭ ও ১৯ টাকা, যদিও ২৯টি চটকল ঐ বছর লভ্যাংশ দিয়েছিল শতকরা ১৪ থেকে ৩৩ টাকা।

প্রাদেশিক কৃষক কমিটি এই বিষয়ে ২০ জুলাই তার প্রেস কনফারেন্সে দাবি ঘোষণা করে, চালের অন্যায় চড়া দর ১০ টাকায় নামাতে হবে এবং এক মণ পাটের দর ধার্য করতে হবে দু মণ চালের দরের সমান—২০ টাকা; মফস্বলে নিম্নতম দর হবে ১৮ টাকা। কমিটি বলে: যুদ্ধের পূর্বের অবস্থায় পাট তদন্ত কমিটি সুপারিশ করেছিল পাটের দর হওয়া উচিত ৭, ৮ ও ৯ টাকা। তখনকার তুলনায় জিনিসপত্রের দর ও জীবন ধারণের ব্যয় বেড়েছে অন্তত তিনগুণ। কাজেই ২০ টাকা পাটের দর ধার্য হলে তা মোটেই অন্যায্য হবে না।

কমিটির আরো প্রস্তাব ছিল এই যে পাট চাষীদের সমবায় গঠন করতে হবে এবং সমবায় সমিতির মারফতেই পাটের উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব বক্তব্য প্রচারের জন্য "নিখিল বঙ্গ পাট দিবস" ঘোষণা ও পালন করা হয় ৩রা অক্টোবর ১৯৪৩ (১৬ই আশ্বিন ১৩৫০ তারিখে।)

ফসলের দর এবং বিশেষ করে পাটের দব সম্পর্কে প্রাদেশিক সম্মেলন-গুলিতে সাধারণত প্রস্তাব গ্রহণ করা হত। তাই নিয়ে প্রচার আন্দোলন ছাড়া বহু গণদরখাস্ত, ডেপুটেশন ইত্যাদির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ভারত সরকারের কাছে একাধিকবার ডেপুটেশন পাঠিয়ে দাবি করা হয়েছে যে আখ বা তুলোর মতো পাটেরও একটা দর ধার্য করা হ'ক। ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ তারিখে যখন সাড়ে ১৩ হাজার সই সমেত গণদরখাস্ত নিয়ে দিল্লীতে ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রীর নিকট কৃষক সভার প্রতিনিধিরা কৃষকদের দাবি পেশ করেছিলেন, তখন তিনি দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও দাবি অনুসারে কাজ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। শক্তিশালী একচেটিয়া চটকল মালিক সংঘের প্রভাবকে অস্বীকার করা ছিল ভারত সরকারের সাধ্যের অতীত। কাজেই মালিক সংঘের মুনাফার স্বার্থের নিকট কৃষক স্বার্থে ন্যায্য দর ধার্য করা ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি, সরকার তা চায়ওনি।

দাদনী প্রথা বেআইনী করার দাবী

বড়া-কমলাপুর সম্মেলনে (১৯৫৫) এ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে

দাবি থাকে পাটের নিম্নতম দর ৩৫ টাকা ধার্য করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে সরকারকে ঐ দরে কিনতে হবে ; ন্যায্য দরে বিক্রীর উদ্দেশ্যে কৃষকরা যাতে পাট ধরে রাখতে পারে সেজন্য এবং মহাজনের দাদন নিয়ে যাতে সস্তা দরে বেচতে না হয় সেজন্য সরকারকে অভাবী চাষীদের অল্প সুদে যথেষ্ট পরিমাণে কর্জ দিতে হবে ; প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পাট পচানির ব্যবস্থা করতে হবে : এবং পাট চাষীদের স্বার্থরক্ষার জন্য উপযুক্ত সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তি এবং পাটচাষীদের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে। (সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ ৩৫-৩৬।)

১৯৫৮ সনে কলকাতার বাজারে পাটের দর ৩৫।৪০ টাকা হলেও সাধারণত চাষীরা মফস্বলের বাজারে ১৩।১৪ টাকায় বিক্রী করতে বাধ্য হয়। তাই কাকদ্বীপ সম্মেলন পাট ও অন্যান্য ফসলের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য নীতি চালু করার কথা তোলে। সম্মেলন দাবি করে নিম্নতম দর (আসাম বটমের ভিত্তিতে) ৩০ টাকা, পাট জমা রাখার জন্য সমস্ত উৎপাদন কেন্দ্রে সরকারী শস্য-গোলা বা গুদাম, বাজার দর বাঁধা দরের নিচে পড়ে গেলে সরকারী ক্রয়, এবং দাদনী প্রথায় সস্তা দরে বিক্রী বন্ধ করার জন্য কৃষককে ঋণদান (পৃ ৮২-৮৩)। বল্লুক সম্মেলন দাদনী প্রথাকে বেআইনী ঘোষণা করার জন্য দাবি তোলে। (সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ ৩৫।)

পাটের দর সমস্যা পাট চাষীদের জীবনে এমন কঠোর অবস্থা এনে দেয় যে কৃষক সভাকে সে বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসার জন্য পাটচাষী সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে হয়। হুগলি জেলার তারকেশ্বরে একবার প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা ডাকা হয় কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সে সম্মেলনে যথেষ্ট প্রতিনিধি যোগ দিতে পারেন না। পরে ১৪-১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুরে সম্মেলন হয় এবং এই উপলক্ষে বিরাট কৃষক সমাবেশ হয়। তাতে কৃষকরা ৪৫ টাকা সর্বনিম্ন দর ও অন্যান্য দাবির প্রস্তাব সমর্থন করে। ৩রা আগস্ট ১৯৬৯ তারিখে প্রাদেশিক কৃষক সভার উদ্যোগে হুগলি জেলার শ্রীরামপুর শহরে পাটচাষী ও চটকল শ্রমিকদের যুক্ত প্রতিনিধি সম্মেলন বা কনভেনশন ডাকা হয়। তাতে পাটের দর মণকরা ৬০ টাকা দাবি করা হয়।

ইতিমধ্যে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দরের সঙ্গে চাষের খরচও অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৫-৬৬ সনে পাটের দরও চড়ে

যায়, ৭০।৮০ টাকা পর্যন্ত দর ওঠে। সেই সময়ে কলকাতায় পাটচাষী ও চটকল শ্রমিকদের এক যুক্ত প্রতিনিধি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে এইসব শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলন পরস্পরের সহিত সমর্থন ও সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে পারে। এই সম্মেলনে পাটের নিম্নতম দর ৬০ টাকা ধার্য করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সাতগেছিয়া সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে অন্যান্য দাবির মধ্যে থাকে, পাটের নিম্নতম দর ৯০ টাকা ধার্য করতে হবে, কাঁচা পাটের ব্যবসায় সর্বপ্রকার মধ্যবর্তী স্বার্থ সম্পূর্ণ বিলোপ করতে হবে, ধার্য দরে সরকারকে সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে পাট খরিদ করতে হবে, পাট খরিদের সময় কৃষকদের নিকট থেকে যে ঢলতা, কসুরি ইত্যাদি বাবত অতিরিক্ত পাট আদায় করা হয় তা বন্ধ করবার জন্য তাকে বেআইনী ঘোষণা করতে হবে। (সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ ৪৮-৪৯।) ঢলতা বন্ধের দাবি অবশ্য অনেক পূর্বেও তোলা হয়েছিল, পরেও তোলা হয়েছে (যেমন শ্রীরামপুরে)।

পাট সম্বন্ধে কৃষক সভা দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন পরিচালনা করে এলেও এবং সাময়িকভাবে ছোটখাটো দাবি কিছু আদায় হলেও তার মূল দাবি আদায় করা সম্ভব হয়নি। কৃষকরা যদি সংগঠিত হয়ে অন্তত এক বছরের জন্যও পাটের উৎপাদন চাহিদার অনুপাতে খুব কমিয়ে দিতে পারে, তাহলে হয়তো গবরমেণ্ট ও চটকল মালিকরা কৃষকদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার পথে আসতে বাধ্য হবে। কাজটা কঠিন, কেননা পাট বিক্রী করে লাভ না হলেও কৃষকরা কিছু নগদ টাকা হাতে পায়।

৮। মৎস্যজীবী সংগঠন

পূর্ববঙ্গে মৎস্যজীবীদের স্থানীয় আন্দোলন অনেক সময় হয়েছিল কিন্তু কোন স্থায়ী সংগঠন তোয়ের হয়নি। এক সময়ে সোমেশ্বর চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক পদ্মার মৎস্যজীবী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৪০ সনে ঢাকা জেলার তেওতার জমিদার কংগ্রেস নেতা কিরণ শংকর রায়দের জমিদারীভুক্ত পদ্মার জলকর অঞ্চলে অতিরিক্ত হারে খাজনার দাবির বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন হয়। হাজার হাজার মৎস্যজীবী তাতে যোগদান করেছিল এবং নদীয়া ও ফরিদপুর জেলার কমিউনিস্ট কর্মীরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

এই সংগ্রামকে বানচাল করবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস থেকে এক সম্মেলন ডাকা হয় গোয়ালন্দে (ফরিদপুর জেলা)। তাতে কিরণ শংকর রায় প্রভৃতি নেতারা উপস্থিত থাকেন। সেখানে সোমেশ্বর চৌধুরী মৎস্যজীবীদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে কংগ্রেসের পক্ষে চলে যান। তাহলেও কমিউনিস্ট কর্মীদের নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলে মৎস্যজীবীরা আংশিকভাবে তাদের দাবি আদায় করে নেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলা কালে ১৯৪৩ সনে জাপানী হামলার আশংকায় যখন বাংলা সরকার "ডিন্যায়াল পলিসি" ঘোষণা করে যাতে জাপানীরা বাংলাদেশে ঢুকে পড়লেও নৌকা ইত্যাদি যানবাহনের সুবিধা পেতে না পারে, সেই সময়ে মৎস্যজীবীদের অসংখ্য নৌকা হাতছাড়া হয় ও নষ্ট হয়ে যায়। তাতে তাদের রুজি-রোজগারের উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়ে। এই পলিসি প্রত্যাহার করার পর তারা আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারেনি।

১৩৫০-এর (১৯৪৩) দুর্ভিক্ষের ও পরবর্তী মহামারীর সময়েও আবার তারা বিপন্ন হয়ে পড়ে। শুধু মৎস্যজীবীরাই নয়, গ্রামের গরিব কৃষকদের মতো কারিগররাও বিপদে পড়ে, অসংখ্য লোক মারাও যায়। কারিগররা যুদ্ধের সময়েও ঘা খায় সুতো, লোহা-ইস্পাত ও অন্যান্য কাঁচা মালের সরবরাহের অভাবে।

পরে ১৯৪৭ সনে যখন দেশ বিভাগ হয়ে যায় তখন পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ গরিব কৃষকও কারিগরদের মতো অসংখ্য মৎস্যজীবীও পশ্চিমবাংলায় চলে আসে। অধিকাংশই আসে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায়। তখন তাদের দুঃস্থতা আরো বেড়ে যায়।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আক্রমণের পর অখণ্ড বাংলায় যারা জীবিত থাকে সেই সব মৎস্যজীবী ও কারিগরদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কৃষক সভা সাধ্যমতো চেষ্টা করতে থাকে।

হাটগোবিন্দপুর সম্মেলন (১৯৪৫) খেতমজুরদের পৃথক সংগঠনের জন্য যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তেমনি মৎস্যজীবীদের সংগঠন তৈরির জন্যও আহ্বান দেয় এবং সেজন্য কৃষক সভাকে উদ্যোগী হতে নির্দেশ দেয়। সেই সঙ্গে তাদের জন্য সরকারের নিকট জাল তৈরির সুতো আর আলকাতরা সরবরাহের দাবি করে, নৌকা ও ঋণের প্রয়োজনের কথা বলে। গ্রাম্য

কারিগরদের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের দাবিও ঘোষণা করে। কৃষক সভার আলোচনার ফলে সরকার সুতো সরবরাহ করতে রাজি হয়। তখন তামাম বাংলায় বহু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে সুতো আদায় ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি

ইতিমধ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলায় স্থানীয়ভাবে যে সমস্ত মৎস্যজীবী সমিতি গঠিত হয়েছিল তাদের প্রতিনিধিদের এক কনভেনশন ডাকা হয়। ১লা নবেম্বর তারিখে কলকাতায় প্রাদেশিক কৃষক সভার আফিসে সেই কনভেন-শনে কুড়োরাম চ্যাটার্জি (বর্তমানে মৃত) ও শশধর ব্যানার্জিকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করে প্রাদেশিক মৎস্যজীবী সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। পরের বছর মৌভোগে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন মৎস্যজীবীদের জন্য সমস্ত প্রাকৃতিক জলপথ, নদী, বিল প্রভৃতিতে মাছ ধরবার অবাধ অধিকারের দাবি তোলে।

তারই সমসময়ে আরো দুটি মৎস্যজীবী সমিতি গঠিত হয়। একটি কংগ্রেস নেতা কিরণ শংকর রায়ের নেতৃত্বে গোয়ালন্দে এবং অপরটি মুসলিম লীগের উদ্যোগে মুসলমান মৎস্যজীবীদের নিয়ে। কৃষক সভা স্বভাবতই সাম্প্রদায়িকতা আমদানী না করে সমস্ত মৎস্যজীবীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের প্রয়োজনের উপর জোর দেয় এবং সেজন্য আবেদন জানায়।

১৯৪৮-এর ১-২ জানুয়ারি যশোহর জেলার গঙ্গারামখালিতে মৎস্য-জীবীদের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক কৃষক সভার পক্ষে বগলা গুহ সম্মেলন পরিচালনায় সাহায্য করেন। সেখানে সক্রিয় সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মেলনের প্রধান দাবিগুলি ছিল: (১) যেসব মৎস্যজীবী নিজেরা জাল দিয়ে মাছ ধরে তাদের প্রাকৃতিক নদী, খাল, বিল ইত্যাদিতে বিনা খাজনায় ও বিনা বাধায় মাছ ধরার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (২) খাজনার বদলে আয়কর প্রথা প্রবর্তন করতে হবে এবং সেজন্য একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আয়কর-মুক্ত রাখতে হবে। (৩) সরকারকে মাছের কারবারে সমস্ত মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদ করতে, মাছ চালানির সুব্যবস্থা করতে এবং মাছ উৎপাদনের উন্নততর ব্যবস্থা করতে হবে। ("ফসল ও জমির লড়াই," ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭)

মৎস্যজীবী সমবায়

দেশবিভাগের পর ১৯৫৩-৫৪ থেকে পশ্চিমবাংলার কৃষক সভার সাহায্যে

পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমিতি তার আন্দোলন ও সংগঠনের কাজে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়। কৃষক সভার পক্ষে কমরেড বগলা গুহ এবিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কতকগুলি জেলায় স্থানীয়ভাবে সংগঠন গড়ে তোলা হয়। রাজ্য ভিত্তিতেও ২৩-২৪শে এপ্রিল ১৯৫৫ তারিখে বর্ধমান জেলার পূর্ব সাতগাছিয়ায় মৎস্যজীবী সম্মেলনের অধিবেশন হয় এবং তাতে রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। পরে আরো সম্মেলন হয়েছে। ১৯৬৯ সনে সম্মেলন হয়েছে ভগবানগোলায় (মুর্শিদাবাদ জেলা)।

সমিতির চেষ্টায় সরকারী সাহায্যে কয়েকটি মৎস্যজীবী সমবায়ও সংগঠিত হয়। কিন্তু সরকারী সাহায্যের পদ্ধতি ও অনিশ্চয়তার ফলে এবং কতক পরিমাণে প্রাকৃতিক কারণেও এই সমস্ত সমবায় ভালোভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে মৎস্যজীবীদের অবস্থারও বিশেষ উন্নতি হয় না।

বল্লুক সম্মেলন মৎস্যজীবী সম্বন্ধে এক প্রস্তাবে দাবি জানায় যেন ভূমি সংক্রান্ত (জমিদারী দখল) আইনের ট্যাঙ্ক ফিশারির বিধান সংশোধন করা, জলকরে ইজারাদারী প্রথার অবসান করা, বৃহৎ জলকর থেকে প্রাইভেট বা ঘরোয়া মালিকানা রদ করা, এবং জলকরে মৎস্যজীবীদের স্বত্ব ও অধিকার স্বীকার করা হয়, আর সেই উদ্দেশ্যে যেন আইন করা হয়। (সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ ৫৪।) পূর্ব সাতগাছিয়া সম্মেলনেও এই ধরনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। (রিপোর্ট, পৃ ৬৬।) পরবর্তী সম্মেলনেরও এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আছে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর ১৯৬৭ সনের ২২শে মার্চ কলকাতায় ও ২৫শে মে পূর্ব সাতগাছিয়ায় (বর্ধমান জেলা) দু বার পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী কমিটির বর্ধিত সভা বসে। তাতে কতকগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সকল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৮ই এপ্রিল সরকারের নিকট একটি দাবিপত্র পেশ করা হয়। ১৩ই জুলাই সেই সব দাবি নিয়ে মৎস্যজীবীদের বিধান সভা অভিযান সংগঠিত হয়। ("জলকরের দাবিতে—মৎস্যজীবীদের আন্দোলন ও সংগ্রাম," জুন ১৯৬৭।)

৯। ক্যানাল কর আন্দোলন

দামোদর ক্যানালের কর সম্বন্ধে আন্দোলন বর্ধমান জেলায় ১৯৩৬-৩৭ থেকেই চলে আসছিল। পরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডি. ভি. সি.) নাম

দিয়ে এক বৃহৎ প্রকল্প মারফত দামোদর নদের উপর নতুন নতুন বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ করে সেচ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯৩৪ সনের দামোদর ক্যানালের ও তার পূর্বেকার ইডেন ক্যানালের সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ২২,০০০ একর জমির পরিবর্তে ডি. ভি. সি-র অধীনে ১০ লক্ষ একর জমির সেচের ব্যবস্থা করা হবে বলে স্থির হয় এবং এই ক্যানাল বর্ধমান জেলার বাইরে হুগলি ও বাঁকুড়া জেলারও কিছু কিছু অংশে বিস্তৃত হয়। এই ক্যানাল ব্যবস্থা থেকে সেচের জল দেওয়া হয় ১৯৬৭ সনে ৭,১৩,০০০ একর খরিফ ফসলের এবং ১৯৬৬-৬৭ সনে ৩৮,০০০ একর রবি ফসলের জমিতে।

এর পর আবার বীরভূম জেলায় ময়ূরাক্ষী ক্যানাল কেটে সেচের ব্যবস্থা করা হয় প্রধানত বীরভূম জেলায় এবং মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার কিছু কিছু অংশে। তাতে মোট ৫,৬০,০০০ একর জমিতে জল দেবার কথা। এই ক্যানাল মারফত জল সরবরাহ আরম্ভ হয় ১৯৫৪ সনে। ইতিমধ্যে ৫,১০,০০০ একরে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দুই ক্যানালেই সেচের জন্য যে হারে কর ধার্য করা হয়েছে তাকে কৃষকরা অত্যধিক মনে করে এবং তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ পেতে থাকে। এই বিক্ষোভের কারণে কৃষক সভা ক্যানাল করের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে।

ময়ূরাক্ষী প্রকল্প এলাকায় কংগ্রেস সরকার চেয়েছিল একর প্রতি খরিফ ফসলের (আমন ধানের) জন্য ১০ টাকা ও রবি ফসলের জন্য ১৫ টাকা কর ধার্য করতে। তার উপর উন্নয়ন আইন পাস করে একর প্রতি পাঁচ বছরে ১৫০ টাকা উন্নয়ন লেভি আদায়েরও চেষ্টা ছিল। (সেজন্য বিধান সভায় বিল পেশও হয়েছিল কিন্তু আন্দোলনের চাপে তা ধামাচাপা পড়ে যায়।) প্রথমে অবশ্য ট্যাক্সের হার এত বেশি ঘোষণা না করে সরকার সেচ আইন অনুসারে দু বছরের জন্য প্রথমে ১০ টাকা ও পরে ৭॥ টাকা হিসাবে লিস বণ্ডে সই সংগ্রহের চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষকরা সই দিতে রাজি হয় না।

জবরদস্তি কর আদায়ের চেষ্টা

তখন ১৯৫৪ সনে অর্ডিন্যান্স জারি করে সরকার ময়ূরাক্ষী এলাকায় বাধ্যতামূলকভাবে জল দেওয়ার ও কর আদায় করার সিদ্ধান্ত করে। আন্দোলনের চাপে করের হার কমিয়ে ১৯৫৫ সনের জন্য ৬॥ টাকা ধার্য করে এবং ২৫ হাজার একরেরও বেশি এলাকায় তা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

অনাবৃষ্টির কারণে সেবার ফসল হানির আশংকায় অনেকে লিসে সইও দেয়। তবে আন্দোলনের চাপে সরকার যেসব জমি জল পায়নি বা কম পেয়েছিল সে সম্বন্ধে তদন্ত করতে বাধ্য হয়। (বড়া-কমলাপুর সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট, পৃ ১৩-১৪।) সম্মেলন সেচ কর কমিয়ে বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণের খরচের জন্য প্রয়োজনীয় হারে কর ধার্যের দাবি করে। (সম্মেলনের রিপোর্ট, পৃ ১৫।)

বাধ্যতামূলক সেচকর ধার্য করবার জন্য যে আইন ছিল সেই আইনে ব্যবস্থা ছিল এই যে কর ধার্য করতে হলে ফসলের উন্নতি বা উৎপাদন বৃদ্ধি দেখাতে হবে এবং ক্যানালের কারণে ফসল যে পরিমাণে বাড়বে সেই বার্ধিত অংশের অর্ধেক পর্যন্ত কর ধার্য করা চলবে। কিন্তু সরকার এই বৃদ্ধি প্রমাণ করতে না পারায় কর ধার্য করতে পারছিল না। বর্ধমানে পুরোন দামোদর ক্যানাল সম্বন্ধে আইনে করের সর্বোচ্চ সীমা ছিল ৫॥ টাকা। তাই ১৯৫৪ সনে সরকার কর বৃদ্ধির পর থেকে এই সব বাধা দূর করবার জন্য আইন সংশোধন করে; ময়ূরাক্ষী এলাকার জন্য সর্বোচ্চ ১০ টাকা এবং ডি. ভি. সি. এলাকার জন্য নতুন আইন করে খরিফ ফসলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১২॥ টাকা ও রবি শস্যের ক্ষেত্রে ১৫ টাকা ধার্যের ব্যবস্থা করে। (কাকদ্বীপ সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট, পৃ ৪১।)

এই দুই আইন পাস করিয়েই সরকার ময়ূরাক্ষী এলাকায় ১৯৫৫-৫৬র জন্য ৭॥, ১৯৫৬-৫৭র জন্য ৯, ১৯৫৭-৫৮র জন্য ১০, এবং ১৯৫৮-৫৯এর জন্যও ১০ টাকা ট্যাক্স বসায়, আর এক সঙ্গে দু তিন বছরের কর আদায়ের জন্য চাপ দিতে থাকে। (ঐ)

কৃষাণদের উপর করের জুলুম

কিন্তু করের এই অন্যায় হার এবং এক সঙ্গে বেশি আদায়ের চাপের ফলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে, বিশেষ করে বীরভূম জেলায়। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কনভেশন, পদযাত্রা, গণ-দরখাস্ত, সভা-সমাবেশ ইত্যাদি মারফত আন্দোলন এই জেলার ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলাতেও যায়। প্রাদেশিক কৃষক কমিটি জেলার আন্দোলনে সাহায্য করে। (ঐ, পৃ ৪২)

অনেক ভাগ-জমির মালিক তাদের কৃষাণদের (যারা কোন মালিকের জমি মালিকেরই হাল-বলদ দিয়ে চাষ করে) নিকট থেকে প্রতি বছর মোট

ক্যানাল করের একটা অংশ, কোন কোন ক্ষেত্রে ষোলআনাই আগাম আদায় করতে থাকে, যদিও তারা নিজেরা ক্যানাল করের বিরুদ্ধে আন্দোলন সমর্থন করে কর দেওয়া বন্ধ রাখে, এবং যদিও এভাবে কর আদায় আইন-সংগতও নয়। তার ফলে স্বভাবতই কৃষাণদের মধ্যে মালিকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাতে সাধারণভাবে ক্যানাল করের বিরুদ্ধে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। (ঐ, পৃ ১৩।)

এর মধ্যে ডি. ভি. সি. এলাকায় ১৯৫৮ সনে যথেষ্ট জল দেওয়া না হলেও ঐ বছরের জন্য একরে ৭॥ টাকা এবং ১৯৫৯ সনের জন্য ১০ টাকা হারে কর ঘোষিত হয়। ১৯৫৯ সনের জুন মাসে হাটগোবিন্দপুরে (বর্ধমান জেলা) প্রাদেশিক কৃষক কমিটির বৈঠকে ক্যানাল কর আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। তবে সে সাব-কমিটি যথেষ্ট সক্রিয় হয়নি। (ঐ, পৃ ৪৩)

কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত "খাদ্য শস্য তদন্ত কমিটি" ও "সেচের জল তদন্ত কমিটি" মত প্রকাশ করেছিল যে কোন ক্যানাল তৈরি হবার পর প্রথম দিকে কয়েক বছর বিনা ট্যাক্সে জল দেওয়া উচিত এবং তার পরে অল্প হারে ট্যাক্স ধার্য করা উচিত। কিন্তু কেন্দ্রের ও রাজ্যের উভয় সরকারই এই সংগত পরামর্শ অগ্রাহ্য করেছিল। (কাকদ্বীপ রিপোর্ট, পৃ ৫৯।)

কাকদ্বীপ ও বল্লুক সম্মেলন ভাগ-জমির মালিকদের অনুরোধ করে যেন তারা ভাগচাষী ও কৃষাণদের কাছ থেকে সেচ কর আদায় না করে, অন্তত আদায় স্থগিত রাখে, কারণ তা অন্যায় ও অযৌক্তিক। তাসত্ত্বেও যদি আদায় করে তাহলে কৃষকরা যেন সেজন্য রসিদ নিয়ে নেয়। সম্মেলন দাবি করে যে ময়ূরাক্ষী ও ডি. ভি. সি. এলাকায় ক্যানাল করের হার যেন কোন মতেই সাড়ে ৫ টাকার বেশি না হয় এবং সেজন্য সমস্ত বকেয়া ট্যাক্স যেন মকুব করে দেওয়া হয়। এই দাবির উপর আন্দোলন চলতে থাকে।

কংসাবতীর প্রকল্প

দামোদর ও ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্প ছাড়া কংসাবতী (কাঁসাই) জলাধার প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে মেদিনীপুর জেলায় এবং বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার কিছু কিছু অঞ্চলে সেচের জল সরবরাহ করা হবে। এর লক্ষ্য হচ্ছে লাখ একর খরিফ ও দেড় লাখ একর রবি ফসলের জমিতে সেচ দেওয়া। ১৯৫৬-৫৭ সনে তার কাজ শুরু হয়। ১৯৬৮ সনের মাঝামাঝি

পর্যন্ত কাজ হয়েছে মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ এবং ১৯৬৭-৬৮ সনে জল দেওয়া হয়েছে ১ লাখ ২৫ হাজার একরে। অর্থাভাবে কাজ যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারছে না।

কংসাবতী ক্যানাল সম্বন্ধে কর নিয়ে এখনো কোন আন্দোলন হয়নি। কিন্তু জলাধার ও অন্যান্য নির্মাণ কার্যের প্রয়োজনে যেসমস্ত জমি দখল করা হয়েছিল তার জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি এবং তার পরিমাণ ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনটি জেলাতেই কিছু কিছু আন্দোলন করতে হয়েছিল। তার ফলও মোটামুটি পাওয়া গেছে।